নামোজর বই

হিককাত কিতাব ৎকাশনা ২

কিতাবুস সালাত

হৎসেইন হিলম হিশিক

হাকিকাত কিতাব প্রকাশনা ২

কিতাবুস সালাত

নামাজের বই

হুসেইন ইলিম ইশিকি

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহিম

মানুষের জন্য তিন ধরনের জীবন রয়েছে। এগুলো হলো দুনিয়া, কবর ও আখিরাতের জীবন। দুনিয়াতে রূহ ও শরীর একত্রে থাকে। এই রূহ মানুষকে জীবন্ত রাখে। রূহ বা আত্মা যখন শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায় তখনি মানুষের মৃত্যু হয়। শরীর কবরে পঁচে যায়, মাটির সাথে মিশে যায় অথবা আগুনে পুরে ছাই হয় কিংবা হিংস্র কোন পশুর আহারে পরিনত হয় কিন্‌তু রূহ অক্ষত থাকে। এভাবে কবরের জীবন শুরু হয়। কবরের জীবন গতিহীন হলেও অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। কিয়ামতের দিবসে রূহের সাথে শরীরের মিলন হবে অতঃপর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে অনন্তকাল বসবাস করতে থাকবে।

দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিকে মুসলমান হতে হবে। দুনিয়ার সৌভাগ্য হলো চিন্তামুক্ত স্বস্তির জীবন আর পরকালের সৌভাগ্য হলো জান্নাত। মহান আল্লাহ্ তার বান্দাদের অনেক করুণা করেন তাই যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরন করে বান্দাদেরকে সৌভাগ্যের পথ প্রদর্শন করেছেন। কেননা মানুষের পক্ষে শুধুমাত্র নিজের বিবেকের দ্বারা সা'আদাতের পথ খুজে পাওয়া সম্ভব নয়। কোন পয়গম্বরই ধর্মের নামে নিজ থেকে কিছু বলেন না, মহান আল্লাহ্ তায়ালা যা শিখিয়ে দেন তাই প্রচার করেন। পয়গম্বরদের প্রদর্শিত এই সৌভাগ্যের পথসমূহকেই **দ্বীন** বলে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রদর্শিত দ্বীনের নাম **ইসলাম**। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে যুগে যুগে হাজার হাজার পয়গম্বর এসেছেন। এই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অন্যান্য পয়গম্বরদের প্রদর্শিত সব দ্বীনই কালের আবর্তনে বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে। অতএব বর্তমানে দোজাহানের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন পথ অবশিষ্ট নাই। ইসলামিয়্যাত হলো ক্বালবের মাধ্যমে বিশ্বাসের (**ঈমান**) ও শরীরের মাধ্যমে পালনের (**আহকাম-ই ইসলাম**) বিদ্যা, যা **আহলি সুন্নাত আলিম**দের রচিত কিতাবসমূহ থেকে শেখা সম্ভব। জাহিল ও পথভ্রষ্টদের রচিত বিকৃত কিতাব থেকে শেখা অসম্ভব। হিজরী দশম শতকের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম রাজ্যগুলোতে বিপুল সংখ্যক **আহলি সুন্নাত আলিম**দের বাস ছিল। এখন সে রকম আলিম নাই বললেই চলে। এই সমস্ত আলিমদের রচিত আরবী ও ফারসী কিতাবসমূহ এবং এগুলোর অনুবাদসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান। "হাক্বীকাত কিতাবেভি" এর প্রত্যেকটি কিতাব এই উৎস থেকে নেয়া হয়েছে। অতএব সা'আদাত (সৌভাগ্য) অর্জনের জন্য "**হাক্বীকাত কিতাবেভি**" এর কিতাবসমূহ পাঠ করুন।

সতর্কতা: মিশনারিরা খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার করছে, ইহুদিরা তাল্‌মুদ ছড়ানোর কাজ করছে, হাকিকাত কিতাবেভি মানুষের কাছে ইসলাম পৌঁছানোর কাজ করছে, আর কুচক্রী মহল ধর্মের ক্ষতি করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। একজন

বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং সচেতন মানুষ বুঝবেন কোনটি সঠিক এবং তা গ্রহণ করে মানবতার কাছে পৌঁছে দেবেন। এভাবে মানবতার সেবার চেয়ে ভালো আর কোন উপায় থাকতে পারে না। ইহুদি এবং খ্রিস্টান আলেমরাই বলে থাকেন তওরাহ এবং বাইবেল কিতাব মানুষের লেখা।কুরআনে কারিম অত্যন্ত বিশুদ্ধ কেননা তা আল্লাহ তালা প্রদত্ত। সকল খ্রিষ্টান যাজক এবং ইহুদিদের নিয়মিতভাবে এবং মনজোগ সহকারে হাকিকাত কিতাব সমূহ পড়া উচিত। এগুলো বোঝার চেষ্টা করা উচিত তাদের।

এই হল, মিফতাহ-ই কানজ-ই কাদিম[1]*,*

বিসমিল্লাহির্ রহমানির রহীম

প্রাককথা

‘আউজুবিল্লাহ্’ ও ‘বিসমিল্লাহ্’ বলে এই নামাজের বইটি লিখতে শুরু করলাম। আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। তাঁর নির্বাচিত ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ করে তাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত (দোয়া) ও সালাম বর্ষিত হোক। সম্মানিত পয়গম্বরের পবিত্র আহলে বাইতের জন্য এবং সৎ ও ন্যায়পরায়ণ (সাদিক ও আদিল) প্রত্যেক আসহাবে কিরাম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আলাইহিম আজমাইনের জন্য সর্বোত্তম উত্তম দোয়া করছি।

দুনিয়াতে উত্তম ও উপকারী জিনিসের সাথে খারাপ ও ক্ষতিকর জিনিসসমূহ মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। সৌভাগ্য, প্রস্বস্থি ও প্রশান্তি অর্জনের জন্য সর্বদাই উত্তম ও ফায়দাবান কাজ করা উচিত। মহান আল্লাহ্ তায়ালা পরম দয়ালু হওয়ার কারণে, মন্দ জিনিস থেকে উত্তম জিনিসকে পৃথককারী এক শক্তি সৃষ্টি করেছেন। এই শক্তিকে **আকল** (বিবেক) বলা হয়। সুস্থ ও পরিষ্কার আকল এই কাজ খুবই দক্ষতার সাথে করতে সক্ষম। পাপ করলে, নাফস্ তথা খায়েশের অনুগত হলে এই আকল ও ক্বালব অসুস্থ হয়ে যায়। তখন আর ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা পরম দয়ালু, যে কারনে তিনি পয়গম্বরদের মাধ্যমে উত্তম আমলের শিক্ষা দিয়েছেন এবং তা পালনের আদেশ দিয়েছেন। একইসাথে ক্ষতিকর বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত করে তা বর্জনের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালার এই আদেশ ও নিষেধকেই **দ্বীন** বলা হয়। শেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে দ্বীন শিখিয়েছেন তাই **ইসলাম**। বর্তমানে ভূপৃষ্ঠে সঠিক ও অপরিবর্তিত একটিমাত্র দ্বীন রয়েছে। সেটাই ইসলাম। চিরপ্রশান্তি অর্জনের জন্য ইসলামিয়্যাতকে মেনে চলা তথা মুসলমান হওয়া আবশ্যক। আর মুসলমান হওয়ার জন্য, প্রথমে ক্বালবের দ্বারা ঈমান আনতে হবে, তারপর ইসলামিয়্যাতের আদেশ ও নিষেধসমূহ শিখে তা মান্য করতে হবে।

ঈমান গ্রহণের জন্য, ‘কালিমা-ই শাহাদাত’ বলা ও এর অর্থ জানা আবশ্যক। এই কালিমার প্রকৃত অর্থ জানার জন্য আহলি সুন্নাত আলেমদের রচিত কিতাবসমূহে যেভাবে লেখা হয়েছে সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে। যারা আহলে সুন্নাত আলেমদের লেখা হাকিকি দ্বীন কিতাব সমুহ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে, তাদের কে একশত শহিদের সওয়াব দেয়া হবে। চার মাজহাবের

[1] আযেলী তথা অনাদি অনন্ত ভাণ্ডারের চাবি।

যেকোনো একটি অনুসরনকারি আলেমদেরকে **আহলি সুন্নাত আলেম** বলা হয়।

বর্তমানে পুরো দুনিয়ার মুসলমানগণ তিন ভাগে ভাগ হয়েছেন। এর মাঝে প্রথমটি হল, সম্মানিত সাহাবীদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী প্রকৃত মুসলমান। এদেরকে **আহলি সুন্নাত** বা **সুন্নী** কিংবা '**ফিরকা-ই নাজিয়া**' (জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া দল) বলা হয়। দ্বিতীয় ভাগ হল, আসহাবে কিরামের শত্রু। তাদেরকে **শিয়া** বা **ফিরকা-ই দাল্লা** (পথভ্রষ্ট দল) বলা হয়। আর তৃতীয় ভাগ হল সুন্নী ও শিয়াদের দুষমন। এদেরকে **ওহহাবী** বা **নজদী** বলা হয়। কেননা এরা প্রথম আরবের নজদ্ শহরে প্রকাশিত হয়েছিল। এদেরকে '**ফিরকা-ই মালউনা**'ও (অভিশপ্ত) বলা হয়। কেননা এরা মুসলমানদেরকে মুশরিক আখ্যা দিয়ে থাকে। আর মুসলমানদের যারা কাফির বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন। মুসলমানদেরকে এভাবে তিন ভাগে খৃস্টান ও ইহুদীরা ভাগ করেছে।

যে ভাগেরই হোক না কেন, যে নাফসের আনুগত্য করল ও ক্বালবকে নোংরা করল সে জাহান্নামে যাবে। মুমিনের উচিৎ নাফসকে পরিশুদ্ধ করার জন্য সর্বদা বেশি বেশি '**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ**' বলা। আর ক্বালবের পরিশুদ্ধির জন্য '**আস্তাগফিরুল্লাহ**' বলা। যারা ইসলামিয়্যাতের অনুসরণ করল তাদের দোয়া ইনশাল্লাহ কবুল হবে। যারা নামাজ আদায় করে না, বেপর্দা নারীদের দিকে নজর দেয়, হারাম ভক্ষণ করে তারা ইসলামিয়্যাতের অনুসারী নয়। এদের দোয়া কবুল হয় না।

ঈমানের পরে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আদেশ ও আমল হল নামাজ। প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজে আইন। আদায় না করলে কবীরা গুনাহ হবে। হাম্বলী মাজহাব অনুযায়ী তা কুফরের শামিল। নামাজ সহীহ তথা শুদ্ধভাবে আদায়ের জন্য প্রথমে নামাজ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা দরকার। এই বইতে, নামাজ সম্পর্কে সঠিক ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছি। একাধিক ইসলামী আলেমদের কিতাব থেকে সাহায্য নিয়ে বইটি প্রস্তুত করেছি। যা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যই শেখা উচিত।

সঠিকভাবে নামাজ আদায়ের জন্য, নামাজে যে সূরা বা দোয়া তিলাওয়াত করতে হয় তাও মুখস্ত করা আবশ্যক। এজন্য একজন ভাল ক্বারী বা যিনি এগুলি ভাল জানেন তার থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। সঠিকভাবে কুরআন তিলাওয়াত শেখাও প্রত্যেক মুসলমানের উপর কর্তব্য।

প্রত্যেক মুসলমানের কুরআন করীমের শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখা উচিত। বাবা-মার উচিত সন্তানদের কুরআন শেখার ব্যবস্থা করে দেয়া।

কুরআন করীম বাংলা ভাষার বর্নমালা দিয়ে লিখা সম্ভব নয়। এর জন্য মূল আরবী থেকে তিলাওয়াত করা উচিত। চেষ্টা করলেই যা সহজে শেখা সম্ভব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "**যারা সন্তানদেরকে**

নিজেরা কুরআন করীম শিক্ষা দিল অথবা মুয়াল্লিমের নিকট পাঠাল অতঃপর যতখানি কুরআন শিখাল, তার প্রত্যেক হরফের জন্য তাদেরকে দশ বার কা'বা-ই মুয়াজ্জামা যিয়ারতের সওয়াব প্রদান করা হবে এবং কিয়ামতের দিনে তাদের মাথায় মুকুট পরানো হবে। যা দেখে সবাই ঈর্ষা করবে"।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সবাইকে শুদ্ধ ঈমান গ্রহণের ও সঠিকভাবে নামাজ আদায়ের পদ্ধতি শেখার ও মানার এবং নেক আমল করার তৌফিক দান করুক। আমীন ।

২০০১ খৃস্টাব্দ ১৩৮০ হিজরী শামসী ১৪২২ হিজরী কামেরী

নামাজ এক বৃহৎ আদেশ

হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে যতগুলো আসমানী দ্বীন এসেছে, প্রতিটি দ্বীনের জন্যই এক ওয়াক্তের নামাজের বিধান ছিল। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের জন্য সবগুলি ওয়াক্তই একত্রে ফরজ করা হয়েছে। নামাজ আদায় করা ঈমানের শর্ত নয় তবে নামাজ যে ফরজ এটা বিশ্বাস করা ঈমানের শর্ত।

নামাজ হল দ্বীনের স্তম্ভ। নিয়মিত, সঠিক ও পরিপূর্ণরূপে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি নিজের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করল, ইসলামকে নিজ ভিত্তির উপর স্থাপন করল। যে নামাজ আদায় করলনা সে নিজের দ্বীনকে ও ইসলামকে ধ্বংস করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "**নামাজ হল দ্বীনের মাথা**"। মাথা ব্যতীত যেমন মানুষ হয় না, নামাজ ব্যতীত তেমনি দ্বীন হয় না।

ইসলাম ধর্মে **নামাজ**, ঈমানের পরে সর্বপ্রথম ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা, বান্দাদের শুধুমাত্র নিজের ইবাদত করার জন্য নামাজকে ফরজ করেছেন। কুরআন শরীফের শতাধিক আয়াতে বলা হয়েছে, "**তোমরা নামাজ কায়েম কর**"। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, "**আল্লাহ তা'আলা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে ফরজ করেছেন। গুরুত্ব সহকারে যথাযথভাবে যে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করেছেন**"।

নামাজ, আমাদের ধর্মে অবশ্য পালনীয় যাবতীয় ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান। একটি হাদীসে বলা হয়েছে, "**বেনামাজী ব্যক্তির ইসলাম থেকে কোন প্রাপ্তি নাই**"। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, "**মুমিন ও কাফিরের মাঝের পার্থক্যকারী হল নামাজ**"। অর্থাৎ মুমিন নামাজ পড়ে কাফির পড়ে না। আর মুনাফিকরা মাঝেমাঝে পড়ে, মাঝেমাঝে পড়ে না। মুনাফিকরা জাহান্নামের কঠিন শাস্তির মূখোমূখি হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "**বেনামাজী ব্যক্তি, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তা'আলাকে রাগান্বিত অবস্থায় পাবে**"।

নামাজ পড়ার মানে হল, আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের কথা চিন্তা করে তার সামনে নিজের ক্ষুদ্রতাকে অনুধাবন করা। যে তা অনুধাবন করতে পারে সে সর্বদা পুণ্যের কাজ করে, কোন অনিষ্ঠ সাধন তার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেকদিন পাঁচ বার যে ব্যক্তি নিজ প্রভুর দরবারে উপস্থিত হওয়ার নিয়্যাত করে তার ক্বালব ইখলাসের দ্বারা পূর্ণ হয়। নামাজের মধ্যে পালনের জন্য আদেশকৃত প্রত্যেকটি কাজই দেহ ও মনের জন্য উপকারী।

মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার মাধ্যমে মুসলমানদের ক্বালবসমূহ একে অপরের সাথে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক মুসলমান যে ভাই ভাই তা উপলব্ধি করতে পারে। বড়রা ছোটদের স্নেহ করে। ছোটরা বড়দের সম্মান করে। ধনীরা দরিদ্রদের আর ক্ষমতাবানরা দুর্বলদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। সুস্থ ব্যক্তিরা যখন মসজিদে নিয়মিত জামাতে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে অনুপস্থিত দেখে তখন তার খোঁজখবর নেয়। হয়ত তার রোগ হয়ে থাকবে এটা ভেবে তার বাড়িতে যায়। '**দ্বীনী ভাইয়ের সাহায্যার্থে যে এগিয়ে আসল মহান আল্লাহ্ তা'আলা তার সাহায্যকারী হবেন**' এই হাদিস শরীফের দেয়া সুসংবাদ অর্জনের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

নামাজ মানুষকে সকল ধরনের মন্দ, কুৎসিত ও নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে বিরত রাখে। কৃত গুনাহসমূহের কাফফারা হয়। হাদিস শরীফে আছে যে, '**পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হল তোমাদের মধ্য থেকে কারো বাড়ির সামনে দিয়ে প্রবাহমান একটি নদীর মত। কেউ যদি ঐ নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তবে তার শরীরে যেমন কোন ময়লা থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিরও সগীরা গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়**'।

মহান আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ঈমানের পরে, সর্বোত্তম আমল ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল **নামাজ**। একারণে নামাজ আদায়ের সময়ে এর প্রত্যেকটি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাবকে যথাযথভাবে পালন করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিস শরীফে বলেছেন যে, '**হে আমার উম্মত, যথাযথভাবে আদায়কৃত নামাজ মহান আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় সমস্ত আমলসমূহের মাঝে সর্বোত্তম। নামাজ হল পয়গম্বরদের সুন্নত, ফেরেশতাদের পছন্দনীয় আমল, আসমান ও জমিনের নূর, দেহের শক্তি, রিজিকে বরকতের কারণ, দোয়া কবুলের মাধ্যম, মালাকুল মাউত** [মৃত্যুর দ্বায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা] **কে সুপারিশকারী, কবরের আলো, মুন্‌কার ও নাকিরের** (কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশতাদের) **জবাব, কিয়ামতের দিবসে মাথার উপরের ছায়া, জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকার ঢাল, বিজলির গতিতে পুলসিরাত অতিক্রমের মাধ্যম, জান্নাতের চাবি ও জান্নাতবাসীর মাথার মুকুট। মহান আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদেরকে নামাজের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ন আর কিছুই দান করেননি। নামাজের চেয়েও উত্তম কোন ইবাদত থাকলে সর্বপ্রথম তা মুমিনদেরকেই দান করতেন। ফেরেশতাদের মাঝ থেকে একদল সর্বদা দাঁড়িয়ে ইবাদত করছে, একদল রুকু করছে, একদল সেজদা করছে আরেক দল তাশাহহুদ পাঠ করছে। মহান আল্লাহ্ এই সমস্ত ইবাদতকে এক রাকাত নামাজের মাঝে একত্রিত করে মুমিনদের উপহার দিয়েছেন। এজন্যই**

নামাজ ঈমানের মস্তক, দ্বীনের স্তম্ভ, ইসলামের কথা ও মুমিনের মিরাজ, গগনের নূর ও জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী।’

একদিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া কাররামাল্লাহু ওজহাহু আছরের নামাজ আদায় করতে পারেননি। এই দুঃখে নিজেকে একটি পাহাড় থেকে নিক্ষেপ করলেন। জোরে জোরে কাঁদতে লাগলেন। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থার কথা শুনে সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন। তার অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাঁদতে শুরু করলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। সূর্য পুনরায় ফিরে এল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, ‘**হে আলী! মাথা তোল, দেখ এখন সূর্য দেখা যাচ্ছে**’। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব খুশি হলেন এবং নামাজ আদায় করলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এক রাত্রিতে প্রচুর ইবাদত করতে করতে বিতির নামাজ আদায় না করেই ঘুমিয়ে গেলেন। পরে ফজরের নামাজের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করে মসজিদের দরজার নিকটে এসে তার সামনে কাঁদতে লাগলেন আর বললেন ‘এই আল্লাহর রাসূল আমায় সাহায্য করুন, বেতেরের নামাজ আদায় করতে পারিনি’। এই কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। এমতাবস্থায় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ‘**হে আল্লাহর রাসূল! সিদ্দীককে বলুন, মহান আল্লাহ্ তা’আলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন**’।

অন্যতম বিখ্যাত ওলী হযরত বায়জিদ বোস্তামী কুদ্দিসা সির্‌রুহ একরাত্রিতে গভীরভাবে ঘুমিয়ে থাকার কারণে ফজরের সময়ে জাগতে পারেননি। তিনি ফজরের নামাজ আদায় করতে না পারার কারণে এতটাই কাঁদলেন যে দৈব বাণী শুনতে পারলেন, ‘হে বায়জিদ, তোমার গুনাহ ক্ষমা করলাম। আর এই অনুশোচনার কান্নার বরকতে তোমাকে আরো সত্তর হাজার নামাজের সওয়াব প্রদান করিলাম’। কয়েক মাস পরে একরাত্রিতে তিনি আবারও গভীর ঘুমে মগ্ন ছিলেন। এমন সময় শয়তান তার পা ধরে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল এবং বলল, ‘জাগো, নামাজের সময় চলে যাচ্ছে’। হযরত বায়জিদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শয়তানকে বললেন, ‘এই অভিশপ্ত! তুমি এমন কাজ কিভাবে করলে? তুমিত সর্বদাই চাও যে প্রত্যেকে নামাজ ত্যাগ করুক, নামাজের ওয়াক্ত দ্রুত শেষ হোক। তবে আমাকে কেন জাগিয়ে দিলে?’। শয়তান বলল, ‘সেদিন তুমি ফজরের নামাজ আদায় করতে না পারার কারণে কেঁদে কেঁদে সত্তর হাজার নামাজের সওয়াব অর্জন করেছিলে। আজ সেই কথা ভেবে তোমাকে জাগিয়ে দিলাম যেন এক ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব পাও। সত্তর হাজার নামাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হও’।

বিখ্যাত ওলী হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র:) বলেছেন যে, 'দুনিয়ার এক ঘন্টা পরকালীন হাজার বছরের চেয়েও উত্তম। কেননা এখানকার এক ঘন্টাতে বিশুদ্ধ ও মাকবুল কোন আমল করা সম্ভব কিন্তু পরকালের হাজার বছরে কোন আমল করা সম্ভব হবে না'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, '**কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওয়াক্তের নামাজকে পরের ওয়াক্তের নামাজের সাথে মিলিয়ে ফেলে তবে সে আশি হুকবা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে**'। পরকালীন আশি বছরকে এক হুকবা বলা হয়। আর আখিরাতের একদিন এই দুনিয়ার হাজার বছরের সমান।

অতএব, হে আমার দ্বীনী ভাইয়েরা! আপনাদের জীবনের মূল্যবান সময়কে ফায়দাহীন কাজে ব্যয় করবেন না। সময়ের মূল্য বুঝতে চেষ্টা করুন। সর্বোত্তম কাজে সময়কে ব্যয় করুন। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, '**সবচেয়ে বড় মুসিবত হল, সময়কে ফায়দাহীন কাজে নষ্ট করা**'। আপনাদের নামাজসমূহকে ওয়াক্তমত আদায় করুন যাতে হাশরের ময়দানে অনুশোচিত না হয়ে প্রচুর সওয়াব অর্জনের সৌভাগ্য হয়। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, '**কেউ যদি কোন ওয়াক্তের নামাজকে সময়মত আদায় না করে ক্বাযা করে এবং তা আদায়ের পূর্বেই তার মৃত্যু হয় তবে তার কবরে জাহান্নামের দিকের সত্তরটি জানালা খুলে দেয়া হয় এবং সে সেখানে কিয়ামত পর্যন্ত আজাব ভোগ করতে থাকে**'। কোন নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার পর কেউ যদি জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ নামাজ আদায় না করে এবং ওয়াক্ত পার হওয়ার সময় নামাজ আদায় করতে না পারার কারণে কোন ধরনের অনুশোচনাও না করে তাহলে সে দ্বীনহীন হয়ে যায় কিংবা ঈমানহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এমতাবস্থায় যারা নামাজ আদায়ের কথা স্মরণও করল না, নামাজকে কর্তব্য হিসেবেই বিবেচনা করল না তাদের কি হবে? নামাজকে অবমূল্যায়ন করলে, কর্তব্য হিসেবে মেনে না নিলে যে ব্যক্তি **মুরতাদ্** তথা কাফির হয়ে যায় তা চার মাজহাবের সমস্ত আলিম মতৈক্যসহ জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত আবদুল গনী নাবলুসী (র:) তার '**হাদিকাতুন নাদীয়া**' গ্রন্থের 'কথার বিপদসমূহ' নামক অধ্যায়ে লিখেছেন যে, নামাজকে ইচ্ছাকৃতভাবে আদায় না করে পরবর্তীতে ক্বাযা আদায়ের ব্যাপারেও কোন ধরনের ইচ্ছাপোষন না করলে এবং এর জন্য যে আযাব ভোগ করতে হবে তা অস্বীকার কিংবা অবজ্ঞা করলে ব্যক্তি **মুরতাদ** তথা কাফির হয়ে যায়।

হযরত ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ-ই আলফে সানী (র:) তার '**মাকতুবাত**' এর প্রথম খন্ডের ২৭৫তম মাকতুবে (পত্রে) বলেছেন যে:

তোমাদের এই নিয়ামত প্রাপ্তি মূলত, ইসলামিয়্যাতের ইলম্ শিক্ষা ও ফিকহ্'এর হুকুমসমূহের প্রসারের কারণে হয়েছে। পূর্বে এসব স্থানে অজ্ঞতার আখড়া ছিল, অসংখ্য বিদাআতের প্রচলন ছিল। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তার প্রিয় বান্দাদের মুহাব্বত দান করেছেন। ইসলামিয়্যাতের

প্রচারের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে উছিলা তথা মাধ্যম করেছেন। অতএব, দ্বীনের জ্ঞান অর্জনে ও ফিকহের হুকুম-আহকামকে প্রসারের ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা কর। এই দুটি বিষয়ই সমস্ত সৌভাগ্যের মূল, উন্নতির মাধ্যম ও মুক্তির উপায়। তাই এব্যাপারে অত্যাধিক চেষ্টা কর। নিজেকে দ্বীনের খাদেম হিসেবে গড়ে তোল! অত্র এলাকার অধিবাসীদের 'আমর্ বিল-মা'রুফ' (সৎ কাজের আদেশ) ও 'নাহই আনিল-মুনকার' (অসৎ কাজের নিষেধ) করার মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা দাও। সূরা মুযাম্মিল-এর উনিশতম আয়াতে (তাফসীর আলেমদের প্রদত্ত অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে, '**আপন প্রভুর সন্তুষ্টি প্রত্যাশীর জন্য অবশ্যই এতে নসিহত রয়েছে**'।

প্রথম অধ্যায়
ঈমান ও নামাজ
প্রত্যেকের প্রথমে ঈমানগ্রহণ আবশ্যক

মানুষ দুনিয়াতে সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করুক আর আখিরাতে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জন করুক এটিই মহান আল্লাহ্ তা'আলা চাইছেন। আর এজন্যই সৌভাগ্য অর্জনের পথকে সুগম করবে এমনকিছু করার জন্যই আদেশ দিয়েছেন এবং ধ্বংস ও অনিষ্টের কারণ হবে এমন ক্ষতিকর কিছু করতে নিষেধ করেছেন। মানুষের জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রথম আদেশ হল ঈমান গ্রহণ কর। সমস্ত মানুষেরই ঈমান গ্রহণ করা আবশ্যক।

ঈমান-এর শাব্দিক অর্থ হল, কাউকে সত্যবাদী হিসেবে জানা, তাকে বিশ্বাস করা। ইসলামের পরিভাষায় ঈমান হল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পয়গম্বর, আল্লাহর কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রেরিত সংবাদদাতা তথা **নবী**, এব্যাপারে সঠিকভাবে জানা ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে মুখে বলা এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা সংক্ষেপে জানিয়েছেন তা সংক্ষেপে আর যা বিস্তারিত জানিয়েছেন তা বিস্তারিতভাবে জানা ও বিশ্বাস করা এবং মুখে সাধ্যানুযায়ী **কালিমা-ই শাহাদাত** বলা। শক্তিশালী ঈমান হল, আগুন যে পোড়ায় আর সাপের বিষে যে মৃত্যু হয় তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করার কারণে আগুন ও সাপ থেকে যেভাবে মানুষ পলায়ন করে ঠিক তেমনিভাবে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ও তার সিফাত্-এর বিশালত্ব জেনে ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তার সৌন্দর্যের প্রতি ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ছুটে যাওয়া আর তার পরাক্রমশীলতা ও গজব থেকে পলায়ন করা, মর্মর পাথরে খোঁদাই করে লিখার মত অন্তরে সুদৃঢ়ভাবে ঈমান স্থাপন করা।

ঈমান হল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আনীত জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণরূপে মেনে নেয়া, পছন্দ করা, ক্বলবের দ্বারা সত্যায়ন করা অর্থাৎ মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। যারা তা বিশ্বাস করে তারাই **মুমিন** ও **মুসলমান** হিসেবে গণ্য হয়। প্রত্যেক মুসলমানই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হতে ও তার প্রদর্শিত পথে চলতে বাধ্য। তার পথ হল পবিত্র কুরআনের প্রদর্শিত পথ। এই পথকেই **ইসলামিয়্যাত** বলা হয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথকে অনুসরণ করতে হলে প্রথমে ঈমান গ্রহণ করতে হবে, তারপরে '**আহকামে ইসলামিয়্যা**'কে অর্থাৎ মুসলমানিত্বকে ভালভাবে জানতে হবে, ফরজসমূহ পালন করতে হবে, হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে এরপরে পর্যায়ক্রমে সুন্নাতসমূহ পালন করতে হবে, মাকরুহ থেকে বিরত থাকতে হবে, সম্ভব হলে মুবাহ বা মুস্তাহাবও পালন করতে হবে।

আমাদের ধর্মের মূল ভিত্তি হল ঈমান। যার ঈমান নাই তার কোন ইবাদত বা সৎকর্ম আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করবেন না এবং কবুলও করবেন না। যে ব্যক্তি মুসলমান হতে চায় তার উচিত প্রথমে ঈমান গ্রহণ করা, তারপরে গোসল, অজু, নামাজ ও পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য ফরজ ও হারাম সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা।

সহীহ ঈমান

ইন্দ্রিয়ের ও বিবেকের দ্বারা অর্জিত বিদ্যা আমাদের ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। বিজ্ঞান, বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিষয় আমাদের সামনে তুলে ধরে দেখিয়ে দেয় যে, এ সবকিছু কাকতালীয় হতে পারে না, অবশ্যই একজন স্রষ্টা রয়েছেন যার আদেশের অনুগত হয়ে এ জগত টিকে আছে। এভাবে বিজ্ঞান স্রষ্টাকে বুঝতে, জানতে ও ঈমান গ্রহণের জন্যে সবব (কারণ) হয়। ঈমানের প্রকৃত অর্থ হল, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মহান আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আনা আদেশ-নিষেধ ও জীবন দর্শন সম্পর্কে শিখে তা বিশ্বাস করা। যে সব বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তা যদি আকল তথা মানবিক বিচার-বিশ্লেষণের সাথে মিলে তবেই ঈমান আনব, এ কথা বলা পয়গম্বরদের প্রতি ঈমান না আনার শামিল। সত্য দ্বীনের মৌলিক বিশ্বাসের বিষয়গুলি কোন বিদ্বান ব্যক্তির আবিষ্কার নয়। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনকে যেভাবে শিখিয়েছেন, তা '**আহলি সুন্নাত আলেম**'দের কিতাবসমূহ থেকে সঠিকভাবে জেনে সেভবে বিশ্বাস করা উচিত। সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ঈমানের অধিকারী হতে হলে নিম্নোক্ত শর্তসমূহও মেনে চলা উচিত।

১. ঈমান তথা বিশ্বাস নিয়মিত, স্থায়ী ও অবিচল হওয়া উচিত। এক মুহুর্তের জন্যও তা থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। কেউ যদি বলে, তিন বছর পর আমি ঈমান থেকে বের হয়ে যাব, তার ঈমান এ কথা বলার মুহুর্ত থেকেই ভঙ্গ হয়ে যায়। সে আর মুসলামান থাকে না।

২. মুমিনের বিশ্বাস, ভীতি ও আশার মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখে। মহান আল্লাহর শাস্তির ভয়ে থরথর করে কাঁপে আবার আল্লাহ্ তা'আলার অসীম রহমত থেকেও একমুহুর্তের জন্য নিরাশ হয় না। ছোট বড় সব ধরনের গুনাহ থেকেই বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। গুনাহ এর কারণে যেন ঈমান নষ্ট না হয় সে জন্য সর্বদা ভীত থাকা উচিত। আবার সমস্ত গুনাহ করার পরও মহান আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে ক্ষমা করতে পারেন। তাই তার রহমতের ব্যাপারেও নিরাশ হওয়া ঠিক নয়। কৃত গুনাহের জন্য সর্বদাই তওবা করা উচিত। কেননা যার তওবা কবুল হয় সে পুরোপুরি নিস্পাপ হয়ে যায়।

৩. রূহ ক্ববজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে রূহ যখন গলা পর্যন্ত চলে আসে তার আগেই, ঈমান গ্রহণ করা উচিত। কেননা রূহ যখন গলা পর্যন্ত চলে আসে তখন আখিরাতের সবকিছুই চোখের সামনে ভেসে উঠে। ঐ অবস্থায় কাফিররা ঈমান গ্রহণ করতে চাইবে। কিন্তু ঈমানতো গায়বি বিষয়ে

হওয়া উচিত। না দেখে বিশ্বাস করার নামই ঈমান। অতএব, দৃশ্যমান কোন কিছুর উপর ঈমান আনা অবান্তর। জান ক্বজের আগ পর্যন্ত মুমিনের তওবা কবুল হয়।

৪. সূর্যের পশ্চিম দিক থেকে উদয়ের পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করা উচিত। কিয়ামতের সবচেয়ে বড় আলামতসমূহের মধ্য থেকে একটি হল, সূর্যের পশ্চিম দিক দিয়ে উদয় হওয়া। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে তখন সমস্ত মানুষ তা দেখে ঈমান গ্রহণ করবে। কিন্তু এই ঈমান গ্রহণ করা হবে না। কেননা তখন তওবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে।

৫. মহান আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কেউই গায়িব তথা অদৃশ্য জগত সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না, এটা বিশ্বাস করা। অর্থাৎ গায়িব কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তিনি বিশেষ অনুগ্রহ করে যদি কাউকে গায়িবের বিষয়ে জানান তবেই সে জানতে পারে। ফেরেশতা, জ্বিন, শয়তান এমনকি পয়গম্বররাও নিজ থেকে গায়িব জানতে পারে না। মহান আল্লাহ্ তা'আলাই তার প্রেরিত নবী-রাসূলদের ও সালিহ বান্দাদের কখনো কখনো গায়িবের বিষয়ে জানিয়ে থাকেন।

৬. ঈমান ও ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত দ্বীনী হুকুমসমূহের কোনটি, কোন ধরনের জারুরাত কিংবা উজর না থাকলে ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা উচিত নয়। আহকামে ইসলামিয়া অর্থাৎ ইসলামের আদেশ ও নিষেধসমূহের কোনটিকে হাল্কাভাবে নেয়া, পবিত্র কুরআনকে অবজ্ঞা করা, ফেরেশতা ও নবীগণদের থেকে একজনকে নিয়েও উপহাস করা এবং তাদের মাধ্যমে যে আদর্শ ও বিশ্বাস শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা কোনধরনের বাধ্যবাধকতা না থাকা স্বত্বেও মৌখিকভাবে অস্বীকার করা, কুফুরীর শামিল। তবে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব, নামাজ ও গোসলের ফরজ হওয়া ইত্যাদির মত বিষয়, যদি মৃত্যুর হুমকি থেকে বাঁচার জন্য মৌখিকভাবে অস্বীকার করে সেক্ষেত্রে ব্যক্তি কাফির হয় না। কেননা মৃত্যুর হুমকি থেকে বাঁচার চেষ্টা, জারুরাত হিসেবে বিবেচিত হয়।

৭. ইসলাম ধর্মের প্রয়োজনীয় যেসব বিষয়ে শরীয়ত কর্তৃক স্পষ্ট বিধান দেয়া হয়েছে সেসব বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা কিংবা দ্বিধা-দন্দে ভোগা উচিত নয়। নামাজ আদায় করা ফরজ, মদ ও অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পান করা, জুয়া খেলা, সুদ ও ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি শরীয়তে হারাম করা হয়েছে। এগুলি নিয়ে সন্দেহ পোষণ করলে অথবা এর মত প্রসিদ্ধ কোন হারামকে হালাল হিসেবে কিংবা প্রসিদ্ধ কোন হালালকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করলে ঈমান ভঙ্গ হয়ে যায়।

৮. ঈমান, ইসলাম ধর্ম যেভাবে শিখিয়েছে সেভাবেই হওয়া উচিত। নিজ বিচার-বিশ্লেষণ ও বুঝ অনুযায়ী, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী বিশ্বাস করলে, তা ঈমান হবে না। আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে শিখিয়েছেন ঠিক সেভাবেই ঈমান তথা বিশ্বাস করতে হবে।

৯. ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তি, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্‌তুষ্টি অর্জনের জন্যই কাউকে ভালবাসবে কিংবা কারো সাথে শত্‌রুতা পোষণ করবে। তার উচিত, আল্লাহর প্রিয় দোস্ত তথা মুসলমানদেরকে ভালোবাসা এবং হাত, কলম ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে যারা ইসলামের বিরোধিতা করে তাদেরকে অপছন্দ করা, তাদের বিরুদ্ধে মনে মনে শত্‌রুতা পোষণ করা।

[তবে একটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে, সাধারন অমুসলিম নাগরিক ও পর্যটকদের সাথে সর্বদা নম্র ও আন্তরিক ব্যবহার করা উচিত। তাদের সাথে মিষ্টিভাষী হওয়া উচিত। আমাদের সুন্দর আখলাকের দ্বারা তাদের মন জয় করার চেষ্টা করা উচিত যাতে তাদের হৃদয়ে আমাদের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে ভাল ধারনা জন্মে।]

১০. প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদের প্রদর্শিত সঠিক পথ থেকে সামান্যতম বিচ্যুত না হয়ে, প্রকৃত মুসলমানেরা যেভাবে ঈমানকে গ্রহণ করেছে, ঠিক তেমন ঈমান গ্রহণ করা উচিত। সত্যিকার অর্থেই মুমিন হতে হলে, আহলি সুন্নাত ওয়াল জামাতের ই'তিক্বাদ অনুযায়ী ঈমান গ্রহণ করা জরুরী। [আহলি সুন্নাতের অনুসারী আলিমদের কর্তৃক রচিত, প্রকৃত দ্বীনী কিতাবসমূহের অনুসারীদের একশত শহীদের সমতুল্য সওয়াব দেয়া হবে। চার মাজহাবের প্রত্যেকটির অনুসারী আলিমদেরকে **আহলি সুন্নাতের আলিম** হিসেবে গণ্য করা হয়। আহলি সুন্নাতের অনুসারী আলিমদের প্রধান হলেন, ইমাম আযম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি। এই আলিমগণ রাসূলের সম্মানিত সাহাবীদের কাছ থেকে ইসলামকে শিখে লিপিবদ্ধ করেছিলেন আর সাহাবীগণ ইসলামকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে দেখে, শুনে শিখেছেন ও পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন।]

আহলি সুন্নাতের ই'তিক্বাদ

মুসলমান হওয়ার প্রথম শর্ত হল ঈমান গ্রহণ করা। সহীহ ঈমান, আহলি সুন্নাতের ই'তিক্বাদ অনুযায়ী বিশ্বাস করার সাথে সম্পর্কিত। আকলের অধিকারী ও বালিগ হওয়ার বয়স হয়েছে এমন প্রত্যেক নর ও নারীর প্রথম কর্তব্য হল, আহলি সুন্নাত আলিমদের রচিত কিতাবসমূহ থেকে ঈমানের বিষয়ে শিখা এবং সে অনুযায়ী বিশ্বাস স্থাপন করা। রোজ কিয়ামতের দিবসে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারা আহলি সুন্নাতের ই'তিক্বাদ অনুযায়ী বিশ্বাস করার সাথে সম্পর্কিত। শুধুমাত্র **আহলি সুন্নাতে**র অনুসারীরাই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারবে। এই পথের অনুসারীদেরকে **সুন্নী**ও বলা হয়।

একটি হাদিস শরীফে বর্নিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, '**আমার উম্মত তেহাত্তরটি ফিরকায় (দলে) বিভক্ত হয়ে যাবে। এগুলির মধ্য থেকে কেবলমাত্র একটি ফিরকা জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। বাকী সবগুলি ধ্বংসের সম্মুখীন হবে ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে**'। এই তেহাত্তরটি ফিরকার সবগুলিই নিজেদেরকে ইসলামের

অনুসারী দাবী করে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত একমাত্র ফিরকা হিসেবে নিজেদেরকেই বেঁছে নেয়। পবিত্র কুরআনের সূরা মুমিনুন এর ৫৪তম আয়াতে এবং সূরা রূমের ৩২তম আয়াতে (তাফসীর আলেমদের প্রদত্ত অর্থানুযায়ী) বলা হয়েছে যে, '**প্রত্যেক ফিরকাই নিজেদেরকে সঠিক পথে মনে করে আনন্দিত হবে**'। অথচ, এই সমস্ত ফিরকাগুলি থেকে মুক্তিপ্রাপ্তটির আলামত ও ইশারাতসমূহ, স্বয়ং পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, '**মুক্তিপ্রাপ্ত ফিরকাটি হল আমার ও সাহাবীদের চলিত পথের অনুসারীদের দল**'। এ জন্যই রাসূলের সম্মানিত সাহাবীদের মধ্যে থেকে একজনকেও যে অপছন্দ করল সে আহলি সুন্নাত থেকে নিজেকে বের করে নিল। আর আহলি সুন্নাতের ই'তিক্বাদকে যারা অনুসরণ করে না, তারা হয় কাফির নতুবা (**আহলি বিদাআত)** পথভ্রষ্ট হয়।

আহলি সুন্নাতের ই'তিক্বাদের আলামতসমূহ

মহান আল্লাহ্ তা'আলা, আহলি সুন্নাতের ই'তিক্বাদ অনুযায়ী ঈমান গ্রহণকারী মুসলমানের উপর সন্তুষ্ট হোন। এরূপ ঈমান গ্রহণের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। শর্তগুলি নিম্নে বর্নিত হল:

১. ঈমানের ছয়টি শর্তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এগুলি হল, আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের উপর এবং তিনি অদ্বিতীয় ও শরিকহীন তা বিশ্বাস করা, ফেরেশতাদের, আসমানী কিতাবসমূহের, পয়গম্বরদের ও আখিরাতের জীবনের প্রতি এবং ভাল মন্দ যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর সৃষ্টি তা বিশ্বাস করা। (এই বিষয়গুলি '**আমানতু বিল্লাহি**' এর মধ্যে আছে।)

২. মহান আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআন যে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম তা বিশ্বাস করা।

৩. মুমিন ব্যক্তির, নিজের ঈমানের ব্যাপারে কখনই সন্দেহ পোষণ করা ঠিক নয়।

৪. প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল হিসেবে ঈমান এনে, জীবদ্দশায় তার দর্শনের সৌভাগ্য অর্জনকারী সম্মানিত সাহাবীদের প্রত্যেককেই ভালোবাসা উচিত। বিশেষ করে চার খলিফা, রাসূলের নিকটাত্মীয় তথা আহলি বাইত ও তার (স:) সম্মানিত স্ত্রীগণের কারো সম্পর্কে কোন ধরনের কটু কথা বলা উচিত নয়।

৫. ইবাদতসমূহকে ঈমানের অংশ হিসেবে মনে করা উচিত নয়। মহান আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধকে বিশ্বাস করা স্বত্বেও অলসতার কারণে পালন না করা মুমিনদেরকে কাফির হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। তবে যারা হারামকে গুরুত্বহীন মনে করবে, অবজ্ঞা করবে এবং ইসলামকে নিয়ে উপহাস করবে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

৬. যারা কা'বাকে কিবলা হিসেবে মেনে নিয়েছে, মহান আল্লাহ্ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছে বলে দাবী করে, তারা ভ্রান্ত ই'তিকাদের অনুসারী হলেও তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।

৭. ইমামের ব্যাপারে প্রকাশ্যে গুনাহের কাজ করে এমন কিছু জানা না থাকলে, তার পিছনে নামাজ আদায় করতে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়। এই হুকুম, জুমার ও ঈদের নামাজের ইমামতির দ্বায়িত্বে নিয়োজিত প্রশাসক কিংবা সরকারী কর্মকর্তাদের জন্যও প্রযোজ্য।

৮. মুসলমানগণের উচিত, তাদের আমীর কিংবা প্রশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকা। কেননা, বিদ্রোহ করার মাধ্যমে সমাজে ফিতনার সৃষ্টি হয় ও বিপর্যয় নেমে আসে। শাসকদের যে সমস্ত ভালোকাজ আছে তার জন্য দোয়া করা উচিত আর অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য নাসিহত করা উচিত।

৯. অজু করার সময়, পা ধৌত করার বদলে কোন ধরনের উজর কিংবা জারুরাত না থাকা স্বত্বেও ভিজা হাত দিয়ে একবার মাসত্ (চামড়ার মোজা)এর উপর মাসেহ করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই জায়েজ। তবে নগ্ন পা কিংবা মোজার উপরে মাসেহ করা জায়েজ নয়।

১০. মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাজ শুধুমাত্র রূহের ক্ষেত্রে নয় বরং রূহের সাথে সাথে শারীরিকভাবেও উর্দ্ধগমন সংঘটিত হয়েছিল। যারা বলে, 'মিরাজ একধরনের আধ্যাত্মিক অবস্থা, স্বপ্নে হয়েছিল' তারা আহলি সুন্নাতের ই'তিক্বাদ থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

জান্নাতে মুমিনগণ মহান আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভ করবেন। কিয়ামতের দিবসে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সালিহবান্দাগণ শাফায়াতের অনুমতি পাবেন। কবরের সওয়াল (প্রশ্ন) বিদ্যমান। কবরের শাস্তি, রূহ ও শরীর ভোগ করবে। আল্লাহর আউলিয়াদের কারামত সত্য। কারামত হল, মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের থেকে প্রকাশ পাওয়া অলৌকিক ঘটনা, যা আদাতুল্লাহ অর্থাৎ পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞানের নিয়ম বহির্ভুত এবং মহান আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও দান। এত সংখ্যক কারামতের নজীর আছে যে এর অস্তিত্ব অস্বীকারের উপায় নাই। কবরের জগতে রূহেরা, জীবন্ত ব্যক্তিদের কথা ও কাজের ব্যাপারে শুনতে পায়। কুরআন করীমের তিলাওয়াত, সদকা প্রদান, এমনকি সব ধরনের ইবাদতের সওয়াবসমূহ মৃত ব্যক্তিদের রূহকে বখশিশ করা যায় এবং তারা এর দ্বারা উপকৃত হয়, এই সওয়াব তাদের আযাব তথা শাস্তি হ্রাস করার কিংবা মাফ করে দেয়ার কারণ হয়। এসব কিছুই আহলি সুন্নাতের ই'তিক্বাদের আলামত হিসেবে বিবেচিত।

ঈমানের শর্তসমূহ

ঈমানের শর্ত ছয়টি। এগুলি 'ঈমানে মুফাস্‌সাল' তথা 'আমান্‌তু বিল্লাহি' নামক কালিমার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঈমান যে এই নির্দিষ্ট ছয়টি বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন। একারণেই প্রত্যেক মুসলমান মাতাপিতার কর্তব্য হল নিজ সন্তানদেরকে প্রথমেই ঈমানে 'মুফাস্‌সাল' মুখস্ত করানো, একইসাথে এর অর্থ ও ব্যাখ্যা ভালভাবে শিখানো।

ঈমানে মুফাস্‌সাল: আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়া বিল কাদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়াল বা'ছু বা'দাল মাউতি হাক্কুন, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

প্রথম শর্ত

আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করা

'**আমানতু বিল্লাহি**' এর অর্থ হল: আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে এবং একত্ববাদকে বিশ্বাস করলাম, ঈমান আনলাম, ক্বালবের দ্বারা সত্যায়ন করলাম ও মুখে স্বীকার করলাম। মহান আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব বর্তমান এবং তিনি একক। অভিধানে এক শব্দের দুই ধরণের অর্থ রয়েছে। প্রথমটি হল সংখ্যা বুঝায়, যা দুইয়ের অর্ধেক ও প্রথম সংখ্যা। অপরটি হল, অংশীদার ও সমকক্ষ কেউ না থাকার দৃষ্টিকোণ থেকে এক হওয়া। মহান আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয় এবং তার সমকক্ষ কেউ নাই, তার কোন শরীক নাই। অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তা'আলার জাত ও সিফাত এর ক্ষেত্রে কোনভাবেই তার কোন শরীক নাই। সমস্ত সৃষ্টির ব্যক্তিসত্ত্বা ও মৌলিক বৈশিষ্টসমূহ যেমনিভাবে তাদেরকে সৃষ্টিকারী মহান আল্লাহ্‌র জাত ও সিফাতের অনুরূপ হয় না, ঠিক তেমনিভাবে মহান স্রষ্টার জাতিসত্ত্বা ও সিফাতসমূহও তার সৃষ্ট কোনকিছুর জাত ও সিফাতের অনুরূপ হতে পারে না।

সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, প্রত্যেকটি কোষের স্রষ্টা ও তাদেরকে শূন্য থেকে অস্তিত্ব প্রদানকারী হলেন শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা। মহান আল্লাহ তা'আলার জাতের হাক্বীকাত সম্পর্কে কারো পক্ষেই জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। তার জাত সম্পর্কে মানুষের আকল ও কল্পনায় যা কিছুই আসে না কেন তার থেকে তিনি পবিত্র। কেননা তার জাতের ধরণ সম্পর্কে ধারণা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। একারণেই তার জাতকে কল্পনা করা বা ধারণা করা জায়েজ নয়। শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনে তার যে সমস্ত ইসম্ ও সিফাতের বর্ননা দেয়া হয়েছে, সেগুলিকে রপ্ত করে সে অনুযায়ী মহান আল্লাহ্‌র উলুহিয়্যাতকে সত্যায়ন ও স্বীকার করা উচিত। আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত ইসিম ও সিফাতই চিরন্তন ও

চিরস্থায়ী। আর তাঁর জাত স্থান, কাল ও পাত্রের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে যেমনিভাবে পবিত্র, ঠিক একইভাবে জ্ঞাত যেকোন দিকের সাথেও সম্পৃক্ত নয়। অর্থাৎ সামনে-পিছনে, ডানে-বামে, উপরে-নিচে ইত্যাদি দিকের দ্বারা তাঁর অবস্থানের ব্যাখ্যা দেয়া অসম্ভব। শুধুমাত্র একারণেই

বলা যায় যে, **তিনি সর্বত্রই হাজির ও নাজির রয়েছেন**।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার চৌদ্দটি বিশেষ সিফাত রয়েছে। এগুলির ছয়টিকে **সিফাত-ই জাতিয়্যা** আর বাকী আটটিকে **সিফাত-ই সুবুতিয়্যা** বলা হয়। এগুলিকে মুখস্ত করা ও অর্থ সম্পর্কে সম্যক ধারা রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

সিফাত-ই জাতিয়্যা

১. **উজুদ:** আল্লাহ্ তা'আলা অস্তিত্ববান। তাঁর অস্তিত্ব চিরন্তন-চিরস্থায়ী। তিনি 'ওয়াজিবুল উজুদ' অর্থাৎ, তাঁর অস্তিত্ব আবশ্যক।

২. **কিদাম:** আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের পূর্ব বা শুরু বলতে কিছু নাই। তিনি অনাদি।

৩. **বাকা'**: আল্লাহ্ তা'আলায় অস্তিত্বের শেষ বলতেও কিছু নাই। তিনি চিরন্তন-চিরস্থায়ী। সর্বদা বিরাজমান। তাঁর শরীক বা অংশীদার থাকা যেমনিভাবে অসম্ভব ঠিক একইভাবে তাঁর জাত ও সিফাতের জন্য বিলুপ্তিও অসম্ভব।

৪. **ওয়াহদানিয়্যাত:** মহান আল্লাহ্ তা'আলার জাত, সিফাত ও কর্মের সাথে কোন কিছুরই কোন ধরণের অংশীদারিত্ব, সমকক্ষতা বা সাদৃশ্যতা নাই।

৫. **মুখালাফাতুন লিল হাওয়াদিস্**: মহান আল্লাহ্ তা'আলার জাত ও সিফাতসমূহের সাথে কোন মাখলূকের জাত বা সিফাতের কোন ধরণের সাদৃশ্যতা নাই।

৬. **কিয়াম বি-নাফসিহি:** আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আপন জাতের উপর অধিষ্ঠিত। তাঁর অস্তিত্ব কোন স্থান, কাল বা পাত্রের সাথে সম্পর্কিত নয়। বস্তুজগত ও স্থানের সৃষ্টির পূর্বেও তিনি বিদ্যমান ছিলেন। একইভাবে তিনি কোন বিষয়েই কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন। এই সৃষ্টিজগতকে শূন্য থেকে অস্তিত্ব দানের পুর্বে তাঁর জাত বা সত্ত্বা যেমন ছিল, তেমনিভাবে অনন্তকাল বিদ্যমান থাকবে।

সিফাত-ই সুবুতিয়্যা

১. **হায়াত**: আল্লাহ্ তা’আলা হায়াতের অধিকারী। মাখলূক বা সৃষ্টির হায়াতের সাথে তাঁর হায়াতের কোন সাদৃশ্যতা নেই। তাঁর হায়াত তাঁর সত্ত্বার জন্য বিশেষায়িত ও উপযুক্ত এবং তা চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

২. **ইলম:** আল্লাহ্ তা’আলা সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁর কোন কিছু সম্পর্কিত জ্ঞান মাখলূকের জ্ঞানের মত নয়। তিনি অন্ধকার রাতে কোন কালো পাথরের উপর দিয়ে কোন কালো পিঁপড়ার চলাফেরাও দেখতে পান ও সে সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। আবার মানুষের মনের গোপন চিন্তাভাবনা ও নিয়্যাত সম্পর্কেও পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তাঁর জ্ঞানের কোন পরিবর্তন নাই। তা চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

৩. **সাম’**: মহান আল্লাহ্ তা’আলা হলেন সর্বশ্রোতা। তিনি কোন ধরণের মাধ্যম বা যন্ত্র ছাড়াই সরাসরি শ্রবণ করেন। বান্দার শ্রবণ করার সাথে তাঁর শ্রবণের কোন সামাঞ্জষ্য নেই। এই সিফাতটিও অন্যান্য সিফাতের মত চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

৪. **বাস্র**: মহান আল্লাহ্ তা’আলা সর্বদ্রষ্টা। তাঁর দেখাও শ্রবণের মতই কোন ধরণের মাধ্যম বা যন্ত্র ছাড়াই সম্পন্ন হয়। তিনি কোন চোখের দ্বারা দেখেন না।

৫. **ইরাদা**: মহান আল্লাহ্ তা’আলার ইরাদা বা ইচ্ছাশক্তি বিদ্যমান। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন। সবকিছুই তাঁর ইচ্ছার দ্বারাই অস্তিত্ব অর্জন করে। তাঁর ইরাদার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাঁধা

প্রদান করতে পারে এমন কোন কুদরত বা শক্তি নাই।

৬. **কুদরত:** মহান আল্লাহ্ তা’আলা সর্বক্ষমতাময় ও সর্বশক্তিমান। তাঁর সাধ্যাতীত বলতে কিছুই নাই। তাঁর পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব।

৭. **কালাম:** আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর মত প্রকাশ করেন। তবে তাঁর কথা বলা কোন মাধ্যম, হরফ, আওয়াজ কিংবা ভাষার মাধ্যমে নয়।

৮. **তাকভীন্:** আল্লাহ্ তা’আলা হলেন সর্বশ্রষ্টা। তিনি ব্যতীত আর কোন স্রষ্টা নাই। সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ তা’আলা ব্যতীত আর কাউকেই স্রষ্টা বলা যায় না।

আল্লাহ্ তা’আলার এইসব সিফাতের প্রকৃত হাক্বীকাত বুঝতে পারাও অসম্ভব। কেউই কিংবা কোন কিছুই মহান আলাহ তা’আলার সিফাতসমূহের ক্ষেত্রে অংশীদার বা সাদৃশ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয় শর্ত

ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস করা

ওয়া মালাইকাতিহি: মহান আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনলাম বলে সাক্ষ্য দেয়া। তারা আল্লাহ্ তা'আলার এক ধরণের সৃষ্টি। তাদের প্রত্যেকেই সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের আনুগত্য করে থাকেন। তাদের দ্বারা কোন ধরণের গুনাহ সম্পাদিত হয় না। তারা পুরুষ বা নারী নন। একারণে তাদের মাঝে বিবাহ বলেও কিছু নাই। তাদের হায়াত আছে। তারা পানাহার করেন না, ঘুমান না। তারা নূরানী দেহের অধিকারী ও আকেল তথা বিবেকবান। তাদের মাঝে চারজন শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা রয়েছেন।

১. **হযরত জিবরাঈল** আলাইহিস্ সালাম: তাঁর দ্বায়িত্ব হল নবী-রাসূলদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার ওহী বহন করে নিয়া আসা। তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কে অবহিত করা।

২. **হযরত ইসরাফিল** আলাইহিস্ সালাম: 'সূর' বা শৃঙ্ঘায় ফুঁৎকারের জন্য দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা। তাঁর প্রথম ফুঁৎকারের আওয়াজ যারা শুনতে পাবে, আল্লাহ্ ব্যতীত জীবন্ত যা কিছু আছে তাদের সবাই মৃত্যুবরণ করবে। দ্বিতীয় ফুঁৎকারের আওয়াজ শুনে সমস্ত জীবের পুনর্জাগরণ হবে।

৩. **হযরত মিকাঈল** আলাইহিস্ সালাম: রিজিক সরবরাহ করা, প্রাচুর্য কিংবা দূর্ভিক্ষের ব্যবস্থা করা, প্রতিটি বস্তুর মাঝে গতির সঞ্চার করা ইত্যাদি তাঁর দ্বায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

৪. **হযরত আজরাঈল** আলাইহিস্ সালাম: মানুষের জান কবজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা।

উনাদের পরে আরো চার শ্রেণীর ফেরেশতা রয়েছেন। '**হামালা-ই আরশ**' বা আরশের বহনকারী চারজন ফেরেশতা রয়েছেন। হুজুর-ই ইলাহী বা আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ফেরেশতাদেরকে '**মুকাররাবুন**' বলা হয়। আজাব প্রদানকারী ফেরেশতাদের বড়দেরকে '**কারুবিয়ান**' আর রহমতের ফেরেশতাদের '**রুহানিয়ান**' বলা হয়। জান্নাতে দ্বায়িত্ব পালনকারী ফেরেশতাদের সর্দারের নাম **রিদওয়ান** আর জাহান্নামের দ্বায়িত্ব পালনকারী ফেরেশতাদের প্রধানের নাম **মালিক**। জাহান্নামের ফেরেশতাদেরকে 'জাবানী' বলা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মাখলূকের মাঝে ফেরেশতাদের সংখ্যা সর্বাধিক। আসমানে এমন কোন শূন্য স্থান নেই যেখানে ফেরেশতাদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করা হয়নি।

তৃতীয় শর্ত

আসমানী কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস

ওয়া কুতুবিহি: মহান আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম বলে সাক্ষ্য দেয়া। মহান আল্লাহ্ তা'আলা এই কিতাবসমূহকে কতিপয় পয়গম্বরের প্রতি হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম মারফত ওহী হিসেবে প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ পাঠ করিয়েছেন, কোন পয়গম্বরের প্রতি 'লাওহা' বা ফলকে লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়েছেন আর কোন পয়গম্বরের প্রতি ফেরেশতাদের মাধ্যমে না পাঠিয়ে সরাসরি গায়েবী আওয়াজের মাধ্যমে শুনিয়ে নাজিল করেছেন। এগুলির সবই আল্লাহ্ তা'আলার কালামের অন্তর্ভুক্ত। এই বিবেচনায় তা চিরন্তন ও চিরস্থায়ী এবং মাখলূকের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলির সবই হক্ব। আসমানী কিতাবসমূহের মধ্য থেকে আমাদেরকে একশ চারটির ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছে। এগুলির মধ্য থেকে **দশটি সুহুফ** হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে, **পঞ্চাশটি সুহুফ** হযরত শিত্ আলাইহিস্ সালামকে, **ত্রিশটি সুহুফ** হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালামকে ও বাকী **দশটি সুহুফ** হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি '**তাওরাত**', হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের প্রতি '**যাবুর**', হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের প্রতি '**ইনজিল**' ও সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি **কুরআন করীম**কে নাযিল করা হয়েছে।

মানুষ যেন এই দুনিয়াতে শান্তির মাঝে বসবাস করতে পারে এবং আখেরাতেও যেন চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে সেজন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলা, প্রথম মানুষ ও প্রথম পয়গম্বর হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম থেকে শুরু করে শেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত বহু পয়গম্বরের মাধ্যমে আসমানী কিতাবসমূহ প্রেরণ করেছেন। এইসব কিতাবের মধ্যে ঈমান ও ইবাদতের মৌলিক বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এগুলির দ্বারা মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।

সর্বশেষ ইলাহী কিতাব হল কুরআন করীম। কুরআন করীমকে প্রেরণ করার পরে, পূর্বের সমস্ত ইলাহী কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এই কুরআন করীমকে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সুদীর্ঘ তেইশ বছরে নিয়ে এসেছেন। কুরআন করীমের ১১৪টি সূরা ও ৬২৩৬টি আয়াত রয়েছে। কিছু কিছু কিতাবে আয়াতের সংখ্যার ব্যাপারে ভিন্নতা পোষণ করা হয়েছে। এর কারণ হল, কোন কোন দীর্ঘ আয়াতকে একাধিক আয়াত হিসেবে গণনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন করীমে, নাযিল হওয়ার সময় থেকে এখন পর্যন্ত কোন ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয়নি, পরবর্তীতেও কোন ধরণের পরিবর্তনের সুযোগ নাই। কুরআন করীম

মহান আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। এরূপ একটি কিতাব মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। এই কিতাবের একটি আয়াতের অনুরূপ পর্যন্ত রচনা করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখেরাতে ইনতিকালের পরে, প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু, কুরআন করীমের আয়াতসমূহকে একত্রিত করার ব্যবস্থা করেছেন। এভাবেই তা একটি **মুসহাফে** পরিণত হল। আসহাব-ই কিরামের প্রত্যেকেই, এই মুসহাফের আল্লাহ্ তা'আলার কালাম হওয়ার বিষয়ে ঐক্যমতের সাথে ঘোষণা দিয়েছেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, এই মুসহাফের আরো ছয়টি অনুলিপি করিয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করেছেন।

পবিত্র কুরআনের আসল রূপ তথা আরবী ভাষা থেকেই তিলাওয়াত করা উচিত। অন্য ভাষার বর্ণের দ্বারা লিখিত হলে তাকে কুরআন করীম বলা হয় না। কুরআন করীমের ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল রাহা উচিত।

ক. কুরআন করীম স্পর্শ করার পূর্বে অজু করে নিতে হবে। কিবলামুখী হয়ে বসে মনোযোগের সাথে তিলাওয়াত করতে হয়।

খ. ধীরে সুস্থে খুশু'এর সাথে তিলাওয়াত করতে হয়।

গ. মুসহাফ দেখে দেখে প্রতিটি আয়াতের হক্ককে যথাযথভাবে পালন করে তিলাওয়াত করা উচিত।

ঘ. তাজবিদের কায়দাসমূহ মেনে তিলাওয়াত করা উচিত।

ঙ. তিলাওয়াত করার সময়ে কুরআন করীমকে মহান আল্লাহ্ তা'আলার কালাম হিসেবে উপলব্ধি করা উচিত।

চ. কুরআন করীমে আমাদের জন্য যে আদেশ ও নিষেধ রয়েছে তা জীবনে বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

চতুর্থ শর্ত

পয়গম্বরদের প্রতি ঈমান

ওয়া রাসূলিহি: আল্লাহ্ তা’আলার মনোনীত সকল পয়গম্বরের উপর ঈমান আনলাম বলে সাক্ষ্য দেয়া। পয়গম্বরগণ, মহান আল্লাহ্ তা’আলার পছন্দনীয় পথের সন্ধান দেয়ার জন্য, সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। সমস্ত পয়গম্বরগণ একই ঈমানের কথা বলে গিয়েছেন। পয়গম্বর আলাইহিমুস্ সালামদের সাতটি বিশেষ সিফাত রয়েছে। এগুলিকে বিশ্বাস করা জরুরী।

১. **ইস্‌মত**: যার দ্বারা কোন ধরণের গুনাহের কাজ সম্পাদিত হয় না অর্থাৎ নিষ্পাপ। পয়গম্বরগণ যে কোন শরীয়ত অনুযায়ী হারাম হয়েছে বা হবে এমন কোন ছোট বা বড় গুনাহের কাজ করেননি।

২. **আমানত**: পয়গম্বরগণ সকল দিক দিয়েই বিশ্বস্ত ছিলেন। কোনভাবেই তাদেরকে প্রদত্ত আমানতের খেয়ানত করেননি।

৩. **সিদক**: পয়গম্বরগণ তাদের কথাবার্তায়, কাজেকর্মে ও সকল ধরণের আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সর্বদাই সৎ ও সঠিক ছিলেন। কখনোই মিথ্যার আশ্রয় নেননি।

৪. **ফাতানাত**: পয়গম্বরগণ খুবই মেধাবী ও বুঝমান ছিলেন। অন্ধ, বোবা এরূপ শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী কেউ পয়গম্বর হননি। মহিলাদের থেকেও কোন পয়গম্বর প্রেরিত হননি।

৫. **তাবলীগ**: পয়গম্বরগণ মানুষের মাঝে যা কিছু প্রচার করেছেন তার সবই নিজেরা মহান আল্লাহ্ তা’আলার পক্ষ থেকে আসা ওহীর মাধ্যমে রপ্ত করেছেন। তাদের প্রচারিত আদেশ ও নিষেধের কোনটিই তাদের মনগড়া নয়। এগুলির প্রত্যেকটিই মহান আল্লাহ্ তা’আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে।

৬. **আদালত**: পয়গম্বরগণ কখনো জুলুম বা অন্যায় করেননি। কোন ধরণের আবেগের বশবর্তী হয়ে কখনোই আদালত থেকে নূন্যতম ছাড় দেননি।

৭. **আমনুল আযল্**: পয়গম্বরগণ কখনোই তাদের নবুয়্যত থেকে বহিষ্কৃত হননি। দুনিয়া ও আখেরাত, সর্ববস্থায় তাদের নবুয়্যত বহাল থাকবে।

যে সকল পয়গম্বর নতুন শরীয়ত বা আহকাম নিয়ে এসেছেন তাদেরকে **রাসূল** বলা হয়। নতুন কোন শরীয়ত না এনে পূর্ববর্তী শরীয়তের প্রচারকারী পয়গম্বরদের **নবী** বলা হয়। পয়গম্বরদের উপর ঈমান আনা বলতে, তাদের পরস্পরের মাঝে কোন ধরণের ভেদাভেদ না করে প্রত্যেককেই মহান আল্লাহ্ তা’আলার পক্ষ থেকে নির্বাচিত সাদিক বা সত্যবাদী হিসেবে বিশ্বাস করাকে

বুঝায়। কেউ যদি তাদের মধ্য থেকে কোন একজনকেও নবী হিসেবে অস্বীকার করে তবে তা সকল পয়গম্বরকেই অস্বীকার করার শামিল হবে।

কঠোর সাধনা করে, অনেক বেশি ইবাদত করে, ক্ষুধার কষ্ট ও অন্যান্য যন্ত্রণা ভোগ করে নবুয়্যত অর্জন করা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ ইহসান বা কৃপার দ্বারা যাকে মনোনীত করবেন তিনিই পয়গম্বর হতে পারেন। তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। তবে এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের চেয়ে বেশি হওয়ার ব্যাপারটি মশহুর হয়েছে। তাঁদের মাঝ থেকে তিনশত তের কিংবা তিনশত পনের জন একইসাথে রাসূলও ছিলেন। তাঁদের মাঝ থেকে ছয়জন ছিলেন অধিক মর্যাদাবান। তাঁদেরকে '**উলুল্ আযম**' পয়গম্বর বলা হয়। তাঁরা হলেন: **হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা** আলাইহিমুস্ সালাম ও **হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পয়গম্বরদের মাঝ থেকে ত্রিশ জনের নাম মশহুর হয়েছে। তাঁরা হলেন: **হযরত আদম, হযরত ইদ্রিস, হযরত শিত, হযরত নূহ, হযরত হুদ, হযরত সালিহ, হযরত ইবরাহীম, হযরত লূত, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসুফ, হযরত আইয়ুব, হযরত শুয়াইব, হযরত মূসা, হযরত হারুন, হযরত খিজির, হযরত ইউসা বিন নূন, হযরত ইলিয়াস, হযরত এলিয়াসা, হযরত যুল-কিফিল, হযরত শামুন, হযরত ইশমইল, হযরত ইউনুস বিন মাত্তা, হযরত দাউদ, হযরত সুলায়মান, হযরত লোকমান, হযরত যাকারিয়্যা, হযরত ইয়াহিয়া, হযরত উযাইর, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম, হযরত যুল-কারনাইন আলাইহিমুস্ সালাম ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম**।

উপরোক্ত পয়গম্বরদের মধ্য থেকে আটাশ জনের নাম কুরআন করীমে উল্লেখ করা হয়েছে। **হযরত যুল-কারনাইন, হযরত লোকমান, হযরত উযাইর ও হযরত খিজির** আলাইহিমুস্ সালাম পয়গম্বর ছিলেন কিনা, এ ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে। উরওয়াতুল উসকা হযরত মোহাম্মদ মাসুম কুদ্দিসা সিররুহু'এর মাকতুবাতের দ্বিতীয় খণ্ডের ছত্রিশতম মাকতুবে, হযরত খিজির আলাইহিস্ সালামের পয়গম্বর হওয়ার ব্যাপারে শক্তিশালী খবর রয়েছে বলে উল্লেখ আছে। একশ বিরাশিতম মাকতুবে, হযরত খিজির আলাইহিস্ সালামের মানুষ রূপে দৃশ্যমান হওয়া ও কিছুকিছু কাজকর্ম সম্পাদন করা প্রমাণ করে না যে তিনি এখনো দুনিয়ার হায়াত ধারণকারী। তিনি এবং তাঁর মত একাধিক পয়গম্বর ও আওলিয়াদের রূহসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের রূপ ধারণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাই তাঁদের দৃশ্যমান হওয়া তাঁদের হায়াতের বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে দলিল হবে না।

আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তিনি মহান আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল ও হাবীব। তিনি সর্বশেষ পয়গম্বর ও সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ। পাঁচশ একাত্তর [৫৭১] খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের বিশ তারিখে, বারই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার ফজরের সময়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা তাঁর জন্মের পূর্বেই ইনতিকাল করেছিলেন। তাঁর ছয় বছর বয়সের সময় মা আমিনা এবং আট বছর বয়সের সময় তাঁর দাদা আব্দুল মোত্তালিব মৃত্যু বরণ করেন। এরপর তিনি চাচা আবুতালিবের নিকট লালিত-পালিত হন। পঁচিশ বছর বয়সের সময় আম্মাজান হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর থেকে চার কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রথম পুত্রের নাম কাসিম ছিল। একারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে '**আবুল কাসিম**' নামেও ডাকা হত। চল্লিশ বছর বয়সের সময় তাঁকে, সমস্ত মানুষ ও জ্বিনের পয়গম্বর হওয়ার বিষয়টি অবহিত করা হয়। এর তিন বছর পরে তিনি সকলকে প্রকাশ্যে ঈমানের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁর বায়ান্ন বছর বয়সের সময়, এক রাতে তাঁকে মক্কা মুকাররমা থেকে কুদুস তথা বাইতুল মুকাদ্দাসে এবং সেখান থেকে উর্দ্ধাকাশে ভ্রমণ করিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। এই ভ্রমণকে '**মিরাজ**' বলা হয়। মিরাজে যেয়ে তিনি জান্নাত, জাহান্নাম অবলোকন করেছিলেন এবং আল্লাহ্র দিদার লাভ করেছিলেন। এই রাত্রিতেই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়েছিল। ইতিহাসবেত্তাদের মতে ছয়শ বাইশ খৃস্টাব্দে মহান আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে মক্কা থেকে মদিনায় গমন করেছিলেন। এই গমনকে ইসলামের ইতিহাসে '**হিজরত**' বলা হয়। রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখ রোজ সোমবার তিনি মদিনা নগরীর কুবা নামক গ্রামে উপস্থিত হন। যা খৃস্ট বর্ষপঞ্জিকা অনুযায়ী সেপ্টেম্বর মাসের বিশ তারিখ ছিল। এই দিনকেই মুসলমানদের **হিজরী শামসী** সনের পয়লা দিন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর ঐ বছরের মুহাররম মাসের পয়লা তারিখ থেকে **হিজরী কামারী** বর্ষের গণনা শুরু করা হয়। দুনিয়ার চতুর্পাশে চন্দ্রের বার বার আবর্তনের মাধ্যমে এক চন্দ্রবর্ষ পূর্ণ হয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাদশ হিজরীতে [৬২২ খৃস্টাব্দে] রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ রোজ সোমবার দুপুরের পূর্বে ইনতিকাল করেছেন। বুধবার রাতে তিনি ঠিক যেখানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় চন্দ্রবর্ষ অনুযায়ী তাঁর তেষট্টি আর সৌরবর্ষ অনুযায়ী একষট্টি বছর বয়স হয়েছিল।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফর্সা ছিলেন। মানুষের মাঝে এমনকি সৃষ্টির সর্বাধিক সুন্দর ছিলেন। তিনি তাঁর সৌন্দর্যকে সবার সামনে

প্রকাশ করতেন না। তাঁর সৌন্দর্যকে যাদের সরাসরি একবার অবলোকন করার সৌভাগ্য হয়েছে, এমনকি তা স্বপ্নে হলেও তাদের জীবন আনন্দ ও প্রশান্তিতে ভরে গেছে। পৃথিবীর যেকোন প্রান্তের যে কারো চেয়ে এবং দুনিয়াতে এখন পর্যন্ত যারা এসেছেন আর কিয়ামত অবধি যারা আসবেন তাদের সবার চেয়ে সর্বদিক দিয়েই তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। তাঁর মেধা, চিন্তাচেতনা, উত্তম চরিত্র ও শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেকোন মানুষের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল।

শৈশবকালে দুইবার ব্যবসায়ীদের সাথে শাম তথা বর্তমান সিরিয়ার দিকে সফরের জন্য বের হয়েছিলেন কিন্তু বুসরা নামক স্থান থেকে ফিরে এসেছিলেন। এর বাইরে তিনি আর কখনো, কোন স্থানে গমন করেননি। উম্মী তথা নিরক্ষর ছিলেন। অর্থাৎ, কোন মকতবে যাননি। দুনিয়ার কারো থেকে শিক্ষা অর্জন করেননি। তথাপি সবকিছুই তাঁর জানা ছিল। কেননা, তিনি যে বিষয়েই চিন্তা করতেন, জানার আগ্রহ প্রকাশ করতেন মহান আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁকে তা অবহিত করতেন। প্রধান ফেরেশতাদের অন্যতম, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এসে, তাঁর সকল জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন। তাঁর মুবারক ক্বালব সূর্যের ন্যায় আলো ছড়াতো। তাঁর ছড়ানো ইলম্ ও মারিফাতের নূরসমূহ, বেতার তরঙ্গের মত আসমান ও জমিনের সর্বত্র ছড়িয়ে যেত। বর্তমানে তাঁর রওজা থেকেও সেই নূরের প্রতিফলন হচ্ছে। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ গ্রহণের জন্য যেমন রিসিভারের প্রয়োজন হয়, তেমনি তাঁর ছড়ানো নূর গ্রহণের জন্যও তাঁর উপর পূর্ণ ঈমান এনে তাঁকে মনে প্রাণে ভালোবেসে, তাঁর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করে ক্বালবকে পরিষ্কার করা দরকার। এরূপ পরিষ্কার ক্বালবের অধিকারী ব্যক্তিগণ ঐ নূর গ্রহণ করতে পারেন এবং তা নিজের চারিপাশের মানুষদের মাঝে ছড়াতে পারেন। এরূপ মহান ব্যক্তিদের **ওলী** বলা হয়। এই ধরণের আল্লাহ্র অলীদেরকে যারা চিনে, বিশ্বাস করে ও ভালবাসে তারা তাদের সান্নিধ্যে আদবের সাথে উপস্থিত থাকে অথবা দূর থেকে আদব, ভক্তি ও ভালোবাসার সাথে তাঁদের স্মরণ করে। এরূপ যারা করে তাদের ক্বালবও নূর, ফাইজ ও বরকত দ্বারা পূর্ণ হতে শুরু করে, পরিষ্কার ও পরিপক্ক হয়।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের দেহ ও জগতকে প্রতিপালনের জন্য সৌরশক্তিকে প্রধানতম মাধ্যম করেছেন। একইভাবে আমাদের রূহ ও ক্বালবের পরিচর্যা ও পরিপক্কতার জন্য, মানবতার বিকাশের জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্বালবকে, ওখান থেকে উদ্ভাসিত হওয়া নূরকে সবব তথা মাধ্যম করেছেন। মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পরিবেশ ও শক্তির সবই সৌরশক্তি থেকে অর্জিত হয় ঠিক একইভাবে ক্বালব ও রূহের খোরাক তথা আওলিয়ার সোহবত, বক্তব্য ও লেখাসমূহের সবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক ক্বালব থেকে উৎসারিত নূরের দ্বারাই অর্জিত হয়।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম নামক ফেরেশতার দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট **কুরআন করীম**কে প্রেরণ করেছেন। মানুষকে তার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য

প্রয়োজনীয় ও উপকারী বিষয়সমূহ পালনের আদেশ দিয়েছেন। তার জন্য যা ক্ষতিকর তা করতে নিষেধ করেছেন। এই আদেশ ও নিষেধকেই একত্রে **দ্বীন-ই ইসলাম** অথবা **ইসলামিয়্যাত** বা **আহকাম-ই ইলাহিয়া** বলা হয়।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কথাই সঠিক ও মূল্যবান এবং মানুষের জন্য উপকারী। এরূপ যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে **মুমিন** বা **মুসলমান** বলা হয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কথাকে অবিশ্বাস করলে বা অপছন্দ করলে তাকে **কাফির** বলা হয়। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদের ভালোবাসেন। তাদেরকে তিনি জাহান্নামের আগুনে চিরকাল শাস্তি দিবেন না। হয় তাদেরকে একটুর জন্যও জাহান্নামে ফেলবেন না অথবা তাদের দ্বারা কৃত পাপের শাস্তি হিসেবে জাহান্নামে প্রবেশ করালেও পরবর্তীতে অবশ্যই জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন। কাফির ব্যক্তি কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সে সরাসরি জাহান্নাম নিক্ষিপ্ত হবে আর চিরকাল সেখানেই অবস্থান করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনা, তাঁকে মনে প্রাণে ভালোবাসা হল সমস্ত সৌভাগ্য, প্রশান্তি ও কল্যাণের মূল। তার নবুয়্যতের উপর ঈমান না আনলে তা সমস্ত বিপর্যয়, বিপদআপদ ও অমঙ্গলের মূল কারণ হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইলম, ইরফান, বুঝ, বিশ্বাস, বিবেক, মেধা, দানশীলতা, বিনয়, অভিজ্ঞতা, মমতা, ধৈর্য, প্রচেষ্টা, রক্ষণ, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, বীরত্ব, সাহসিকতা, বালাগাত, ফাসাহাত, আকর্ষন, সৌন্দর্য, লাজুকতা, পবিত্রতা, দয়া, বদান্যতা, ন্যায় পরায়ণতা, হায়া, একনিষ্ঠতা, খোদাভীরুতা ইত্যাদির মত সর্বক্ষেত্রেই বাকী সমস্ত পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। দোস্ত হোক, দুশমন হোক যারা তাঁর অনিষ্ট করেছে, তাদের সবাইকেই তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারো থেকেই তিনি এর বদলা নেননি। এমনকি উহুদের যুদ্ধে যখন কাফিররা তাঁর গালকে রক্তাক্ত করেছিল, তাঁর দন্ত মুবারককে শহীদ করেছিল তখনো তিনি তাদের জন্য এই বলে দোয়া করলেন যে, "**হে আমার রব, এদেরকে ক্ষমা করে দাও! তাদের অজ্ঞতাকে দূর করে দাও!**"।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে উত্তম আখলাকের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সেগুলি শিখে সে অনুযায়ী নিজেদেরকে আখলাক গড়ে তোলা। আর এভাবেই দুনিয়া ও আখেরাতের বিপর্যয় ও বিপদআপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং দোজাহানের সর্দারের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শাফায়াত অর্জন করার সৌভাগ্য হবে। কেননা হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে, "**তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার আখলাকের দ্বারা নিজেদের চরিত্রকে গড়ে তোল**"।

আসহাবে কিরাম

যে মুসলমানগণ, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক চেহারার দর্শন লাভ করেছিলেন, তাঁর সুমিষ্ট কথা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাদেরকে **‘আসহাবে কিরাম’** বলা হয়। পয়গম্বরদের পরেই এপর্যন্ত যত মানুষ এই দুনিয়ায় এসেছেন এবং আসবেন তাদের মাঝে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জন হলেন হযরত **আবু বকর সিদ্দীক** রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ইয়া সাল্লামের প্রথম খলীফা ছিলেন। তাঁর পরের শ্রেষ্ঠ মানব হলেন ‘ফারুক-ই আযম’ দ্বিতীয় খলীফা হযরত **উমর বিন খাত্তাব** রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু। উনার পরের শ্রেষ্ঠজন হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তৃতীয় খলীফা, ঈমান, হায়া ও ইরফানের উৎস হযরত **উসমান ইবনে আফফান** রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাঁর পর সর্বোত্তম মানুষ ও চতুর্থ খলীফা যিনি আশ্চর্যজনক প্রতিভার অধিকারী ও ‘আল্লাহ্‌র সিংহ’ উপাধি পেয়েছিলেন, তিনি হলেন হযরত **আলী ইবনে আবি তালিব** রাদিয়াল্লাহু আনহু। হাদিস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার নারীদের মাঝে সর্বোত্তম হলেন **হযরত ফাতিমা, হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা** রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না এবং **হযরত মরিয়ম ও হযরত আছিয়া** আলাইহুমাস্‌ সালাম। হাদিস শরীফে এসেছে, **“হযরত ফাতিমা** (রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহা) **জান্নাতী মহিলাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন** (রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আনহুমা) **হলেন জান্নাতী যুবকদের মাঝে শ্রেষ্ঠ”**।

উনাদের পরে, আসহাবে কিরামের মাঝে অধিক মর্যাদাবান হলেন **‘আশারা-ই মুবাশশারা’** এর অন্তর্ভুক্ত সাহাবীগণ। এর মানে হল, যারা দুনিয়াতে থাকা অবস্থাতেই জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদ পেয়েছিলেন। তাঁদের সংখ্যা দশ। তাঁরা হলেন: হযরত আবুবকর সিদ্দীক, হযরত উমর ফারুক, হযরত উসমান বিন আফফান, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব, হযরত উবায়দা ইবনে জাররাহ, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম, হযরত সা’দ ইবনে আবি ওক্কাস, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ, হযরত আবদুররহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তা’আলা আলাইহিম আজমাইন। উনাদের পরে অধিক মর্যাদার অধিকারী হলেন **বদরের** জিহাদে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ। এরপর পর্যায়ক্রমে **উহুদের** জিহাদে অংশগ্রহণকারীগণ ও যারা **‘বায়আতুর রিদওয়ান’** এ উপস্থিত ছিলেন সেসকল সাহাবীগণ অধিক মর্যাদাবান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নিজেদের জান ও মাল উতসর্গ করেছেন, তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন যে আসহাবে কিরাম, তাঁদের প্রত্যেককে যথাযথ সম্মান ও ভালোবাসার সাথে স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য। তাঁদের অসম্মান হয় এমন কোন কথা বা আচরণ করা আমাদের জন্য

কখনোই জায়েজ হবে না। তাঁদের নামসমূহকে অমর্যাদা করা, তাচ্ছিল্য করা দালালাত বা পথভ্রষ্টতার শামিল।

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসেন, তাদের উপর রাসূলের প্রত্যেক সাহাবীকে ভালোবাসাও আবশ্যক। কেননা একটি হাদিস শরীফে এসেছে যে, **"আমার সাহাবীদের যারা ভালোবাসল তারা আমাকে ভালবাসে বলেই এরূপ করল। যারা তাঁদেরকে ভালোবাসল না, তারা আমাকেও ভালোবাসল না। তাঁদের কাউকে কষ্ট দেয়া আমাকে কষ্ট দেয়ার শামিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে মূলত আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্ট দিল। আল্লাহ্ তা'আলাকে যে কষ্ট দিল সে অবশ্যই আজাব ভোগ করবে"**। অপর আরেকটি বলা হয়েছে যে, **"মহান আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমার উম্মত থেকে কারো জন্য কল্যাণ করতে ইরাদা করেন, তখন তার ক্বালবে আমার সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা পয়দা করে দেন। সে প্রত্যেক সাহাবীকে নিজের জানের মত ভালোবাসে"**। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সময়ে মদিনা শহরে তেত্রিশ হাজার সাহাবী বিদ্যমান ছিলেন। সাহাবীদের মোট সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের চেয়ে অধিক ছিল।

চার মাজহাবের ইমাম ও অন্যান্য আলেমগণ

ইতিক্বাদের বিষয়ে একটিমাত্র সঠিক পথ রয়েছে। আর তা হল **আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের** মাজহাব। ভূপৃষ্ঠে অবস্থানরত সমস্ত মুসলমানদের সঠিক পথ প্রদর্শনকারী এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথকে কোন ধরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন না করে আমাদের শিখানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এমন চারজন মহান ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। তাদের প্রথমজন হলেন **ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত** রহমতুল্লাহি আলাইহি। তিনি ইসলামী আলেমদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। আহলি সুন্নাতের প্রধান ছিলেন। দ্বিতীয়জন হলেন **ইমাম মালিক বিন আনাস**, তৃতীয়জন হলেন **ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরিস্ শাফিঈ** এবং চতুর্থজন হলেন **ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল** রহমতুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন।

বর্তমান সময়ে, এই চার ইমামের কোন একজনকে যে অনুসরণ করল না সে ভয়ানক শঙ্কার মাঝে রয়েছে। সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে। আমরা এই কিতাবে, হানাফী মাজহাব অনুযায়ী নামাজের মাসলা-মাসায়েল, এই মাজহাবের প্রসিদ্ধ আলেমদের রচিত কিতাবসমূহ থেকে সংকলন করে বর্ননা করেছি।

এই চার ইমামের তালাবা'দের মধ্য থেকে দুইজন, ঈমানী ইলমের ক্ষেত্রে অধিক অগ্রগামী ছিলেন। এভাবেই ইতিক্বাদের ক্ষেত্রে দুইটি মাজহাব হল। কুরআন করীম ও হাদিস শরীফে বর্নিত যথোপযুক্ত ঈমান, কেবলমাত্র এই দুই ইমামের দ্বারা অবহিত করা ঈমানের সাথেই মিলে। 'ফিরকা-ই নাজিয়া' বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল তথা আহলি সুন্নাতের ঈমানী মতবাদকে সারা বিশ্বে এই দুজনের মাধ্যমেই ছড়িয়েছে। তাঁদের একজন হলেন, হযরত **আবু মানসুর আল-**

মাতুরিদী আর দ্বিতীয়জন হলেন **আবুল হাসান আল-আশ্‌আরী** রহমতুল্লাহি আলাইহিম।

এই দুইজন ইমাম, ঈমানের একইরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মাঝে কতিপয় মতপার্থক্য রয়েছে। তবে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। হাক্বীকতের বিবেচনায় তা একই। কুরআন করীম ও হাদিস শরীফে, ইসলামের আলেমদের বহুত প্রশংসা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি আয়াতে করীমায় বলা হয়েছে, **"জ্ঞানী আর অজ্ঞরা কখনো সমান হতে পারে কি?"**। অপর আরেকটি আয়াতে করীমায় বলা হয়েছে, **"হে মুসলমানেরা! তোমাদের না জানা বিষয়ে যারা জানে তাঁদের থেকে জিজ্ঞাসা কর"**।

এ ব্যাপারে হাদিস শরীফ বর্নিত হয়েছে যে: **"আল্লাহ্‌ তা'আলা, ফেরেশতাগণ ও প্রত্যেক প্রাণী, মানুষদের কল্যাণ শিক্ষাদানকারী মুসলমানদের জন্য দোয়া করেন"। "কিয়ামতের দিন, প্রথমে পয়গম্বরগণ, তারপর আলেমগণ ও তারপর শহীদগণ শাফায়াত করবেন"। "হে মানুষ! জেনে রাখ যে, ইলম আলেমদের থেকে শুনে শিখতে হয়"। "তোমরা ইলম অর্জন কর। কেননা ইলম অর্জন করা একধরণের ইবাদত। যে ইলম শিখল ও যে ইলম শিক্ষা দিল তাদের উভয়কেই জিহাদের সওয়াব দেয়া হবে"। "ইলম শিক্ষা দেয়া সদকা দেয়ার সমতুল্য। আলেমদের থেকে ইলম অর্জন করা, তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের মত"। "ইলম অর্জন কর, যাবতীয় নফল ইবাদত করার চেয়ে অধি সওয়াবের। কেননা এর দ্বারা নিজের ও যাকে শিখাচ্ছে তারও উপকার হয়"। "অন্যকে শিখানোর জন্য ইলম অর্জনকারীকে সিদ্দীকদের সমতুল্য সওয়াব প্রদান করা হবে"। "ইলম হল একটি ভাণ্ডার। এর চাবি হল জিজ্ঞাসা করে শিখে নেয়া"। "তোমরা ইলম অর্জন কর ও শিক্ষা দাও"। "সবকিছুরই উৎস রয়েছে। তাকওয়ার উৎস হল আরিফদের (যারা আল্লাহকে চিনতে পেরেছে) ক্বালব"। "ইলম অর্জন করা কৃত গুনাহের কাফফারা স্বরূপ"**

পঞ্চম শর্ত

আখেরাতে ঈমান

ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি: আখেরাতের উপর ঈমান আনলাম বলে সাক্ষ্য দেয়া। এই সময়ের সূচনা, মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে শুরু হয়। কিয়ামতের শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। একে শেষ দিবস বলার কারণ হল, এরপরে আর রাতের আগমন হবে না এজন্য অথবা দুনিয়ার সময়ের পরে আসার কারণে। কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এব্যপারে আমাদেরকে অবহিত করা হয়নি। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। হযরত মেহেদীর আগমন হবে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম আসমান থেকে শাম নগরীতে অবতীর্ন হবেন। দাজ্জাল বের হবে। ইয়াজুজ ও মাজুজ সব জায়গা তছ্নছ্ করে দিবে। সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। প্রচণ্ড ভূমিকম্প হবে। দ্বীনী ইলম্ বিলুপ্ত হবে। পাপাচার বৃদ্ধি পাবে। সর্বত্র হারাম সম্পাদিত হবে। ইয়েমেন থেকে আগুন বের হবে। আসমান ও পর্বতসমূহ চূর্নবিচূর্ন হবে। সূর্য ও চন্দ্র নিভে যাবে...ইত্যাদি।

ব্যক্তি কবরে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে। কবরে মুনকার ও নাকির নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিজেদের মুখস্ত করা এবং শিশুদেরকেও মুখস্ত কোরানো উচিত। ‘আল্লাহ্ তা’আলা আমার রব, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পয়গম্বর, ইসলাম আমার দ্বীন, কুরআন করীম আমার কিতাব, কা’বা শরীফ আমার কিবলা, ইতিক্কাদের ক্ষেত্রে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আমার মাজহাব আর আমলের ক্ষেত্রে ইমামে আযম আবু হানিফার মাজহাব আমার মাজহাব’। কিয়ামতের দিনে সকলেরই পুনরুত্থান হবে। সকলকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। সালিহ তথা পুণ্যবানদের আমল দফতর ডান হাতে আর মন্দদের আমলনামা পিছন থেকে কিংবা বাম দিক থেকে প্রদান করা হবে। শিরক ও কুফর ব্যতীত অন্য যে কোন গুনাহ, আল্লাহ্ তা’আলা চাইলে ক্ষমা করে দিবেন। আবার চাইলে ছোট গুনাহের জন্যও অনেককে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আমল পরিমাপের জন্য **মিজান** থাকবে। মহান আল্লাহ্ তা’আলার আদেশে জাহান্নামের উপরে **পুলসিরাত** স্থাপন করা হবে। এছাড়াও সেখানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিশেষ **‘হাওজে কাওসার**’ও বিদ্যমান থাকবে।

শাফায়াত হক্ক। তওবাহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী মুমিনদের সগীরা ও কবীরা গুনাহ মাফের জন্য পয়গম্বরগণ, অলীগন, সালিহ তথা পুণ্যবানরা, আলেমগণ, ফেরেশতাগণ, শহীদগণ এবং মহান আল্লাহ্ তা’আলা যাদের

অনুমতি দিবেন তারা শাফায়াত করতে পারবেন, এবং ইনশাল্লাহ তা কবুল করাও হবে।

জান্নাত ও **জাহান্নাম** বর্তমানে বিদ্যমান। জান্নাত সাত আসমানের উপর অবস্থিত। জাহান্নাম সর্বনিম্নে অবস্থিত। জান্নাতের আটটি দরোজা রয়েছে। প্রত্যেক দরোজা দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জান্নাতে প্রবেশ করা যায়। জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর থেকে সপ্তম স্তর পর্যন্ত যত নিচে যাওয়া হয়, আজাবের তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পায়।

ষষ্ঠ শর্ত

কদরে ঈমান

ওয়া বিল কাদরি, খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তা'আলা: কদরে বিশ্বাস বলতে, ভাল ও মন্দ যা কিছুই হয় তার সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয় এই বলে সাক্ষ্য দেয়াকে বুঝায়। মানুষের জীবনে ভাল ও মন্দ, লাভ ও ক্ষতি, অর্জন ও হরণ এর সবই আল্লাহ্ তা'আলার তাকদীর অনুযায়ীই হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার কোন কিছুকে অস্তিত্ব প্রদানের ইরাদা করাকে **কদর** বলা হয়। এই কদরের অর্থাৎ যার জন্য অস্তিত্বপ্রাপ্তির ইচ্ছা করা হয়েছে তার অস্তিত্ব লাভ করাকে **'ক্বাযা'** বলা হয়। কদর ও ক্বাযা শব্দ দুইটি একে অপরের স্থানেও ব্যবহৃত হয়।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে **ইরাদা** করার ক্ষমতা দিয়েছেন। বান্দার এই ইরাদা বা ইচ্ছা পোষণ করাকে, যা ইরাদা করা হয়েছে তার বাস্তবায়নের জন্য সবব বা কারণ করা হয়েছে। কোন বান্দা একটা কিছু করতে ইচ্ছা করলে এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তা ইরাদা করলে ঐ কর্মটি সৃষ্টি করেন। বান্দা না চাইলে এবং আল্লাহ্ তা'আলাও না চাইলে কোন কিছু বাস্তবায়িত হয় না।

এপর্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত আহলি সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইতিক্বাদকে বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলে, হাক্বীকাত কিতাবএভি কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী আলেমদের শিরোমণি ও মহান ওলী হযরত মওলানা খালিদ বাগদাদী (র:) এর ফারসী ভাষায় রচিত **'ইতিক্বাদনামা'** কিতাবটি এবং কামাহলি ফয়জুল্লাহ এফেন্দির রচিত **'প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় ঈমান**' নামক কিতাবটি পড়তে পারে। এগুলি খুবই উপকারী ও মনোমুগ্ধকর, এগুলির ফাইজ ও বরকত দোজাহানের সা'দাত অর্জনের জন্য যথেষ্ঠ।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককেই তাওয়াক্কুল করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। **'তাওয়াক্কুল ঈমানের জন্য শর্ত'** এই মর্মের আয়াতটি এর একটি দলীল। 'সূরা মায়দা'র, **'তোমাদের যদি ঈমান থেকে থাকে তবে আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল কর**', 'সূরা আলে ইমরান'এর **'আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই যারা তাওয়াক্কুল করল তাদের পছন্দ করেন**', 'সূরা

তালাক’এর, **‘কেউ যদি আল্লাহ্‌ তা’আলার উপর তাওয়াকুল করে তবে আল্লাহ্‌ তা’আলাই তার জন্য যথেষ্ঠ হন’**, ‘সূরা যুমার’এর **‘আল্লাহ্‌ তা’আলা তার বান্দার জন্য যথেষ্ঠ নন কি?’** এর মত আরো বহু আয়াতে এ ব্যাপারে আদেশ দেয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, **“আমাকে আমার উম্মতের মধ্য থেকে এক দল লোককে যার দ্বারা পাহাড়পর্বত ও মরুভূমি পূর্ণ হয়ে গেছিল। তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে অবাক হয়েছি, আনন্দিতও হয়েছি। আমাকে বলা হল, খুশি হয়েছেন কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন বলা হল, এদের মাঝ থেকে মাত্র সত্তর হাজার জন বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কারা? বলা হল, যারা কোন কাজ করার সময় যাদুকর ও গণকের দ্বারস্থ হয় না এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কারো উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করে না তারা”**। সাহাবীদের মধ্য থেকে যারা তখন উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্য থেকে, হযরত উকাশা রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন যে, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! দোয়া করুন যেন আমি তাদের মাঝ থেকে একজন হই”। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, **“ইয়া রাব্বি! একে তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত কর”**। তখন অপর আরেকজন সাহাবী দাঁড়িয়ে তার জন্যও একই দোয়া করার আবেদন করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, **“উকাশা তোমার চেয়ে দ্রুত আচরণ করেছে”**।

তাওয়াক্কুল হল, কোন কাজ সম্পাদনের জন্য জাগতিক যে সবব বা কারণ রয়েছে সেগুলিকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরে, পরিণতির ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ না হওয়াকে বুঝায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইবাদতসমূহ ও নামাজ
ইবাদত কি?

আমাদের এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতকে শূন্য থেকে অস্তিত্ব দানকারী, দেখা না দেখা সকল ধরণের বিপদ আপদ থেকে আমাদেরকে রক্ষাকারী, প্রতিটি মূহুর্তে বিভিন্ন রকমের নিয়ামত প্রদানকারী, সকল ধরণের চাহিদার যোগানদানকারী মহান আল্লাহর প্রদত্ত আদেশসমূহ পালন করা ও নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার নাম ইবাদত। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী পয়গম্বরদের, অলী-আউলিয়াদের, আলিমদের ভক্তি করা, তাদের প্রদর্শিত পন্থায় ইবাদত করা উচিত।

অসংখ্য নিয়ামত প্রেরনকারী মহান আল্লাহর সামর্থ্য অনুযায়ী শুকরিয়া আদায় করা প্রত্যেক মানুষের নৈতিক কর্তব্য, মানবিক দায়িত্ব। কারন মানুষ আল্লাহর কাছে চির ঋনী। কিন্তু মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান জানানোর উপায় ও তার শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যম বা ধরন, কিছুই নিজের ত্রুটিযুক্ত আকিল(বিবেক) ও ক্ষীন দৃষ্টির দ্বারা অনুসন্ধান করতে সক্ষম নয়। মহান আল্লাহকে কিভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, তার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করতে হবে তা যদি তিনি মানুষকে না জানাতেন তবে মানুষের উদ্ভাবিত পন্থাগুলো হয়ত তার প্রশংসার পরিবর্তে তাকে অসম্মানের মাধ্যম হত।

আর এজন্যই মহান আল্লাহ তা'আলা, তার দেয়া নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের যে ঋনের বোঝা মানুষের কাধে রয়েছে, তা মনে প্রানে স্বীকার করে নিয়ে আন্তরিকতার সাথে মৌখিক ও শারীরিকভাবে ইবাদতের মাধ্যমে পরিশোধের পন্থা মানুষকে জানিয়েছেন। একইসাথে তার প্রিয় পয়গম্বরের মাধ্যমে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করিয়ে দেখিয়েছেন। বান্দা হিসেবে মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহর প্রদর্শিত পথে চলা, তার আদেশ-নিষেধ মানা। উবুদিয়্যাত প্রকাশের জন্য পালনীয় যাবতীয় কর্তব্যের নামই হল **ইসলামিয়্যাত**। মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা আদায় শুধুমাত্র তার প্রেরিত পয়গম্বরের প্রদর্শিত পন্থায় করা সম্ভব। পয়গম্বরের প্রদর্শিত পন্থা ব্যাতীত অন্য যে কোনভাবেই শুকরিয়া আদায়ের চেষ্টা করা হোক না কেন তা মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। মহান আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দও করেন না। কেননা ইসলামিয়্যাতের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা মানুষের দৃষ্টিতে উত্তম বা মঙ্গলজনক মনে হতে পারে।

অর্থাৎ সকল বিবেকবান মানুষের জন্যই মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের ও ইবাদতের ক্ষেত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরনকারী ব্যক্তিকে মুসলমান বলা হয়। আর মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় তথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করাকেই **ইবাদত** বলা হয়। ইসলামিয়্যাতের দুটি অংশ রয়েছে:

১. ক্বালবের দ্বারা বিশ্বাস করা। একে ই'তিক্বাদ বলা হয়।

২. শরীরের ও ক্বালবের দ্বারা পালনীয় ইবাদতসমূহ।

শরীরের দ্বারা আদায় করা ইবাদতসমূহের মাঝে সর্বোত্তম হল নামাজ। প্রত্যেক মুকাল্লিফ মুসলমানের উপরে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ তথা অবশ্য পালনীয়।

মুকাল্লিফ কে ?

আকল সম্পন্ন ও বালিগ সকল নর-নারীই **মুকাল্লিফ** হিসেবে বিবেচিত হয়। মুকাল্লিফ ব্যক্তির উপরে মহান আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনের আর নিষেধ থেকে বিরত থাকার দ্বায়িত্ব অর্পিত হয়। শরীয়ত অনুযায়ী মুকাল্লিফ ব্যক্তির উপর প্রথমত ঈমান তথা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের বিশ্বাস এরপর ইবাদতসমূহ পালনের আদেশ রয়েছে একইসাথে হারাম ও মাকরূহ বিষয় ও কাজকর্মের ব্যাপারে নিষেধ রয়েছে।

আকল হল মানুষের বুঝার ক্ষমতা, উপকারী ও ক্ষতিকর বস্তু ও বিষয়ের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আকল একটি পরিমাপক যন্ত্রের মত, যার দ্বারা দুটি উত্তম জিনিষের মাঝের সর্বোত্তমটি এবং দুটি নিকৃষ্ট জিনিষের মাঝের সর্বাধিক নিকৃষ্টটি নির্ণয় করা সম্ভব। শুধুমাত্র ভাল-মন্দ বুঝলেই নয় বরং যে ভাল-মন্দ বুঝার সাথেসাথে ভালটি গ্রহণ করতে আর মন্দটি পরিত্যাগ করতে পারে তাকে আকলসম্পন্ন বা বিবেকবান বলা হয়। আকল হল চোখের মত আর ইসলামিয়্যাত হল আলোর মত। আলো না থাকলে চোখ দেখতে পায় না।

বালিগ এর অর্থ হল বয়ঃসন্ধিকালে প্রবেশকারী। ছেলেদের জন্য তা বার বছর বয়সে শুরু হয়। বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হওয়ার কিছু আলামত রয়েছে তা প্রকাশ পেলে ঐ ছেলেকে বালিগ বলা হয়। কারও মাঝে যদি বয়ঃসন্ধির আলামত প্রকাশ না পায় এবং বয়স পনের বছর পার হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তাকেও শরীয়তের দৃষ্টিতে বালিগ হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

মেয়েদের জন্য বয়ঃসন্ধির বয়স নয় বছর থেকে শুরু হয়। এই বয়সের কোন মেয়ের মাঝে বয়ঃসন্ধির আলামত প্রকাশ পেলে তাকে বালিগা বলা হয়। যদি পনের বছরেও এই আলামত প্রকাশ না পায় সেক্ষেত্রে তাকেও শরীয়তের দৃষ্টিতে বালিগা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আফআ’ল-ই মুকাল্লিফিন (আহকাম-ই ইসলামিয়্যা):

ইসলাম ধর্মের আদেশ ও নিষেধসমূহকে **‘আহকাম-ই শারইয়্যাহ’** অথবা **‘আহকাম-ই ইসলামিয়্যাহ’** বলা হয়। এগুলিকে **‘আফআ’ল-ই মুকাল্লিফিন’**ও বলা হয়। এর অর্থ হল মুকাল্লিফের পালনীয় অথবা বর্জনীয় বিষয়সমূহ। ‘আফআ’ল-ই মুকাল্লিফিন’ আটটি। এগুলো হল: **ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ, হারাম, মাকরূহ এবং মুফসিদ্**।

১. **ফরজ:** মহান আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআনে যে সব বিষয় পালনের জন্য স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে আদেশ দিয়েছেন সেগুলোই ফরজ হিসেবে বিবেচিত। ফরজ ত্যাগ করা হারাম। কেউ যদি ফরজকে অস্বীকার করে অথবা দুরুত্বহীন মনে করে তবে সে কাফির হিসেবে পরিগনিত হবে। ফরজ দুই প্রকারের:

ফরজে আইন: প্রত্যেক মুকাল্লিফ মুসলমানের উপর স্বয়ং পালনীয় যে ফরজ রয়েছে তা এর অন্তর্ভূক্ত। ঈমান আনা, অজু করা, পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, রমজান মাসের রোজা রাখা, নিসাব পরিমান সম্পদ থাকলে যাকাত দেয়া, সামর্থ্য থাকলে হজ্ব পালন করা ইত্যাদি ফরজে আইন। [বত্রিশ ফরজ ও চুয়ান্ন ফরজ মশহুর হয়েছে।]

ফরজে কিফায়া: যে সব ফরজ কাজ এক বা একাধিক মুকাল্লিফ মুসলমান ব্যক্তির আদায়ের দ্বারা অন্যরা এর দ্বায়িত্ব পালনের আবশ্যকীয়তা থেকে মুক্তি পায় তাকে ফরজে কিফায়া বলে। মৃত ব্যক্তির গোসল করানো, জানাজার নামাজ আদায় করা, পবিত্র কোরআন করিমের সম্পুর্ণ মুখস্ত করে হাফেজ হওয়া, জিহাদ করা, দ্বীন সংক্রান্ত মাসালা-মাসায়েলের সঠিক জওয়াব দিবার মত জ্ঞান অর্জন করা ইত্যাদি ফরজে কিফায়া। এসব ফরজ কেউই যদি আদায় না করে তবে প্রত্যেকেই গুনাহগার হবে।

২. ওয়াজিব: যে সব পালনের জন্য ফরজের মতই স্পষ্ট আদেশ রয়েছে কিন্তু ফরজের মত পবিত্র কুরআনের দলিল অকাট্য ও স্পষ্ট নয় তাকে ওয়াজিব বলে। ওয়াজিব জান্নি দলিল (অকাট্য নয় এমন) এর দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। বেতেরের ও দুই ঈদের নামাজ আদায় করা, ধনী হলে কুরবানী করা, ফিৎরা দেয়া ইত্যাদি ওয়াজিব। ওয়াজিবও ফরজের মত অবশ্য পালনীয়। ওয়াজিব ত্যাগ করা মাক্রুহে তাহরিমা। ফরজ থেকে পার্থক্য হল কেউ ওয়াজিবকে অস্বীকার করলে কাফির হয় না। তবে ওয়াজিব পালন না করলেও জাহান্নামের আজাবের সম্মুখীন হতে হবে।

৩. সুন্নাত: যে সব বিষয়ে মহান আল্লাহ পাকের সরাসরি স্পষ্ট আদেশ নাই কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করার জন্য

বলেছেন, পালনকারীর প্রশংসা করেছেন অথবা নিজে নিয়মিত পালন করেছেন কিংবা তার উপস্থিতিতে অন্যরা করার পরে মৌন সম্মতি দিয়েছেন সেসব বিষয়কে সুন্নাত বলা হয়। সুন্নাতকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা কুফুরী হিসেবে বিবেচিত। তবে যথাযোগ্য সম্মানপূর্বক কেউ যদি সুন্নাত পালনে বিরত থাকে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু বিনা কারনে নিয়মিত যদি সুন্নাত ত্যাগ করে তবে তাকে সতর্ক করা, লজ্জা দেয়া উচিত। সুন্নাত ত্যাগ করলে প্রচুর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আজান দেয়া, ইকামত দেয়া, জামাতের সাথে নামজ আদায় করা, অজুর সময়ে মিসওয়াক করা, বিয়ের সময় ওয়ালিমা খাওয়ানো, পুত্র সন্তানের খৎনা করানো ইত্যাদি সুন্নাত ইবাদত।

সুন্নাত দুই প্রকারের হয়:

সুন্নাত-ই মুয়াক্কাদা: যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত পালিত করেছেন এবং খুবই কম সময় ত্যাগ করেছেন এমন শক্তিশালী সুন্নাতকে সুন্নাত-ই মুয়াক্কাদা বলে। ফজরের নামাজের সুন্নাত, যোহরের নামাজের পূর্বের ও পরের সুন্নাতসমূহ, মাগরিবের নামাজের সুন্নাত এবং এশার নামাজের পরের দুই রাকাত সুন্নাত মুয়াক্কাদার অন্তর্ভুক্ত। বিনা কারনে ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা সমীচীন নয়। সুন্নাতকে নিয়ে উপহাস করলে ব্যক্তি কাফিরে পরিনত হয়।

সুন্নাত-ই গায়রি মুয়াক্কাদা: ইবাদতের উদ্দেশ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝেমাঝে যে সব আমল করতেন তাকে সুন্নাত-ই গায়রি মুয়াক্কাদা বলে। আছর ও এশার নামাজের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাতসমুহ গায়রি মুয়াক্কাদা। এগুলি ত্যাগ করলে গুনাহ হয় না কিন্তু কোন ধরণের অপারগতা না থাকা স্বত্বেও নিয়মিত ত্যাগ করলে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সবব হবে।

এ ছাড়াও কোন দল থেকে একজনের আদায়ের দ্বারা অন্যদের পক্ষ থেকেও আদায় হয়ে যায় এমন কিছু সুন্নাত রয়েছে। এ গুলোকে ‘সুন্নাত আলাল-কিফায়া’ বলা হয়। যেমন সালাম দেয়া, ই’তিকাফে বসা ইত্যাদি। অজু করা, খাওয়া, পান করা ইত্যাদির মত প্রত্যেক ভাল কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা একটি গুরুত্বপুর্ণ সুন্নাত।

৪. মুস্তাহাব: ইহা মানদুব কিংবা আদব হিসেবেও বিবেচিত। ইহার হুকুম সুন্নাত-ই গায়রি মুয়াক্কাদার মত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবনে এক-দুইবার করেছেন অথবা পছন্দ করেছেন কিংবা করতে দেখে খুশি হয়েছেন এমন আচরনসমূহ মুস্তাহাবের পর্যায়ে পড়ে। নবজাতক শিশুর জন্য সপ্তম দিনে নাম রাখা, আক্বিকা দেয়া, পরিপাটি পোষাক পরিধান করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি মুস্তাহাব আমল। এ ধরণের আমল করলে অনেক সওয়াব অর্জিত হয় তবে না করলে গুনাহ হয় না। শাফায়াত থেকেও মাহরূম হতে হয় না।

৫. মুবাহ: যে সব বিষয়ে আদেশও দেয়া হয়নি আবার নিষেধও করা হয়নি এমন বিষয়সমূহকে মুবাহ বলে। অর্থাৎ যা করলে গুনাহও হয় না আবার কোন ধরণের আনুগত্যও প্রকাশ পায় না এমন আচরন মুবাহের অন্তর্ভুক্ত। তবে এসব ক্ষেত্রে সৎ নিয়্যাত করলে সওয়াব আর খারাপ নিয়্যাতে করলে গুনাহ হয়। ঘুমানো, হালাল রকমারি খাবার গ্রহণ, হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদের দ্বারা বিভিন্ন ধরণের পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি মুবাহ। এসব কাজ যদি ইসলামিয়্যাতের অনুসরনের জন্য, শরীয়তের আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে করা হয় সেক্ষেত্রে সওয়াব অর্জিত হয়। যেমন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে উত্তমভাবে ইবাদত করার নিয়্যাতে পানাহার করা।

৬. হারাম: মহান আল্লাহ তা'আলা সরাসরি পবিত্র কুরআনে যেসব বিষয়ে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন তা হারাম হিসেবে বিবেচিত। হারাম কাজ করা কিংবা হারাম জিনিষ ব্যবহার করা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ। হারামকে হালাল আর হালালকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করলে ঈমান চলে যায়, কাফিরে পরিনত হতে হয়। হারাম জিনিষ ত্যাগ করা আর হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা ফরজ একইসাথে প্রচুর সওয়াবের কাজ।

হারাম দুই প্রকার:

হারাম লি-আইনিহি: মানুষ হত্যা করা, জিনা করা, জুয়া খেলা, মদ পান করা, মিথ্যা বলা, চুরি-ডাকাতি করা, শুকর, রক্ত ও প্রাকৃতিক উপায়ে মৃত পশু খাওয়া, নারীদের সতরের অন্তর্ভুক্তস্থানকে গায়রে মাহরিমদের সামনে প্রদর্শন করা ইত্যাদি হারাম। এসব করলে কবীরা গুনাহ হয়। কেউ যদি এ ধরণের হারাম করার সময়ে বিসমিল্লাহ বলে অথবা হালাল হিসেবে গ্রহণ করে কিংবা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হারাম ঘোষনা করার বিষয়টিকে গুরুত্বহীন মনে করে তবে কাফিরে পরিনত হয়। যদি এ গুলোকে হারাম হিসেবে স্বীকার করে ভীত হয়ে করে তবে কাফির হওয়া থেকে হয়ত নিজেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু এর জন্যে জাহান্নামের কঠিন আজাবের সম্মুখীন হতে হবে। আর যদি স্বেচ্ছায় বারংবার করে এবং তাওবা না করেই মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তবে ঈমানহীন হিসেবে পরিগণিত হবে।

হারাম লি-গায়রিহি: যে সব বিষয় বা কাজ নিজে হালাল হওয়া সত্ত্বেও এর দ্বারা অন্যের হক্ক নষ্ট হওয়ায় কিংবা হারামের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় হারাম হিসেবে বিবেচিত হয় সে সব হারাম লি-গায়রিহি হিসেবে বিবেচিত। যেমন ফল খাওয়া হালাল কিন্তু অন্যের বাগান থেকে মালিকের অনুমতি না নিয়ে খেলে হারাম হবে। একইভাবে আমানতের খেয়ানত করা, সুদ-ঘুষ খাওয়া, অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন করা ইত্যাদিও হারাম। হারাম থেকে বেঁচে থাকার মাঝে ইবাদতের চেয়ে বেশি সওয়াব নিহিত। কেননা হারামের কারনে ইবাদতের সওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। দুনিয়াতে কেউ অন্যের হক্ক নষ্ট করলে কিয়ামতের দিবসে মহান আল্লাহ তা'আলা তার সওয়াবের দ্বারা যার হক্ক নষ্ট হয়েছে তাকে তার হক্ক বুঝিয়ে দিবেন। সকলেরই উচিত হারাম সম্বন্ধে ভাল করে জেনে তা থেকে বিরত থাকতে স্বচেষ্ট হওয়া।

৭. মাকরূহ: যে সব বিষয় মহান আল্লাহ ও তার প্রিয়নবী অপছন্দ করেন এবং যার কারনে ইবাদতের সওয়াব নষ্ট হয়ে যায় তাকে মাকরূহ বলে।

মাকরূহ দুই প্রকার:

মাকরূহ-ই তাহরিমী: যা হারামের কাছাকাছি পর্যায়ে। ওয়াজিব ত্যাগ করাও মাকরূহ-ই তাহরিমী। এর কারনে বান্দাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। সূর্যোদয়ের সময়, সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে থাকে তখন এবং সূর্যাস্তের সময় নামাজ পড়াও এরুপ মাকরূহ। ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ এসব করলে আল্লাহর অবাধ্য ও পাপী হবে। জাহান্নামের আজাব ভোগ করতে বাধ্য হবে। নামজের ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করলে পুনরায় নামাজ আদায় করতে হয় তবে ভুলে ত্যাগ করলে সাহু সেজদা করতে হয়।

মাকরূহ-ই তানযিহী: যা হালালের কাছাকাছি পর্যায়ের অথবা যা না করা, করার চেয়ে উত্তম এমন ক্রিয়াসমূহ। গাইরে মুয়াক্কাদ সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব ত্যাগ করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

৮. মুফসিদ্: শরীয়ত অনুযায়ী যার কারনে বৈধ কোন কাজ কিংবা কোন ইবাদত শুরুর পরে তা ভঙ্গ হয়ে যায় কিংবা অবৈধ হয়ে যায় তাকে মুফসিদ্ বলে। যা ঈমান, নামাজ, বিবাহ, হজ, যাকাত, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদিকে নষ্ট করে দেয়। যেমন, মহান আল্লাহ ও কোরআনকে অসম্মান করলে ঈমান নষ্ট হয়, নামাজের মধ্যে শব্দ করে হাসলে অজু ও নামাজ উভয়ই নষ্ট হয়, রোযা থাকা অবস্থায় পানাহার করলে রোযা নষ্ট হয়।

ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতের পালনকারীকে এবং হারাম ও মাকরুহের ত্যাগকারীকে সওয়াব দিয়ে পুরষ্কৃত করা হয়। অপরদিকে হারাম ও মাকরূহ কাজ করলে এবং ফরজ ও ওয়াজিব ত্যাগ করলে অনেক গুনাহ হয়। একটি হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার সওয়াব একটি ফরজ ইবাদতের সওয়াবের চেয়ে অনেক গুন বেশি। একটি ফরজ ইবাদত পালনের সওয়াব একটি মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকার সওয়াবের চেয়ে অনেক গুন বেশি। আবার একটি মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকার সওয়াব একটি সুন্নাত পালনের সওয়াবের চেয়ে অনেক বেশি। আর মুবাহ্ এর মধ্যে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজকে **খাইরাত্** ও **হাছানাত্** বলা হয়। এগুলো করলেও সওয়াব পাওয়া যায় তবে সুন্নাতের চেয়ে পরিমানে কম হয়।

ইসলামের শত্রু

ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য আহলি সুন্নাতের কিতাবসমূহের উপর আক্রমন করে। পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদাতে বলা হয়েছে যে, **ইহুদী ও মুশরিকরা হল ইসলামে সবচেয়ে বড় শত্রু**। মুর্তি পূজারি কাফিরদেরকে মুশরিক বলা হয়। খৃস্টানদের অধিকাংশই যে মুশরিক তা সহজেই বুঝা যায়। ইয়েমেনের আবদুল্লাহ বিন সাবা’ নামক ইহুদী আহলি সুন্নাতকে ধ্বংস করার জন্য **শিয়া** নামক ফিরকার জন্ম দিয়েছে। শিয়াদের অনেকেই আবার নিজেদেরকে আলেভী বলে পরিচয় দেয়। ইসলামের শত্রু

ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যের সর্বশক্তি দিয়ে ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকা মহাদেশ থেকে অর্জিত ধনদৌলত দিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এবং **ওহাবী** নামে পরিচিত গোষ্ঠীর রচিত কিতাবের মাধ্যমে আহলে সুন্নাতকে আক্রমন করে আসছে। দুনিয়ার সব জায়গা থেকে যেই চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জন করতে চায় তার উচিত শিয়া ও ওহাবী দ্বারা রচিত কিতাবসমূহ দ্বারা প্রতারিত না হয়ে আহলি সুন্নাত আলিমদের দ্বারা রচিত কিতাবসমূহকে আকড়ে ধরা।

ইসলামের শর্তসমূহ

ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি তথা মুসলমানের জন্য পাঁচটি অবশ্য পালনীয় ফরজ তথা মৌলিক দ্বায়িত্ব রয়েছে।

১. ইসলামের মৌলিক শর্তসমূহের প্রথমটি হল **কালিমা-ই শাহাদাত** কে মনে প্রানে স্বীকার করে নেয়া। **“আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্‌না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ”** বাক্যটিকে কালিমা-ই শাহাদাত বলা হয়। এর অর্থ হল, **আসমান ও জমিনে মহান আল্লাহ ব্যাতীত অন্য কেউই ইবাদত পাওয়ার, উপাসনার উপযোগী নয়। তিনিই একমাত্র মাবুদ, প্রকৃত উপাস্য।** তিনি ওয়াজিবুল উজুদ অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বের জন্য যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং বাকী সবকিছুই তাদের অস্তিত্বের জন্য তার মুখাপেক্ষী এমন আবশ্যকীয় অস্তিত্বের অধিকারী। তিনি সর্বমহান, সর্বোত্তম বিশেষনে বিশেষিত এবং সকল ধরণের ভুল ত্রুটি থেকে মুক্ত। তিনিই **আল্লাহ**। এই বিষয়গুলি ক্বালবের দ্বারা বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করা। একই সাথে উত্তম চরিত্রের অধিকারী, মিষ্টিভাষী, মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণকারী, হাশেমী বংশীয় **আবদুল্লাহ এর সন্তান মুহাম্মাদ আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তা’আলার বান্দা ও রাসূল**। আর ওহাবের কন্যা হযরত আমিনা তাঁর মাতা।

২. ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক শর্ত হল যথাযথ নিয়ম মেনে শর্ত ও ফরজ পালনের দ্বারা প্রতিদিন **নির্দিষ্ট পাঁচটি ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা**। প্রত্যেক মুসলমানের উপরে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মত আদায় করা ফরজ। নামজ আদায়ের ক্ষেত্রে এর ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাতগুলি যত্ন সহকারে মনোযোগ দিয়ে পালন করা এবং নিজেকে সম্পুর্নরূপে আল্লাহর দরবারে সঁপে দেয়া উচিত। পবিত্র কুরআনে নামাজকে **সালাত** বলা হয়েছে। সালাতের শাব্দিক অর্থ হল: মানুষের ক্ষেত্রে দোয়া করা, ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করা আর আল্লাহর ক্ষেত্রে এর অর্থ দয়া করা, অনুগ্রহ করা। ইসলামিয়্যাতে **সালাত** বলতে ফিকহ কিতাবে বর্নিত নির্দিষ্ট অঙ্গভঙ্গি ও নির্দিষ্ট দোয়া-দূরুদ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে পাঠ করাকে বুঝায়। নামাজ **ইফতিতাহ তাক্ববীরের** দ্বারা শুরু করতে হয়। পুরুষদের জন্য কানের লতি পর্যন্ত হাত তুলে নাভীর উপরে রাখার সময় **আল্লাহু আক্‌বার** বলার দ্বারা নামাজ শুরু হয় এবং শেষ বৈঠকে বসে ডান ও বাম কাঁধে মাথা ঘুরিয়ে সালাম দেয়ার মাধ্যমে শেষ হয়।

৩. ইসলামের তৃতীয় শর্ত হল, **সম্পদের যাকাত প্রদান করা।** যাকাত শব্দের শাব্দিক অর্থ হল পবিত্রতা অর্জন করা, প্রশংসা করা, উত্তম ও সুন্দর হওয়া। ইসলামিয়্যাতে যাকাত বলতে, কারো যদি **নিসাব** পরিমাণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত **যাকাতের উপযুক্ত সম্পদ** থাকে, তবে তা থেকে নির্দিষ্ট পরিমান সম্পদ পবিত্র কুরআনে বর্নিত আট শ্রেণীর লোককে বিনম্রভাবে প্রদান করাকে বুঝায়। চার ধরণের সম্পদের যাকাত দিতে হয়। এগুলো হল: স্বর্ন-রৌপ্যের তথা অর্থকড়ির যাকাত, বাণিজ্যিক মালের যাকাত, বছরের অধিকাংশ সময়ে তৃণভূমি থেকে খেয়ে পালিত হালাল পশুর যাকাত এবং ফসলের যাকাত। ফসলের যাকাতকে **উশর**ও বলা হয়। জমি থেকে ফসল সংগ্রহের সাথে সাথেই উশর দিতে হয়। অন্য তিন ধরণের মালের যাকাত নিসাব পরিমাণে পৌঁছার এক বছর পরে দিতে হয়।

৪. ইসলামের চতুর্থ শর্ত হল **পবিত্র রমজান মাসের প্রত্যেক দিন রোজা রাখা**। রোজা রাখাকে কুরআনের ভাষায় **সাওম** বলে। সাওমের শাব্দিক অর্থ হল কোন কিছুকে কোন কিছু থেকে রক্ষা করা, সংরক্ষন করা। ইসলামিয়্যাতে রোজা বলতে, রমজান মাসে যথাযথ পন্থায় আল্লাহ তা’আলার আদেশ অনুযায়ী প্রতিদিন তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে সংরক্ষন করা, সংবরণ করাকে বুঝায়। এই তিনটি বিষয় হল: খাওয়া, পান করা ও যৌনমিলন। রমজান মাস আকাশে হিলাল [নতুন চাঁদ] দেখার মাধ্যমে শুরু হয় এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখার মাধ্যমে শেষ হয়। ক্যালেন্ডারে বর্নিত হিসাব অনুযায়ী নয়।

৫. ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ভিত্তির সর্বশেষটি হল: **সামর্থ্যবাণ ব্যক্তির উপরে জীবনে একবার হজ্ব আদায় করা**। যার জন্য পথের নিরাপত্তা ও শারীরিক সুস্থতা আছে, কা’বা শরীফে যেয়ে আসা পর্যন্ত স্ত্রী-সন্তান, পরিজনের ভরন পোষনের ব্যবস্থা আছে এবং এগুলি ছাড়াও কা’বা শরীফে যেয়ে আসার মত আর্থিক সামর্থ্য আছে তার উপরে জীবনে একবার ইহরামের সাথে পবিত্র কা’বা তাওয়াফ করা এবং আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ফরজ।

উপরে বর্নিত ইসলামের পাঁচটি শর্তের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল **কালিমা-ই শাহাদাত** বলা ও এর অর্থ মনে প্রানে বিশ্বাস করা। এরপরে নামাজ আদায় করা, তারপর রোজা রাখা, হজ্ব করা এবং সর্বশেষ যাকাত প্রদান করা। কালিমা-ই শাহাদাতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত। অন্যান্যগুলির ক্ষেত্রে আলিমদের মাঝে কিছুটা ইখতিলাফ রয়েছে। কালিমা-ই শাহাদাত ইসলামের শুরুতেই ফরজ হয়েছে।পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নবুওয়্যাতের দ্বাদশ বছরে এবং হিজরতের বছর খানেক পূর্বে পবিত্র মি’রাজ রজনীতে ফরজ হয়েছে। রমজানের মাসের রোজা হিজরতের দ্বিতীয় বছরের শা’বান মাসে ফরজ হয়েছে। রোজা যেই বছর ফরজ হয়েছে, সেই বছরের রমজান মাসে যাকাতও ফরজ হয়েছে। আর হজ্ব হিজরতের নবম বছরে ফরজ হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

নামাজ আদায় করা

আমাদের ধর্মে, ঈমানের পরে সর্বাধিক মূল্যবান ও সর্বোত্তম ইবাদত হল নামাজ। নামাজ দ্বীনের স্তম্ভ ও ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান শর্ত। আরবী ভাষায় নামাজকে **সালাত** বলা হয়। সালাতের আভিধানিক অর্থ হল দোয়া, রহমত ও ইস্তিগফার। নামাজে এই তিনটি অর্থের প্রত্যেকটিই বিদ্যমান তাই একে সালাত বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয় আমল যা বারংবার আদায়ের জন্য আদেশ করা হয়েছে তা হল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। মুসলমানদের জন্য ঈমানের পরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেয়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আদেশ হল নামাজ আদায় কর। আমাদের ধর্মে নামাজকেই সর্ব প্রথম ফরজ করা হয়েছে। হাশরের ময়দানেও ঈমানের পরে সর্ব প্রথম নামাজের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। যে ব্যাক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হিসাব সঠিকভাবে দিতে পারবে সে সব ধরনের কষ্ট ও পরীক্ষা থেকে মুক্তি পেয়ে চিরকালীন সৌভাগ্য অর্জন করবে। জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়া ও জান্নাতের সৌভাগ্য অর্জন করা, যথাযথভাবে নামাজ আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত। আর যথাযথভাবে নামাজ আদায়ের জন্য প্রথমে সঠিকভাবে অজু করে পবিত্র হতে হবে, তারপর কোন ধরনের আলসেমি না করে পূর্ণ মনোযোগের সাথে নামাজে দাঁড়াতে হবে। নামাজের মাঝের প্রত্যেকটি হরকত সর্বোত্তম পন্থায় আদায়ের চেষ্টা কয়া উচিত।

সবধরনের ইবাদতকে নিজের মাঝে অন্তর্ভুক্তকারী ও মানুষকে মহান আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক নৈকট্য প্রদানকারী পবিত্র ইবাদত হল নামাজ। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, **'নামাজ হল দ্বীনের স্তম্ভ। যে নামাজ আদায় করল সে দ্বীনকে শক্তিশালী করল আর যে নামাজ পরিত্যাগ করল সে অবশ্যই দ্বীনকে ধ্বংস করল'**। যে ব্যাক্তি সঠিকভাবে আন্তরিকতার সাথে নামাজ আদায় করল সে অনিষ্ট, পাপ ও মন্দ কাজ করা থেকে সংরক্ষিত হল। এব্যাপারে সূরা আনকাবুত্ এর পঁয়তাল্লিশতম আয়াতে বলা হয়েছে যে, **'নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে মন্দ, কুৎসিত ও নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে বিরত রাখে'**।

যে নামাজ মানুষকে মন্দ ও পাপ করা থেকে বিরত রাখতে পারে না তা যথাযথভাবে আদায়কৃত নামাজ হতে পারে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা নামাজ হলেও যথার্থ নয়। এতদসত্ত্বেও যথার্থ নামাজ আদায় করার পর্যায়ে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত এই বাহ্যিক নামাজ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা ইসলামের আলিমদের মতে, কোন কিছু পুরোপুরি অর্জন করতে না পারলেও যতটুকু সম্ভব

অর্জন করা উচিত, সম্পুর্নটুকুই হাতছাড়া করা উচিত নয়। সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহের মালিক মহান আল্লাহ্ তা'আলা হয়তবা ঐ বাহ্যিক নামাজকেও হাক্বীকত হিসেবে কবুল করে নিতে পারেন। এজন্য কাউকেই, লোক দেখানো নামাজ পড়ার চেয়ে না পড়াই ভাল বলা উচিত নয়। বরং এভাবে বলা উচিত যে, লোক দেখানো নামাজ না পড়ে সত্যিকার অর্থেই আন্তরিকতার সাথে নামাজ আদায় কর। সর্বদাই ভুলত্রুটি সংশোধনের, ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা উচিত। তা না করে সমূলে নষ্ট করা উচিত নয়। এই সূক্ষ তাৎপর্যটি সকলের বুঝা উচিত।

নামাজসমূহ জামাতের সাথে আদায় করা উচিত। কেননা জামাতের সাথে আদায় করা নামাজে, একাকী আদায় করা নামাজের তুলনায় অনেক বেশি সওয়াব অর্জিত হয়। নামাজের সময়ে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের বিনয়ী হওয়া উচিত। আর অন্তরের আল্লাহ্ তা'আলার ভয় ও ভালবাসায় পূর্ণ থাকা উচিত। মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদআপদ ও বালা-মুসিবত থেকে একমাত্র নামাজই পরিত্রান করতে পারে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মুমিনুন এর শুরুর দিকে বলেছেন যে, **'মুমিনরা অবশ্যই মুক্তি পাবে। তারা খুশু সহকারে নামাজ আদায় করে'**।

বিপদের আশঙ্কা রয়েছে এমন স্থানে, এমন সময়ে কিংবা এমন অবস্থায় আদায়কৃত ইবাদতের মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যখন দুশমন আক্রমন করে তখন তা মোকাবিলায় সৈনিকের সামান্য কাজও মূল্যবান হয়ে যায়। একারণেই যৌবনকালে আদায়কৃত ইবাদতের মূল্য অনেক বেশি হয়। কেননা এই সময়ই মানুষ সচেয়ে বেশি নাফসের মন্দ খায়েশের ও ইবাদতের প্রতি অনীহার শিকার হয়।

এমন তিনটি কারণ রয়েছে যা যৌবনকালে মানুষের উপর ভর করে, তাকে ইবাদত করা থেকে বিরত রাখে। এগুলি হল, শয়তান, নাফস ও মন্দ সঙ্গী। সমস্ত মন্দ ও পাপকাজের মূলে অসৎসঙ্গ রয়েছে। যৌবনকালে কেউ যদি উক্ত মাধ্যমগুলি থেকে আসা মন্দ খায়েশের আনুগত্য না করে যথাযথভাবে নামাজ আদায় করে এবং অন্যান্য ফরজ ইবাদতসমূহও পালন করে তবে সে আল্লাহ্র অধিক প্রিয় হয়। কোন বৃদ্ধের আদায়কৃত একই ইবাদতের তুলনায় বহুগুন বেশি সওয়াব অর্জন করে। অল্প ইবাদতের বিনিময়ে বহুগুন বেশি পুরষ্কার অর্জন করে।

কাদের উপর নামাজ ফরজ?

প্রত্যেক আকিল, বালিগ ও মুসলমান নরনারীর উপর নামাজ আদায় করা ফরজ। কারো উপর নামাজের ফরজ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

১. মুসলমান হওয়া। ২. আকিলসম্পন্ন হওয়া। ৩. বালিগ হওয়া।

শরীয়ত অনুযায়ী, ভাল মন্দের পার্থক্য করতে পারে না এমন ব্যাক্তি ও বালিগ হয়নি এমন শিশুদের উপরে নামাজ আদায়ের বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেয়া হয়নি। তথাপি মা-বাবার উচিত আপন শিশুদেরকে দ্বীনী জ্ঞানের শিক্ষা

দেয়া এবং পর্যায়ক্রমে তাদের মাঝে ইবাদত পালনের অভ্যাস গড়ে তোলা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, **'তোমরা সবাই পশুপালের রাখালের মত। রাখাল যেমন পশুপালকে সংরক্ষণ করে ঠিক তেমনি তোমরাও তোমাদের গৃহের বাসিন্দাদের ও তোমাদের অধীনস্তদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও! তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দাও। তা না করলে পরকালে তোমাদেরকেই দায়ী করা হবে'**। অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে যে, **'প্রত্যেক শিশুই ইসলাম ধর্মের উপর এবং তা গ্রহনের ও পালনের সামর্থ্য নিয়ে দুনিয়ায় আসে। পরবর্তীতে তাদের মা বাবা তাদেরকে ইহুদি, খৃস্টান ও দ্বীনহীন বানায়'**।

এমতাবস্থায়, প্রত্যেক মুসলমানের প্রথম দ্বায়িত্ব হল, নিজ সন্তানদেরকে ইসলামী ইলম, কুরআন করীমের তিলাওয়াত, নামাজ আদায়ের পদ্ধতি এবং ঈমান ও ইসলামের যাবতীয় শর্তাবলীর শিক্ষা দেয়া। আপন সন্তানেরা মুসলমান হোক, দুনিয়া ও আখিরাতে সুখ সাচ্ছন্দে থাকুক এটা যে মা বাবা প্রত্যাশা করে তারা যেন প্রথমে নিজেদের উপরে বর্নিত উপরোক্ত দ্বায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে পালন করে। কেননা প্রবাদে আছে, **'গাছ চাড়া থাকতে বাঁকে'**। যখন তা বড় হয়ে যায় তখন তাকে বাঁকাতে বা নিয়ন্ত্রন করতে চাইলে ভেঙ্গে যায় কিংবা আরো বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

যে শিশুকে ইসলামী ইলম ও সুন্দর আখলাক শিক্ষা দেয়া হয় না সে খুব সহজেই মন্দ পথের যাত্রীর দ্বারা প্ররোচিত হতে পারে এবং সে নিজ মা বাবার, দেশের ও জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

নামাজ আদায়কারীর অবস্থা

ঘটনা: জেল থেকে মুক্তিদানকারী নামাজ

খোরাসানের প্রশাসক আবদুল্লাহ বিন তাহির খুবই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তার প্রহরীরা কয়েকজন চোরকে আটক করে তার দরবারে নিয়ে আসছিল। এমতাবস্থায় একজন চোর পালিয়ে গেল। চোর ব্যাক্তিটি পেশায় কামার ছিল। তার বাড়ি ছিল হেরাথে। সে পালিয়ে নিশাপুরে চলে গিয়েছিল। কয়েকদিন পরে রাত্রিবেলা বাড়িতে ফিরতেছিল এবং পুনরায় আটক হল। তাকে প্রশাসকের দরবারে নিয়ে আসা হলে অন্যান্য চোরদের সাথে তাকেও জেলে বন্দী করে রাখা হল। এই কামার তখন জেলখানাতে অজু করে নামাজ আদায় করল আর আল্লাহ্‌র দরবারে দুহাত তুলে এই বলে দোয়া করতে লাগল: হে আমার প্রভু! আমাকে এখান থেকে মুক্ত কর। এ ব্যাপারে আমি যে নির্দোষ তা কেবলমাত্র তুমিই জানো। একমাত্র তুমিই পারো আমাকে এই বন্দীখানা থেকে মুক্ত করতে। হে আমার প্রভু, আমায় মুক্তি দাও। ওয়ালি(প্রশাসক) ঐ রাতে স্বপ্নে দেখল, শক্তিশালী চারজন এসে তার সিংহাসনকে উল্টিয়ে দিতে চাচ্ছে। ঠিক তখনি তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, উঠে দুই রাকাত নামাজ পড়ে আবার ঘুমিয়ে গেল। পুনরায় ঐ চারজন এসে সিংহাসন ভাঙ্গার উপক্রম করলে তার ঘুম আবার ভেঙ্গে গেল। বুঝতে পারল, তার অধীনে কোন মাজলুম নির্যাতিত হচ্ছে।

আল্লাহ্‌র নিকট এই বলে প্রার্থনা করল: হে আমার প্রভু! কেবলমাত্র তুমিই মহান। তুমি এতটাই মহান যে, ছোট বড় সকলেই বিপদগ্রস্থ হলে শুধুমাত্র তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করে। তোমার দরগাহে প্রার্থনা করলেই কেবল মণের আসা পূর্ণ হয়।

ওয়ালি তৎক্ষণাৎ কারারক্ষীকে ডেকে জেলে কোন মাজলুম আছে কিনা জানতে চাইল। কারারক্ষী বলল: তাতো জানিনা, তবে একজন আছে নামাজ পড়ে খুব দোয়া করছে, চোখের পানি ফেলছে। ওয়ালি তাকে ডেকে পাঠালেন ও প্রকৃত ঘটনা জানলেন। অন্যায়ভাবে শাস্তি দেয়ার কারণে তার নিকট ক্ষমা চাইলেন। তাকে এক হাজার রৌপ্য মুদ্রা দান করলেন আর বললেন, কখনো কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে আমার কাছে এস। কামার বলল, তোমাকে ক্ষমা করলাম, তোমার উপহারও গ্রহণ করলাম কিন্তু সমস্যার সমাধানের জন্য তোমার দরবারে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওয়ালি কারণ জানতে চাইলে বলল, আমার মত এক ফকিরের জন্য তোমার মত সুলতানের তখত্‌কে কয়েকবার যিনি উল্টিয়ে দেন তার মত মালিককে ছেড়ে সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করা তার উবুদিয়্যাতের পরিপন্থী। নামাজ পড়ে দোয়া করার কারণে তিনি আমাকে অনেক সমস্যা থেকে মুক্ত করেছেন, অনেক আশা পূর্ণ করেছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করে অন্যের দরবারে হাত পাতব? আমার প্রভু তার সীমাহীন রহমতের ভান্ডারের দরজা খুলে রেখেছেন, অসীম

অনুগ্রহের প্রাচুর্য সকলের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছেন, কি করে আমি অন্যের কাছে যাব? তার কাছে চাওয়ার পরও পায়নি এমন কেউ কি আছে? হ্যাঁ, তবে যে চাইতে জানে না সেই কেবল বঞ্চিত হয়। তার দরগাহে আদবের সাথে না গেলে তার রহমত প্রাপ্তি সম্ভব নয়।

প্রসিদ্ধ ওলী হযরত রাবিয়া বসরী (র:) একদা এক ব্যাক্তিকে দোয়া করার সময় বলতে শুনলেন যে, 'হে আমার রব, তোমার রহমতের ভাণ্ডার আমার জন্য খুলে দাও'। এটা শুনে তিনি ঐ ব্যাক্তিকে বললেন: এই যাহিল, আল্লাহ্‌র রহমতের দুয়ার এখন পর্যন্ত কি বন্ধ ছিল যে তা খোলার জন্য আবেদন করছ? (রহমতের আসার পথ সবসময় খোলা থাকলেও সেখানে প্রবেশের পথ তথা ক্বলব সকলের নিকট খোলা অবস্থায় নেই। ক্বলবের খোলার জন্য প্রচুর দোয়া করা প্রয়োজন।)

হে আমার ইলাহ, সকলকে বিপদ আপদ থেকে উদ্ধারকারী একমাত্র তুমি। আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা কর। মুখাপেক্ষীদের সব ধরনের চাহিদা পূরণকারী একমাত্র তুমি। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণময় ও উপকারী সবকিছু আমাদের দান কর। দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে তুমি ছাড়া অন্য কারো মুখাপেক্ষী করিও না। আমীন!

ঘটনা: ঘর পুড়ে যাওয়া

হামিদ তাওইল নামে আল্লাহ্‌র এক অলী ছিলেন। একদা তিনি ঘরের মধ্যে নামাজ আদায় করছিলেন এমতাবস্থায় ঐ ঘরে আগুন লেগেছিল। মহল্লার মানুষজন মিলে সেই আগুন নিভানোর পরে তার স্ত্রী তার নিকটে এসে রাগতস্বরে বলতে লাগল: তোমার ঘর পুড়তেছে, মানুষেরা এসে নিভাচ্ছে। এমন অবস্থায় কতকিছু করা দরকার। অথচ তুমি জায়গা থেকেও নড়ছ না। অলী বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এইসব ঘটনার ব্যাপারে তো আমি কিছুই জানি না। আল্লাহ্‌র দোস্তরা তার মুহাব্বতে ও নৈকট্যে এতটাই হারিয়া যায় যে নিজেদেরকেও ভুলে যায়। তার সাথে সাক্ষাতে এতটাই বিভোর ও মগ্ন থাকে যে বাকী কোন কিছুর খেয়ালও থাকে না।

ঘটনা: পাতিলের পানি

সম্মানিত সাহাবীদের মধ্য থেকে হযরত আবদুল্লাহ বিন শাহির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে নামাজ আদায় করতাম। নামাজের সময় তার বুক থেকে আগুনের উপরের কড়াই থেকে আসা ফুটন্ত পানির আওয়াজের মত শব্দ শুনতে পেতাম।

ঘটনা: পায়ে বিদ্ধ তীর

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় জামাই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া কাররামাল্লাহু ওজহাহু এমনভাবে নামাজ আদায় করতেন যেন দুনিয়া ধ্বংস হলেও তা থেকে তার মনোযোগ বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

এ ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্নিত আছে: একটি জিহাদে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুবারক পায়ে একটি তীর এসে বিদ্ধ হয়েছিল যা তার অস্থি পর্যন্ত পৌঁছেছিল। প্রচণ্ড ব্যাথার জন্য কোন উপায়েই তা বের করা সম্ভব হচ্ছিল না। ডাক্তার দেখানো হল। ডাক্তার বলল: তীর বের করতে হলে আগে আপনাকে অজ্ঞান করতে হবে। এছাড়া কোন অবস্থাতেই বের করা সম্ভব নয় কেননা এটা বের করতে হলে যে পরিমান ব্যাথা লাগবে তা সহ্য করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। ডাক্তারের কথা শুনে আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: অজ্ঞান করার ওষুধের কি প্রয়োজন? একটু অপেক্ষা করুন। নামাজের ওয়াক্ত হোক। আমি নামাজে দাঁড়ালে বের করতে পারবেন। কিছু সময় পরে নামাজের ওয়াক্ত হলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজে দাঁড়ালেন। নামাজরত অবস্থায় ডাক্তার, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহুর মুবারক পায়ের ক্ষত কেটে তীরটি বের করল এবং কাটা স্থানে ব্যান্ডেজ করে দিল। নামাজ শেষে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, তীর বের করেছ? ডাক্তার বলল, হ্যাঁ। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমিতো কোনকিছুই অনুভব করলাম না! আসলে এ ঘটনায় অবাক হওয়ার কিছুই নাই। কেননা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্য দেখে মিসরের রমণীগণও মোহাবিষ্ট হয়ে নিজেদেরকে সম্পূর্নরূপে ভুলে গিয়েছিল। এমনকি অবচেতন মনে কখন যে নিজেদের হাত কেটে ফেলল তাও খেয়াল করল না। মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য, তার সান্নিধ্য, তার প্রেম, তার ভালোবাসা যদি কাউকে মোহাবিষ্ট করে, নিজের ব্যাপারে বেখবর করে দেয় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? মুমিন ব্যাক্তিরাও ইন্তিকালের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন পেয়ে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করা থেকে রেহাই পাবে।

ঘটনা: অজ্ঞান করার ঔষধ

আল্লাহ্‌র জনৈক অলী হযরত আমীর-ই কায়সিন (র:) এর পায়ের আঙ্গুলে একবার ক্যানসার দেখা দিয়েছিল। চিকিৎসক তা কেটে ফেলার পরামর্শ দিলেন। আমীর ত্বাকদীরে যা আছে! বলে চিকিৎসকের পরামর্শমত পায়ের আঙ্গুল কেটে ফেললেন। কিছুদিন পরে তিনি দেখতে পেলেন যে ঐ ক্যানসার তার পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ছড়িয়ে পরেছে। তিনি পুনরায় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন। চিকিৎসক দেখে পায়ের হাঁটু পর্যন্ত কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত দিলেন এবং বললেন, পা কাটার জন্য আগে আমীরকে অজ্ঞান করতে হবে যাতে ব্যাথা

অনুভব করতে না হয়। কেননা এর ব্যাথা মানুষের সহ্যসীমার বাইরে। আমীর বলল এত কষ্ট করার কোন দরকার নাই। সুমধুর কন্ঠে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে পারবে এমন কাউকে নিয়ে আস এবং আমার নিকটে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে বল। কুরআন শুনে যখন আমার চেহারায় পরিবর্তন দেখতে পাবে তখন আমার পা কেটে ফেলবে। কেননা ঐ অবস্থায় আমার কোন অনুভব হবে না। চিকিৎসক আমীরের কথামত করল। প্রথমে একজনকে দিয়ে সুমধুর কন্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করানো হল। কুরআন শুনতে শুনতে আমীরের চেহারার রঙ আস্তে আস্তে বদলে গেল। ঐ অবস্থায় চিকিৎসক আমীরের পায়ের হাঁটু থেকে কেটে ফেলল এবং ব্যান্ডেজ করে দিল। চিকিৎসকের কাজ শেষ হওয়ার পর কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যাক্তি থেমে গেল। আমীর সম্বিত ফিরে পেয়ে চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করল পা কি কেটেছেন? চিকিৎসক বলল, হ্যাঁ কেটেছি। তার পা কাটা, তা তেল দিয়ে পুড়িয়ে ব্যান্ডেজ করে দেয়া ইত্যাদি কিছুই তার কুরআনের প্রতি গভীর মনোযোগকে সামান্যতম বিচ্যুত করতে পারেনি। এরপর তিনি বললেন, আমার কাটা পা আমাকে দাও। তাকে দেয়া হল। তিনি পা তুলে ধরলেন আর বললেন, ইয়া রব! তুমিই প্রকৃত দানকারী আর আমি হলাম তোমার বান্দা, সবকিছুর হুকুম তোমার পক্ষ থেকে আসে তার বাস্তবায়ন তোমার মাধ্যমেই হয়। এটা আমার পা। কিয়ামতের দিন যদি আমায় জিজ্ঞেস কর, তুমি কি কোন গুনাহের প্রতি কখনো এক পাও বাঁড়াও নাই? তখন আমি বলতে পারব, কখনই আমি তোমার আদেশের বাইরে একপাও বাঁড়াই নাই, একটা শ্বাসও নেই নাই।

ঘটনা: নামাজের জন্য ত্যাগস্বীকার

বুরসা নগরী উসমানিয়া খিলাফতের অধীনে আসার পূর্বে ওখানে বসবাসরত এক রোম ব্যাক্তি গোপনে মুসলমান হয়েছিল। তার খুব ঘনিষ্ঠ একজন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল, কি করে তুমি বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে পারলে? তাকে কিছুটা হেয় প্রতিপন্ন করল। রোম ব্যাক্তির জবাবটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তার বন্ধুকে মুসলমান হওয়ার পিছনের প্রকৃত ঘটনা এভাবে বর্ননা করল:

একদা কিছু মুসলমানকে বন্দী করা হয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে একব্যাক্তি আমার ভাগে পরেছিল। একদিন দেখলাম, যেই কক্ষে তাকে আটকে রেখেছিলাম সেখানে সে বিশেষ ভঙ্গীতে উঠা বসা করছে। তার নিকটে গিয়ে কি করছে জিজ্ঞাসা করলাম। সে তার অঙ্গ ভঙ্গী শেষ করার পরে দুহাত দিয়ে মুখ মুছল এবং উত্তরে বলল যে সে নামাজ আদায় করছিল। যদি আমি তাকে তার ইবাদত করতে বাঁধা না দেই তবে প্রত্যেক নামাজের জন্য সে আমাকে একটি করে স্বর্ন মুদ্রা দিবে। তখন আমি কিছুটা লোভী হয়ে গিয়েছিলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই আমি আরো বেশি মুদ্রা দাবী করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত এমন হল যে, প্রত্যেক নামাজের জন্য তার থেকে দশটি করে স্বর্নমুদ্রা দাবী করলাম। সে তাও কবুল করল। ইবাদতের জন্য তার এই ত্যাগ স্বীকার দেখে আমি খুবই

অবাক হয়েছিলাম। একদিন তাকে বললাম, তোমাকে আমি মুক্ত করে দিতে চাই। এ কথা শুনে সে খুব আনন্দিত হল এবং দু হাত উপরে তুলে আমার জন্য এই বলে দোয়া করল: হে মহান আল্লাহ্! তোমার এই বান্দাকে তুমি ঈমানের নূর দিয়ে সম্মানিত কর!

ঐ মুহুর্তে আমার হৃদয়ে মুসলামান হওয়ার জন্য এক তীব্র আকাঙ্খা জাগ্রত হল। ঐ আকাঙ্খা এতটাই তীব্র ছিল যে, তৎক্ষণাৎ কালিমা-ই শাহাদাত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম।

চতুর্থ অধ্যায়

নামাজের প্রকারসমূহ

মুসলমানদেরকে ফরজ, ওয়াজিব ও নফল এই তিন ধরনের নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে।এদের মধ্যে

১.**ফরজ নামাজসমূহ**: পাঁচ ওয়াক্তের ফরজগুলি, জুমার নামাজের দুই রাকাত ও জানাযার নামাজ।(এর মধ্যে জানাযার নামাজ হল ফরজে কিফায়া)

২.**ওয়াজিব নামাজসমূহ**: বিতির নামাজ, ঈদের নামাজ, মানতের নামাজ এবং যে কোন নফল নামাজ আরম্ভের পর পূর্ন না করে ভঙ্গ করলে পুনরায় তা আদায় করা। বিতির নামাজ ক্বাযা হলে তা আদায় করাও ওয়াজিব।

৩.**নফল নামাজসমূহ**:পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সুন্নতসমূহ, তারাবীর নামাজ এবং সওয়াব অর্জনের নিয়তে পঠিত তাহাজ্জুদ, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, ইশরাক্, দুহা, আওয়াবিন, ইসতিখারা, সালাতুত তাসবীহ্ ইত্যাদি নফল নামাজ। অর্থাৎ এগুলি আদায় করার ব্যাপারে আদেশ নেই তবে ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ আদায়ের পরে এই নামাজগুলি আদায় করলে অধিক সওয়াব অর্জন করা সম্ভব।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ

নামাজ হল মহান আল্লাহ তায়ালার একটি আদেশ। পবিত্র কুর্আনের শতাধিক স্থানে মহান আল্লাহ "**নামাজ আদায় কর**" বলে আদেশ জারি করেছেন।পবিত্র কুর্আনে ও হাদিস শরীফে প্রাপ্তবয়স্ক(বালিগ) এবং বোধ শক্তিসম্পন্ন(আকিল) প্রত্যেক মুসলমানকে প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য আদেশ করা হয়েছে।

সূরা রূম্ এর সতের ও আঠার নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে যে: "**মাগরিবের সময় ও ভোরে এবং এশার সময়ে ও দূপুরে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষনা(তাসবীহ) কর আর আসমান ও জমিনের সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র তারই প্রাপ্য**"। সূরা বাকারার দুইশত উনচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে: "**নামাজসমূহ হেফাজত কর বিশেষ করে আছরের নামাজ**" অর্থাৎ নামাজসমূহ নিয়মিতভাবে আদায় কর।পবিত্র আয়াতসমূহে তাসবীহ ও হামদ

শব্দদ্বয়ের দ্বারা নামাজকে বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে তাফসীরগ্রন্থগুলোতে বর্ননা রয়েছে। সূরা হুদ্‌ এর একশত চৌদ্দ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে যে, " দিনের দুই প্রান্তে(যোহর ও আছরের ওয়াক্তে) এবং রাতের নিকটবর্তী তিন সময়ে (মাগরিব, এশা ও ফজরের ওয়াক্তে) নামাজ কায়েম কর। নিশ্চয়ই (এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের)সওয়াব (সগীরা) গুনাহসমূহকে মুছে দেয়। এর মাঝে চিন্তাশীলদের জন্য নসীহত রয়েছে।

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন যে: আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করাকে ফরজ করেছেন। যে ব্যাক্তি সুন্দরভাবে ওজু করে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মত পড়বে এবং রুকু ও সেজদা পরিপূর্নরূপে আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তে চল্লিশ রাকআত নামাজ রয়েছে। এগুলোর মাঝে সতের রাকআত ফরজ, তিন রাকআত ওয়াজিব এবং বাকী বিশ রাকআত সুন্নত নামাজ। এগুলো হল;

১. **ফজর নামাজ**: চার রাকআত। প্রথমে দুই রাকআত সুন্নত এবং পরবর্তী দুই রাকআত ফরজ নামাজ। ফজর ওয়াক্তের সুন্নত খুবই গুরুত্বপূর্ন। কারো কারো মতে ইহা ওয়াজিব।

২. **যোহর নামাজ**: দশ রাকআত। প্রথমে চার রাকআত সুন্নত, অতঃপর চার রাকআত ফরজ ও ফরজের পর দুই রাকআত সুন্নত আদায় করতে হয়।

৩**. আছরের নামাজ**: আট রাকআত। প্রথমে চার রাকআত সুন্নত এবং পরে চার রাকআত ফরজ নামাজ।

৪. **মাগরিবের নামাজ**: পাঁচ রাকআত। প্রথমে তিন রাকআত ফরজ এবং পরে দুই রাকআত সুন্নত।

৫. **এশার নামাজ**: তের রাকআত। প্রথমে চার রাকআত সুন্নত, তারপর চার রাকআত ফরজ ও দুই রাকআত সুন্নত এবং সবশেষে তিন রাকআত বেতেরের নামাজ আদায় করতে হয়।

আছর ও এশার ওয়াক্তে ফরজ নামাজের পূর্বে যে সুন্নত আদায় করা হয় তা মুয়াক্কাদা নয়। তাই এই নামাজ আদায়ের সময় দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে "**আল্লাহুম্মা সাল্লি ও আল্লাহুম্মা বারিক**" এই দূরুদ পাঠ করতে হয় অতঃপর দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকআতের শুরুতে বিসমিল্লাহ এর পূর্বে সুব্‌হানাকা পাঠ করতে হয়। কিন্‌তু যোহরের ওয়াক্তের প্রথম চার রাকআত নামাজ সুন্নত-ই মুয়াক্কাদা, অর্থাৎ আদায়ের জন্য দৃঢ় আদেশ রয়েছে এবং প্রচুর সওয়াব আছে। এই নামাজের প্রথম বৈঠকে ফরজ নামাজের মত শুধুমাত্র **আত্তাহিয়্যাতু** পরে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াতে হয় অতঃপর সরাসরি বিস্‌মিল্লাহ ও সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়।

যোহর ও এশার ফরজের পর চার রাকআত এবং মাগরিবের ফরজের পর ছয় রাকআত অতিরিক্ত নামাজ আদায় করা মুস্তাহাব। এরজন্য প্রচুর সওয়াব রয়েছে। কেউ চাইলে সবগুলি রাকআত এক সালামের দ্বারা আদায় করতে পারে অথবা প্রত্যেক দুই রাকআত পরপর সালাম ফিরিয়েও আদায় করতে পারে। দুই অবস্থাতেই প্রথম দুই রাকআত ঐ ওয়াক্তের শেষ সুন্নত হিসেবে পরিগণিত হবে। কেউ চাইলে এই মুস্তাহাব নামাজগুলি আলাদাভাবেও আদায় করতে পারে।

নামাজ শুরুর সাথে সাথে প্রথম রাকআত শুরু হয়, পরবর্তী রাকআতগুলি পায়ে দাড়ানোর দ্বারা শুরু হয় ও পরের রাকআতের জন্য পুনরায় পায়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত চলতে থাকে। শেষ রাকআতের সমাপ্তি সালাম ফিরানোর মাধ্যমে হয়। প্রত্যেক জোড় রাকআতে দ্বিতীয় সেজদার পরে বসতে হয়।

প্রত্যেক নামাজের মাঝে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুফছিদ্(নামাজ ভঙ্গকারী) এবং মাকরূহ সমূহ রয়েছে। এগুলো **হানাফী মাজহাব** অনুসারে পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

নামাজের ফরজসমূহ

যা আদায়ের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে স্পষ্ট আদেশ রয়েছে তাই ফরজ। কোনো ইবাদতের ফরজসমূহ সঠিকভাবে আদায় করা না হলে তা সহীহ হয় না, শুদ্ধ হয় না। নামাজের বারটি ফরজ রয়েছে। এগুলির মধ্যে সাতটি নামাজের বাইরের আর বাকী পাঁচটি ভিতরের **ফরজ**। নামাজের বাইরের ফরজগুলিকে শর্ত এবং ভিতরের ফরজগুলিকে **রুকন** বলা হয়।(কতিপয় আলিম, তাক্বীরে তাহরিমাকে নামাজের ভিতরের ফরজ হিসেবে গণনা করেন তাই তাদের মতে নামাজের শর্তও ছয়টি রুকনও ছয়টি।)

নামাজের বাইরের ফরজসমূহ(শর্তসমূহ):

১. **হাদস্ থেকে** (শারীরিক) পবিত্রতা: অজুবিহীন অবস্থায় থাকলে অজু করে আর গোসল ফরজ হয়ে থাকলে গোসল করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা।

২. **নাজাসাত্**(নাপাকী) থেকে পবিত্রতা: নামাজ আদায়কারী ব্যাক্তির শরীর ও পোষাক এবং নামাজের স্থানকে হাল্কা ও ভারী সকল ধরনের নাজাসাত্ থেকে পবিত্র করা। শরীয়ত অনুসারে যা কিছু নাপাক তাকে নাজাসাত বলে। যেমন রক্ত, প্রস্রাব, এলকোহল ইত্যাদি।

৩. **সতর ঢাকা**: লজ্জাস্থান আবৃত করা। ইহা মহান আল্লাহ তায়ালার একটি আদেশ। পুরুষের নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত এবং স্ত্রীলোকের মুখমন্ডল, হাত ও পায়ের পাতা ব্যতীত সর্বাঙ্গ সতরের অন্তর্ভুক্ত। নামাজ আদায়ের সময় সতর ঢাকা ফরজ। নামাজের বাইরে অন্যান্য সময়ে অন্যের সামনে সতর খোলা কিংবা অন্যের সতর দেখা উভয়ই হারাম।

৪. **কিবলামুখী হওয়া**: কিবলার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতে হয়। মুসলমানদের জন্য কিবলা হল মক্কা-ই মুকার্‌রমা শহরে অবস্থিত কা'বা শরীফ।

৫. **ওয়াক্ত হওয়া**: প্রত্যেক ফরজ নামাজের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্ত(সময়) রয়েছে। তাই প্রত্যেকের এই ওয়াক্তগুলি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আর কোন ওয়াক্তের নামাজ আদায় করবে সে ব্যাপারে মনস্থির করতে হবে।

৬. **নিয়্যাত**: নামাজে দাঁড়ানোর সময় মনে মনে নিয়্যাত করতে হয়। শুধুমাত্র মুখে বললে হবে না। মুখে বলার সাথে সাথে তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। নামাজের নাম, ওয়াক্ত, রাকআত সংখ্যা, কিবলা, জামাতের সাথে পড়লে ইমামের আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ে নিয়্যাত করতে হয়। তাকবিরের মাধ্যমে নামাজ শুরুর পূর্বে নিয়্যাত করতে হয়। তাকবিরের পরে নিয়্যাত করলে তা গ্রহনযোগ্য না হওয়ার কারনে ঐ নামাজ বাতিল হয়ে যায়।

৭. **তাকবিরে তাহরিমা**: আল্লাহু আকবর বলে নামাজ শুরু করা। শুরুর এই তাকবিরকে ইফতিতাহ তাকবিরও বলা হয়। আল্লাহু আকবরের পরিবর্তে অন্য কিছু বললে তাকবিরে তাহরিমা হিসেবে গন্য হবে নয়া।

নামাজের ভিতরের ফরজসমূহ(রুকনসমূহ):

নামাজের ভিতরে পাঁচটি ফরজ রয়েছে। এই ফরজগুলিকে নামাজের রুকন বলা হয়। এগুলি হল:

১. **কিয়াম করা**: নামাজ দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরজ। তবে কেউ দাঁড়াতে অক্ষম হলে (যেমন রোগী) বসে আদায় করতে পারবে, বসে আদায় করতে অক্ষম হলে শুয়ে ইশারার মাধ্যমে আদায় করবে। তবে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা জায়েজ নয়।

২. **কিরাআত**: অর্থাৎ মুখে পড়া, তিলাওয়াত করা। নামাজের মধ্যে কুরআন থেকে কোন সূরা অথবা আয়াত পাঠ করা ফরজ।

৩. **রুকু করা**: কিরআতের পর দুই হাত দুই হাটুতে রেখে সামনের দিকে ঝুকে পরা। রুকুতে থাকা অবস্থায় তিনবার "সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আজিম" বলতে হয়। রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা" আর পুরোপুরি দাঁড়ানোর পর "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলতে হয়।

৪. **সেজদা করা**: রুকুর পর নিজেকে জমিতে সঁপে দেয়া। পরপর দুইবার সেজদা করতে। সেজদার সময় দুই হাত, কপাল ও নাক মাটিতে রেখে আল্লাহর দরবারে নিজেকে সঁপে দিতে হয়। এবং কমপক্ষে তিনবার "সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'লা" দোয়াটি পড়তে হয়।

৫. **শেষ বৈঠক**: শেষ রাকআতে "আত্তাহিয়াতু" পড়তে যে পরিমান সময় লাগে ততক্ষন বসে থাকা ফরজ।

নামাজ যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন ইবাদত তা এটি আদায়ের জন্য অবশ্য পালনীয় শর্তসমূহের আধিক্য থেকেও বুঝতে পারা যায়। বান্দার, তার রবের

সম্মুখে কিভাবে উপস্থিত হওয়া উচিত তা নামাজের ফরজ সহ ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, মাকরুহ, মুফসিদ্ ইত্যাদির দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব। বান্দারা প্রত্যেকেই অসহায়, দরিদ্র, দুর্বল, ক্ষুদ্র একএকটি সৃষ্টি। প্রত্যেকটি সৃষ্টিই তার স্রষ্টা তথা মহান আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষি। নামাজ হল বান্দার অসহায়ত্বের প্রকাশকারী একটি ইবাদত।

নামাজ নামক এই ইবাদত সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় পর্যায়ক্রমে এই বইটিতে বর্ননা করা হবে।

নামাজের শর্তসমূহ

১. হাদস্ থেকে পবিত্রতা:

এই অধ্যায়ে অজু, গোসল এবং তায়াম্মুম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

অজু

নামাজ আদায়ের জন্য অজু করা ফরজ। এছাড়াও কুরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য, কা'বা তাওয়াফের জন্য, তিলাওয়াত-ই সেজদা ও জানাযা নামাজ আদায়ের জন্য অজু করা আবশ্যক। অজু করে শোয়া, অজু করে পানাহার করা এক কথায় সর্বক্ষন অজু অবস্থায় থাকার মাঝে প্রচুর সওয়াব রয়েছে।

অজু থাকা অবস্থায় কারো যদি মৃত্যু হয় তবে তাকে শহীদের সমান সওয়াব দেয়া হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে:

"অজু থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরনকারী ব্যাক্তি, মৃত্যু-যন্ত্রনা ভোগ করে না। কারন অজু ব্যাক্তির মুমিন হওয়ার আলামত। অজু নামাজের চাবি এবং গুনাহসমুহ থেকে শরীরকে রক্ষাকারী।"

"মুসলমান ব্যাক্তির অজু করার সাথে সাথে তার কান, চোখ, হাত ও পা থেকে গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অজু শেষ করে বসার সাথে সাথে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।"

"সর্বোত্তম ইবাদত হল নামাজ। মুমিনরা দিনে ও রাতে সর্বদা অজু অবস্থায় থাকে। আর অজু অবস্থায় থাকলে আল্লাহ তাকে সংরক্ষন করেন। অজু অবস্থায় পানাহার করা ব্যাক্তির পেটের খাবার ও পানীয় আল্লাহর জিকির করতে থাকে। যতক্ষন তার মাঝে থাকে ততক্ষন তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।"

অজুর ফরজ, সুন্নত, মুস্তাহাব, মেমনু'(নিষিদ্ধ কাজ) ও মুফসিদ্(ভঙ্গকারী) রয়েছে। কোন কারন ব্যাতীত ইচ্ছাকৃতভাবে অজুবিহীন অবস্থায় নামাজ পড়লে সে কাফির হয়ে যায়। নামাজ আদায়ের সময় অজু ভেঙ্গে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সালাম ফিরিয়ে নামাজ ছেড়ে দিতে হবে। পরবর্তীতে ঐ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই অজু করে পুনরায় ঐ নামাজ আদায় করতে হবে।

অজুর ফরজসমূহ:

হানাফী মাজহাব অনুযায়ী অজুর ফরজ চারটি। এগুলো হল:

১. মূখমন্ডল ধৌত করা।

২. দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করা।

৩. মাথার একচতুর্থাংশ মাছেহ করা অর্থাৎ ভিজা হাত দিয়ে মাথা মোছা।

৪. দুই পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করা।

শাফী মাজহাবে, নিয়্যাত ও তারতীব(ক্রমানুসারে) করা ফরজ। নিয়্যাত মুখ ধৌত করার সময় করতে হয়। পানি মুখে লাগার পূর্বে নিয়্যাত করলে অজু শুদ্ধ হবে না। দাড়ী ধৌত করাও ফরজ। মালিকি মাজহাবে, প্রত্যেকটি অঙ্গ ঘষেঘষে ধৌত করা এবং মুয়ালাত্(এক অঙ্গের পর অন্য অঙ্গ ধৌত করার পূর্বে বিরতি না দেয়া) ফরজ। শিয়া মাজহাবে পা ধৌত করা ফরজ নয়, শুধুমাত্র খালি পায়ের উপর দিয়ে মাসেহ্ করতে হয়।

অজু করার পদ্ধতি:

১. অজু শুরু করার সময় এই দোয়াটি পড়তে হয়: **বিস্‌মিল্লাহিল আজিম ওয়াল হামদুলিল্লাহি আলা দ্বীনিল্ ইসলাম ওয়া আলা তাওফিকিল্ ঈমান। আল-হামদুলিল্লাহিল লাজি জা'লা মাআ' তাহুরা ওয়া জা'লাল ইসলামা নূরা।**(মেহান আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। আমাদেরকে ইসলাম দ্বীন ও ঈমান নেয়ামত প্রদানকারী মহান আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসার একমাত্র দাবিদার। সকল প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই, যিনি পানিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছেন আর ইসলামকে নূর করেছেন)। দোয়া পড়ার পর তিনবার দুই হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করতে হয়।

২. ডান হাত দিয়ে মুখে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করতে হয় এবং এসময় নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করতে হয়। "**আল্লাহুম্মা আস্‌কিনি মিন্ হাওজি নাবিয়্যুকা কা'ছান লা আজমাউ বা'দাহু আবাদা**"।(অর্থাৎ এই আমার আল্লাহ আমাকে তোমার নবীর হাউজ থেকে এক গ্লাস পানি পান করাও যা পান করলে পরবর্তীতে আর কখনো পিপাসিত হব না।)

৩. ডান হাত দিয়ে নাকের মধ্যে তিনবার পানি নিয়ে বাম হাত দিয়ে তা পরিষ্কার করতে হয় আর এই দোয়াটি পাঠ করতে হয়: "**আল্লাহুম্মা আরিহনি রাইহাতাল্-জান্নাতি ওয়ারজুক্‌নি মিন নি'মাতিহা ওলা তুরিহনি রাইহাতান-নার**"।(এই আমার আল্লাহ আমাকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাইয়ে দাও এবং

এর নিয়ামতের দ্বারা প্রাচূর্যমন্ডিত কর, আর জাহান্নামের গন্ধ পাওয়া থেকে বাঁচাও।)

৪. হাতে পানি নিয়ে সমস্ত মুখমন্ডল ভালভাবে তিনবার ধৌত করতে হয় আর এই দোয়াটি পড়তে হয়: "**আল্লাহুম্মা বাইয়্যিদ্ ওজহি বিনূরিকা ইয়াওমা তাবইয়াদ্দু উজুহু আওলিয়াইকা, ওলা তুছাওয়্যিদ ওজহি বি জুনুবি ইয়াওমা তাছওয়াদ্দু উজুহু আ'দাইকা**"।(এই আমার আল্লাহ, যেদিন তোমার আওলিয়ার মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে সেদিন তোমার নূরের দ্বারা আমার মুখমন্ডলও উজ্জ্বল করিও। আর যেদিন তোমার শত্রুদের মুখ কালো হবে সেদিন পাপের কারনে আমার মুখ কালো করিও না।)

৫. বামহাত দিয়ে ডান হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতে হয় আর এ দোয়াটি পড়তে হয়, "**আল্লাহুম্মা আ'তিনি কিতাবি বিয়ামিনি ওয়া হাছিব্নি হিছাবান্ ইয়াছিরা**"। (এই আমার আল্লাহ, আমার আমল দফতর ডান হাতে দিও আর আমার হিসাবনিকাশ সহজ করিও।)

৬. একইভাবে ডানহাত দিয়ে বামহাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করতে হয় আর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তে হয়। "**আল্লাহুম্মা লা তু'তিনি কিতাবি বি শিমালি ওলা মিন ওরায়ি জাহরি ওলা তুহাছিব্নি হিছাবান শাদিদা**"। (এই আমার আল্লাহ আমার আমল দফতর পিছন দিক দিয়ে বামহাতে দিও না এবং কঠিন করে আমার হিসাবনিকাশ করিও না।)

৭. এভাবে দুই হাত ধোয়ার পরে পুনরায় হাত ধৌত করতে হয় এবং ঐ ভিজা হাত দিয়ে মাথা মাসেহ্ করতে হয়। এসময় এই দোয়াটি পড়তে হয়: "**আল্লাহুম্মা হাররিম শা'রি ওয়া বাশারি আলান-নার। ওয়া আজিল্লানি তাহতা জিল্লি আরশিকা ইয়াওমা লা জিল্লা ইল্লা জিল্লু আরশিকা**"। (এই আমার আল্লাহ, আমার চুল ও আমার শরীরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা কর। আর যেদিন তোমার আরশের ছায়া ব্যাতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না সেদিন সেই ছায়ার নিচে আমাকে আশ্রয় দিও।)

৮. অতঃপর দুই হাতের শাহাদত আঙ্গুলের দ্বারা দুই কানের ফুটা ধৌত করে দুই বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে কানের পিছনের দিকের অংশ মাসেহ্ করতে হয় এবং এই দোয়াটি পড়তে হয়: "**আল্লাহুম্মা আয্আ'লনি মিনাল্ লাজিনা ইয়াছতামিয়ুনাল্ কাওলা ফা ইয়াত্তাবিয়ুনা আহছানাহু**"।(এই আমার আল্লাহ আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যারা কথা শুনে ও উত্তম কথাগুলোর অনুসরন করে।)

৯. পরে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসেহ্ করতে হয়। তখন এ দোয়টি পড়তে হয়: "**আল্লাহুম্মা আ'তিক রাকাবাতি মিনান্ নার**"। (এই আল্লাহ আমার ঘাড়কে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও।)

১০. ঘাড় মাসেহ্ করার পর বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে ডান পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে শুরু করে প্রতিটি আঙ্গুলের ফাক ভাল করে ঘষে গোড়ালি সহ তিনবার ধৌত করতে হয় এবং এ দোয়াটি পড়তে হয়: "**আল্লাহুম্মা ছাব্বিত কাদামাইয়্যা আলাস্ সিরাতি ইয়াওমা তাজিল্লু ফিহিল আকদামু**"। (এই আমার আল্লাহ, যেদিন পুলসিরাতের উপরে মানুষদের পা পিছলে যাবে তখন আমার পদদ্বয়কে অবিচল রাখিও।)

১১. এরপর বাম পা তিনবার ধৌত করতে হয়। এসময় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে শুরু করে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্যন্ত প্রতিটি আঙ্গুলের ফাক ভাল করে পরিষ্কার করতে হয় এবং নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়তে হয়: "**আল্লাহুম্মা লা তাত্রুদ কাদামাইয়্যা আলাস-সিরাতি ইয়াওমা তাত্রুদু কুল্লু আকদামি আ'দাইকা। আল্লাহুম্মা আয্আল ছা'ই মাশকুরান ও জানবি মাগ্ফুরান ও আমালি মাকবুলান ও তিজারাতি লান তাবুরা**"। (এই আমার আল্লাহ যেদিন তোমার শত্রুদের পা পুলসিরাতের উপর দিয়ে পিছলে যাবে তখন আমার পাক যেন না পিছলায়। আমার যাবতীয় কাজকর্ম যেন তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়, আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা কর, আমলগুলোকে কবুল কর ও ব্যাবসাকে হালাল কর।)

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বলেছেন: যে কেউ অজু করার পরে নিম্নোক্ত দোয়াটি পরবে মহান আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তার জন্য এর সওয়াব আরশে আ'লাতে সংরক্ষন করবেন। কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সেই সওয়াব গ্রহন করবে। "**সুবহানাকাল্লাহুম্মা ও বিহামদিকা, আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ওহদাকা লা শারিকা লাকা আস্তাগ্ফিরুকা ও আতুবু ইলাইকা। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুকা ও রাসূলুকা**"। (এই আল্লাহ, তোমার প্রশংসা করার মাধ্যমে সকল ধরনের ত্রুটি থেকে তোমাকে পবিত্র ঘোষনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি ব্যাতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, তুমি এক ও অদ্বিতীয়, তোমার কোন শরীক নাই। আমি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ(সঃ) তোমার বান্দা ও রাসূল।)

একটি হাদীসে এভাবে বলা হয়েছে: "যে ব্যাক্তি অজু করার পর একবার সূরা যিলযাল পড়বে মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে সিদ্দিকদের সাথে, দুইবার

পড়লে শহীদদের সাথে আর তিনবার পড়লে নবী-রাসূলদের সাথে হাশর করাবেন”

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে: “যে ব্যাক্তি অজু করার পর আমার (মহানবীর) উপর দশবার দূরুদ পড়বে মহান আল্লাহ তায়ালা তার দুঃখ-কষ্টকে লাঘব করে তাকে সুখী করবেন এবং তার দোয়া কবুল করবেন।

অজু করার সময় উপরোক্ত দোয়াগুলি পড়া আবশ্যক নয় তবে এতে অনেক সোয়াব আছে। তাই এগুলো মুখস্ত করার জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। অজু শেষ করে এই দোয়াটি পড়তে হয়: “**আল্লাহুম্মা আজ্‌আলনি মিনাত্‌ তাওয়্যাবিন, ওজ্‌আলনি মিনাল্‌ মুতাতাহহিরিন, ওজ্‌আলনি মিন ইবাদিকাস্‌ সালিহিন, ওজ্‌আলনি মিনাল্‌ লাজিনা লা খাওফুন আলাইহিম ও লা হুম ইয়াহজানুন**”। এটি অনেক সওয়াবের আমল। অজুর দোয়াসমূহ না জানা থাকলে প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সময় কালিমা-ই শাহাদাত পড়লেও অনেক সওয়াব পাওয়া যায়।

অজুর সুন্নতসমূহ:

অজুর সুন্নতসমূহ নিম্নে বর্নিত হয়েছে:

১. অজু আরম্ভ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা।

২. দুই হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

৩. আলাদা আলাদা পানি নিয়ে তিনবার কুলি করা।

৪. আলাদা আলাদা পানি নিয়ে তিনবার নাক পরিষ্কার করা।

৫. মুখমন্ডল ধোয়ার সময় দাঁড়ি, গোঁফ ও ভ্রুর নিচের চামড়া ভিজাতে হয়।

৬. যাদের দাঁড়ি আছে তারা হাতের আঙ্গুলকে চিরুনির মত বানিয়ে দাঁড়ির ফাকে ফাকে প্রবেশ করিয়ে ধৌত করবে।

৭. মিসওয়াক করা একটি গুরুত্বপূর্ন সুন্নত। মিসওয়াক না থাকলে অন্যকিছু দিইয়ে দাঁত পরিষ্কার করা।

৮. পুরো মাথা মাসেহ্‌ করা।

৯. দুই কান মাসেহ্‌ করা।

১০. ঘাড় মাসেহ্‌ করা।

১১. হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানগুলো ধৌত করা।

১২. অজুতে যে সব অঙ্গ ধৌত করতে হয় তার প্রতিটি তিনবার করে ধোয়া সুন্নত।

১৩. তারতীব, অর্থাৎ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অজু করা।

১৪. অজুতে যে সব অঙ্গ ধৌত করতে হয় তার প্রতিটি ঘষে ঘষে ধৌত করা।

১৫. মুয়ালাত্, অর্থাৎ একটি থেকে অন্য অঙ্গ ধোয়ার মাঝে বিরতি না দেয়া।

অজুর আদবসমূহ:

এখানে আদব বলতে এটা বুঝানো হচ্ছে, যা করলে সওয়াব আছে কিন্তু না করলে গুনাহ নাই। অথচ সুন্নত হল যা করলে সওয়াব আছে কিন্তু না করলে মাকরুহে তানজিহি হয়। আদবকে অনেক সময় মানদুব কিংবা মুস্তাহাবও বলা হয়। অজুর আদবসমূহ নিম্নে বর্ননা করা হল:

১. নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই ঐ নামাজ আদায়ের জন্য অজু করা। তবে যারা মা'জুর(অজু ধরে রাখতে অক্ষম) তাদের জন্য ওয়াক্তের মধ্যেই অজু করা আবশ্যক।

২. অজু ভঙ্গের সময় অর্থাৎ টয়লেট করার সময় কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা পিছন ফিরে বসা মাকরুহে তাহরিমি।

৩. টয়লেট করার পর লজ্জাস্থান পানি দিয়ে পরিষ্কার করা।

৪. এরপর তা পরিষ্কার কিছু দিয়ে মুছে শুকানো।

৫. টয়লেটের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে লজ্জাস্থান আবৃত করা।

৬. অন্যের সাহায্য না চেয়ে নিজেই অজু করতে সচেষ্ট হওয়া।

৭. কিবলার দিকে মুখ করে অজু করা।

৮. প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সময় কালিমা-ই শাহাদাত পড়া।

৯. অজুর অন্যান্য দোয়া পড়া।

১০. কুলি করার জন্য মুখে ডান হাত দিয়ে পানি দেয়া।

১১. নাকে পানি দেয়ার সময়ও ডান হাত দিয়ে দেয়া।

১২. বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করা।

১৩. মুখ ধোয়ার জন্য মিসওয়াক ব্যবহার করা। মিসওয়াক না থাকলে দাঁতের ব্রাশ ব্যবহার করলেও হবে।

১৪. মুখ ধোয়ার সময় ব্যাক্তি যদি রোযাদার না হয়ে থাকে তবে কুলি করা এবং হালকা গড়গড় করা, অজু ও গোসল উভয়ের জন্যই সুন্নত। তবে রোযাদার হলে গড়গড়া করা মাকরুহ।

১৫. নাক ধোয়ার সময় পানি যথাসম্ভব ভিতরে প্রবেশ করানো।

১৬. কান মাসেহ্ করার সময় এক আঙ্গুল দিয়ে কানের ফুটা পরিষ্কার করা।

১৭. পায়ের আঙ্গুল ধোয়ার সময় বামহাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল ব্যবহার করা।

১৮. হাত ধোয়ার সময় যদি হাতে আংটি থাকে তবে তা নড়িয়ে-চড়িয়ে তার নীচের চামড়ায় পানি পৌছাতে হবে। যদি সামান্য স্থান শুকনা থাকে তবে অজু হবে না।

১৯. অনেক পানি থাকলেও ইছ্‌রাফ(অপচয়) না করা।

২০. আবার পর্যাপ্ত পানি থাকা সত্বেও তেল মাখানোর মত করে খুব অল্প পানি ব্যবহার করাও উচিত না।

২১. যেখানে বদনা কিংবা পাত্র দিয়ে অজু করা হয় সেখানে অজু করার পর ঐ পাত্রটি পূর্ন করে রাখা।

২২. অজু শেষ করে "আল্লাহুম্মা আজ্‌আলনি মিনাত-তাওয়াবিন" দোয়াটি পড়া।

২৩. অজু করে দুই রাকাআত নফল নামাজ আদায় করা।

২৪. অজু থাকা সত্বেও নতুন ওয়াক্তের নামাজের জন্য পুনরায় অজু করা।

২৫. মুখমন্ডল ধোয়ার সময় চোখের কোনা, পাপড়ি ইত্যাদিও পরিষ্কার করা।

২৬. মুখ, হাত ও পা ধোয়ার সময় যতটুকু ধোয়া ফরজ তার চেয়ে একতু বেশী করে ধোয়া।

২৭. অজু করার সময় ব্যবহৃত পানি যেন পোষাকে না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখা।

২৮. অন্য মাজহাবে অনুযায়ী ফরজ কোন আমল যদি নিজ মাজহাবে মাকরুহ না হয়ে থাকে এবং মুবাহ হয় তবে তা আদায় করা মুস্তাহাব।

অজু আদায়ের সময় নিষিদ্ধ কর্ম:

অজু করার সময় নিম্নোক্ত কাজগুলি করা হারাম অথবা মাকরুহ।

১. টয়লেট করার সময় কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে কিংবা পিছন ফিরে বসা উচিত নয়।

২. টয়লেট করা সহ সর্বাবস্থায় অন্য কারো সামনে নিজের লজ্জাস্থান প্রকাশ করা হারাম।

৩. টয়লেট করার পর ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান পরিষ্কার করা উচিত নয়।

৪. পানি না পাওয়া গেলে খাবার, গোবর, কয়লা, পশুর খাদ্য, অন্যের সম্পত্তি, পাতা ইত্যাদি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন মাকরুহ।

৫. যে হাউজের পানি দিয়ে অজু করা হয় সেখানে থুতু ফেলা, কফ ফেলা নিষেধ।

৬. অজু করার সময় অঙ্গগুলির সীমা থেকে অতিরিক্ত বেশী বা কম ধোয়া উচিত নয়। একইভাবে প্রতিটি অঙ্গ তিনবারের কম বা বেশী ধোয়াও ঠিক নয়।

৭. অজু করার পর অঙ্গ মোছার জন্য পবিত্র কিছু ব্যহার করা।

৮. মুখ ধোয়ার সময় মুখে পানি ছিটকানো উচিত নয় বরং কপালের উপর দিয়ে নীচের দিকে পানি ছেড়ে দিতে হয়।

৯. পানিতে ফু না দেয়া।

১০. মুখ ধোয়ার সময় চোখ ও মুখ শক্ত করে বন্ধ করে রাখা ঠিক না। কারন ঠোটের বাইরের অংশ ও চোখের পাতার সামান্য অংশও শুকনা থাকলে অজু হয় না।

১১. ডান হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার না করা।

১২. মাথা, কান ও ঘাড় মাসেহ করার সময় প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদাভাবে হাত ভিজিয়ে ঝেরে মাসেহ করার দরকার নেই, একবার ভিজিয়েই প্রতিটি অঙ্গ মাসেহ করা যায়।

মিসওয়াক ব্যবহার করা:

অজু করার সময় মিসওয়াক ব্যবহার করা সুন্নত-ই মুয়াক্কাদা। পবিত্র হাদিস শরিফে বলা হয়েছে যে: “মিসওয়াক ব্যবহার করে আদায় করা নামাজ মিসওয়াক ব্যবহার না করে আদায় করা নামাজের চেয়ে সত্তরগুন বেশী মর্যাদাবান”।

‘সিরাজুল ওহহাজ’ নামক গ্রন্থে মিসওয়াক ব্যবহারের পনেরটি উপকারিতা বর্ননা করা হয়েছে। এগুলো হল:

১. মৃত্যুর সময় কালিমা-ই শাহাদাত বলার সৌভাগ্য হবে।

২. মাড়ি শক্ত ও মজবুত করে।

৩. কফ পরিষ্কার করে।

৪. কিডনীর সুরক্ষা করে।

৫. দাঁতের ব্যাথা কমায়।

৬. মুখের গন্ধ দূর করে।

৭. মহান আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হবেন।

৮. রক্ত চলাচলের ধমনীকে শক্তিশালী করে।

৯. শয়তান অখুশী হয়।

১০. চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়।

১১. অনেক পূন্য ও সওয়াব অর্জন করে।

১২. সুন্নতের অনুসরণ করা হয়।

১৩. মুখ পবিত্র থাকে।

১৪. ফাসিহুল-লিসান অর্থাৎ শুদ্ধভাষী ও উত্তম বক্তা হয়।

১৫. মিসওয়াক ব্যবহার করে আদায় করা নামাজ মিসওয়াক ব্যবহার না করে আদায় করা নামাজের চেয়ে সত্তরগুন বেশী মর্যাদাবান হয়।

মিসওয়াক, আরব দেশে উৎপন্ন হওয়া এরাক নামক গাছের ডাল থেকে বানানো হয়। ডালের এক দিকের মাথা থেকে কিছু অংশের ছাল তুলে কয়েক ঘন্টার জন্য একটি ছোট পাত্রে পানি নিয়ে তাতে ভিজিয়ে রাখতে হয়। নরম হওয়ার পর ঐ ভিজানো অংশকে থেতলে ব্রাশের মত করে নিতে হয়। এরাক গাছ না পাওয়া গেলে জয়তুন গাছের ডাল দিয়েও মিসওয়াক করা যায়।

অজু করার সময় যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়:

জরুরী অবস্থায় কিংবা বাধ্য না হলে নিম্নোক্ত দশটি বিষয় পালন করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

১. কারো যদি হাত বা পা না থাকে তবে স্বাভাবিকভাবেই তার ঐ ফরজগুলোন আদায় করতে হয় না।

২. অসুস্থ ও অক্ষম ব্যাক্তিকে তার মা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই অজু করিয়ে দিতে পারে।

৩. পানির পরিবর্তে শুকনো মাটি, পাথর ইত্যাদি দিয়েও টয়লেটের পর পবিত্রতা অর্জন সম্ভব।

৪. কেউ যদি চব্বিশ ঘন্টার চেয়ে বেশী সময় পাগল কিংবা অজ্ঞান অবস্থায় থাকে তবে সুস্থ হওয়ার পর ঐ সময়ের নামাজের কাজা আদায় করতে হয় না। কিন্তু যদি সে মদ, ওষুধ বা নেশা জাতীয় পদার্থের কারনে অজ্ঞান হয় তবে ঐ অবস্থার প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজ কাজা আদায় করতে হয়। কেউ যদি শোয়া অবস্থায় ইশারার মাধ্যমেও নামাজ আদায়ে অক্ষম হয় এবং এ অবস্থায় চব্বিশ ঘন্টার বেশী পার করে তবে তার জ্ঞান থাকা স্বত্বেও নামাজ কাজা করতে হয় না।

৫. টয়লেটে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন পোষাক ব্যবহার করা এবং মাথা ঢাকা মুস্তাহাব।

৬. টয়লেট প্রবেশের সময় সাথে আল্লাহর নাম কিংবা পবিত্র কোরআনের অংশ বিশেষ রাখা উচিত নয়। অবশ্য কিছু দ্বারা মোড়ানো হলে সমস্যা নেই।

৭. টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা আর বের হওয়ার সময় ডান পা ব্যবহার করতে হয়।

৮. টয়লেটে থাকা অবস্থায়ও পুরোপুরি উলঙ্গ হওয়া উচিত না। এসময় কথা বলাও ঠিক না।

৯. নিজের লজ্জাস্থানের ও নাজাসাতের দিকে তাকানো উচিত না।

১০. পানিতে, মসজিদের দেয়ালে, কবরস্থানে এবং পথের উপরে মলমূত্র ত্যাগ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

অজু ভঙ্গের কারন:

সাতটি কারনে অজু ভঙ্গ হয়। এগুলো হল:

১. সামনের ও পিছনের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে। তা মল-মূত্র, মনী-মযী যাই হোক না কেন অজু নষ্ট হয়।

২. মুখ দিয়ে যদি নাজাসাত বের হয়, যেমন:

ক. মুখ ভর্তি বমি হলে।

খ. থুতুর সাথে অধিক পরিমান রক্ত বের হলে।

গ. মুখ দিয়ে রক্ত বের হলে।

ঘ. কানে দেয়া তেল, ওষুধ মুখে চলে আসলে।

৩. চামড়া থেকে যদি নিম্নোক্ত বস্তু নির্গত হয় তবে ওজু নষ্ট হয়।

ক. রক্ত, পুঁজ বের হলে।

খ. যে সব স্থান গোসলের জন্য ধোয়া ফরজ সেখানে গড়িয়ে পরা রক্ত ও পুঁজ যেমন নাক দিয়ে, কান দিয়ে বের হলে।

গ. ক্ষত থেকে বের হওয়া পানি তুলা বা অন্য কিছু দিয়ে মুছলে।

ঘ. মিসওয়াক বা খিলানি ব্যবহারের কারনে মুখে রক্ত এলে।

ঙ. কান, নাভী, স্তন থেকে অসুস্থতার জন্য পানি বের হলে।

৪. ঘুমালে। শুয়ে কিংবা কোন কিছুতে হেলান দিয়ে ঘুমালে অজু ভাঙ্গে।

৫. অজ্ঞান হলে, পাগল হলে, মৃগী রোগে আক্রান্ত হলে,মাতাল হলে অজু নষ্ট হয়ে যায়।

৬. নামাজের মধ্যে শব্দ করে হাসলে অজু ও নামাজ উভয়ই ভঙ্গ হয়। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে নষ্ট হয় না। নামাজের মধ্যে তাবাসসুম করলে অজু ও নামাজ কোনটিই ভঙ্গ হয় না। এখানে শব্দ করে হাসা বলতে পাশের ব্যাক্তি শুনতে পায় এমনভাবে হাসাকে বোঝানো হচ্ছে। আর তাবাসসুম বলতে যে হাসির আওয়াজ নিজেও শুনতে পায় না এমন হাসিকে বোঝানো হচ্ছে।

৭. স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের যৌনাঙ্গে সরাসরি স্পর্শ হলে অজু নষ্ট হয়।

অজু থাকা অবস্থায় যদি সন্দেহ জাগে যে হয়ত অজু নাই, সেক্ষেত্রে তার অজু বিদ্যমান বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি অজু নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এরপরে অজু করেছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তবে অজু করা আবশ্যক হবে।

যেসব কারনে অজু ভঙ্গ হয় না:

নিম্নোক্ত কারনে অজু ভঙ্গ হয় না।

১. মুখ, কান, চামড়া থেকে পোকা বের হলে,

২. কফ ফেললে।

৩. থুতুর সাথে বের হওয়া রক্ত যদি পরিমানে থুতুর চেয়ে কম হয়।

৪. দাঁত থেকে থুতুর চেয়ে কম পরিমানে রক্ত বের হলে।

৫. জমাট বাধা রক্ত বের হলে।

৬. অল্প পরিমানে রক্ত বের হলে।

৭. কানে দেয়া ওষুধ পুনরায় কান অথবা নাক দিয়ে বের হলে।

৮. নাকে দেয়া ওষুধ পুনরায় নাক দিয়ে বের হলে।

৯. কোন কিছুতে কামড় দেয়ার পর তাতে রক্ত দেখলে।

১০. চোখ দিয়ে পানি বের হলে।

১১. মা তার বাচ্চাকে দুধ পান করালে।

১২. ঘাম বের হলে তা পরিমানে বেশী হলেও অজু নষ্ট হয় না।

১৩. মশা, পোকা-মাকড়, পিপড়া ইত্যাদি কামড় দিয়ে যতই রক্ত খাক না কেন অজু ভাঙ্গে না।

১৪. চামড়া থেকে অল্প পরিমানে রক্ত বের হয়ে যদি তা একটুও না ছড়ায়।

১৫. কোন কিছুতে হেলান দিয়ে ঘুমানোর পরে যদি সে বস্তুটি সরিয়ে নিলে পরে যাওয়ার আশংকা না থাকে।

১৬. নামাজে দাঁড়িয়ে ঘুমালে।

১৭. হাটু গেড়ে তার উপর মাথা রেখে ঘুমালে।

১৮. কোন কিছুতে হেলান না দিয়ে বসে বসে ঘুমালে।

১৯. চলন্ত কোন পশুর উপরে ঘুমালে। এক্ষেত্রে সরাসরি পশুর উপরে থাকতে হবে।

২০. নামাজের মধ্যে তাবাসসুম অর্থাৎ দাঁত বের না করে এবং শব্দ না করে হাসলে।

২১. নামাজের মধ্যে যার শব্দ শুধুমাত্র নিজে শুনতে পায় এমনভাবে হালকা হাসলে নামাজ ভেঙ্গে যায় কিন্তু অজু ভাঙ্গে না।

২২. চুল, দাড়ি, গোঁফ ও নখ কাটলে।

২৩. ক্ষতস্থান থেকে জমাট বাধা রক্তের শুকনো আবরন পরলে অজু নষ্ট হয় না।

অজুর বিষয়ে আরও কিছু মাসআলা:

১-জুতার উপরে মাসেহ করা প্রসংগে:

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সব জুতার উপরে মাসেহ করা যায় না। এমন জুতা যা পায়ের যে অংশ অজুর সময় ধোয়া ফরজ তার সবতুকু আবৃত করে এবং যার ভিতর দিয়ে পানি প্রবেশ করতে পারে না। একে মাসত্ বলা হয়। জুতা পায়ের সাথে আঁটসাঁট হতে হয়। যদি লম্বা বা প্রশস্ত হওয়ার কারনে পা ও জুতার চামড়ার মাঝে খালি যায়গা থাকে তবে তাতে মাসেহ যায়েজ নয়।

শীতকালীন দেশে ব্যবহৃত চামড়ার মোজার উপরেও মাসেহ করা সম্ভব। চামড়া ছাড়াও অন্য কিছুর তৈরী মোটা মোজা যার ভিতরে পানি প্রবেশ করে না তার উপরেও মাসেহ করা সম্ভব।

অজু অবস্থায় মাসত্ পরিধান করতে হয় অথবা প্রথমে পা ধুয়ে মাসত্ পরিধান করে পরে অজু করে নিতে হয়। মাসত্ পরিহিত অবস্থায় অজু ভেঙ্গে গেলে নতুন করে অজু করার সময় পা না ধুয়ে মাসতের উপর দিয়ে মাসেহ করলেই অজু হয়া যায়।

মাসত্ এর উপরের অংশে মাসেহ্ করতে হয়। মাসত্ এর নিচের অংশে মাসেহ করতে হয় না।

মাসত্ এর উপরে মাসেহ করার সুন্নত পদ্ধতি হল, ডান হাতের পাঁচটি আঙ্গুল ভিজিয়ে ডান মাসত্ এর উপরে এবং বাম হাতের আঙ্গুল বাম মাসত্ এর উপরে রেখে পায়ের আঙ্গুলের দিক থাকে গোড়ালি পর্যন্ত মাসেহ করা। মাসেহ করার সময় হাতের তালু লাগানো উচিত নয়। মাসেহ এর ক্ষেত্রে নূন্যতম তিন আঙ্গুল পরিমান স্থান মুছা ফরজ।

হাতের উপরের পৃষ্ঠ দিয়ে মাসেহ করা যায়েজ হলেও ভিতরের দিক থেকে করা সুন্নত।

অজু অবস্থায় মাসত্ পরিধান করার পর মুকিম ব্যাক্তির জন্য চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত নতুন অজু করার সময় পা ধোয়ার পরিবর্তে মাসত্ এর উপরে মাসেহ করা যথেষ্ঠ হবে। এই সময়টা যখন থেকে মাসত্ পরিধান করে তখন থেকে নয় বরং অজু ভঙ্গের পর থেকে শুরু হয়। মাসত্ পরিধানকারী ব্যাক্তি অজু ভঙ্গের চব্বিশ ঘন্টার আগেই সফরে বের হলে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত ঐ মাসত্ এর উপর মাসেহ করতে পারবে। ঠিক একইভাবে মাসত্ পরিহিত মুসাফির যদি অজু ভঙ্গের চব্বিশ ঘন্টা পর মুকিম হয় তবে তাকে মাসত্ খুলে পা ধুয়ে অজু করতে হবে।

মাসত্ এ পায়ের তিন আঙ্গুলের সমান বা তার বেশী পরিমান ছিদ্র থাকলে মাসেহ করা বৈধ নয় তবে এর চেয়ে অল্প পরিমান ছিদ্র থাকলে মাসেহ

করতে পারবে। যদি মাসত্ এ একাধিক ছিদ্র থাকে আর সবগুলি একত্রে তিন আঙ্গুল পরিমান হয় সেক্ষেত্রেও মাসেহ করা যাবে না। কিন্তু যদি এক মাসত্ এ দুই আঙ্গুল পরিমান এবং অন্য মাসত্ এ দুই আঙ্গুল পরিমান ছিদ্র থাকে তবে মাসেহ করা যায়েজ। এখানে তিন আঙ্গুল পরিমান ছিদ্র বলতে আঙ্গুলের পুরোপুরি দেখা যায় এই পরিমান ছিদ্র বুঝানো হয়েছে।

২-ক্ষত ও ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করা প্রসংগে:

ক্ষতের উপর বাধা পট্টি বা ব্যান্ডেজ উঠিয়ে তার নিচে পানি দিতে গেলে যদি ক্ষতির সম্ভবনা থাকে তবে তার উপর দিয়ে মাসেহ করলেই ফরয আদায় হয়ে যায়।

অজু ধরে রাখতে অক্ষম ব্যাক্তি অজু করার পর যত ইচ্ছা ফরজ, নফল নামাজ পড়তে পারে, কোর্‌আন তিলাওয়াত করতে পারে। কিন্তু যে ওয়াক্তে অজু করল সে ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার অজুও নষ্ট হয়ে যায়। একারনে প্রত্যেক নামাজ ওয়াক্তের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে অজু করতে হয় এবং এক অজু দিয়ে ঐ ওয়াক্তের মধ্যে যত খুশি তত ইবাদত করতে পারে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে একজন ব্যাক্তি তখনি অজু ধরে রাখতে অপারগ হিসেবে বিবেচিত হবে যখন তার মাঝে অজু ভঙ্গের কারনসমূহ থেকে কোন একটি প্রতিনিয়ত প্রকাশ পেতে থাকে। কোন ওয়াক্তে অজু করে ঐ ওয়াক্তের শুধু ফরজ নামাজ আদায় করা পর্যন্তও যদি অজু ধরে রাখতে না পারে তবে সে অপারগ তথা মা'যুর হিসেবে বিবেচিত হবে।

গোসল

নামাজের শুদ্ধ হওয়ার জন্য অজু ও গোসলের শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলন, যৌন তৃপ্তি, স্বপ্নদোষ এবং মহিলাদের জন্য হায়েজ ও নিফাস বন্ধ হলে গোসল ফরজ হয়। গোসল ফরজ হওয়ার পর ঐ নামাজ ওয়াক্তের ফরজ পড়তে যে টুকু সময় প্রয়োজন তার পূর্বেই গোসল করে নেয়া আবশ্যক।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "**যে ফরজ গোসল আদায় করল তাকে তার শরীরের পশম পরিমান সওয়াব প্রদান করা হয়। এবং তত পরিমান গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। জান্নাতের স্তরের উন্নতি হয়। গোসলের জন্য তাকে যে পরিমান সওয়াব দেয়া হয় তা দুনিয়ার সবকিছু থেকে অধিক উত্তম। মহান আল্লাহ তার ফেরেশতাদের বলেন, দেখ আমার বান্দাকে, রাত্রিকালে অলসতা না করে আমার আদেশের কথা চিন্তা করে অপবিত্র অবস্থা থেকে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করেছে। তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি আমার এই বান্দার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিলাম**"।

অন্য এক হাদিসে বলা লহয়েছে যে, "**অপবিত্র হওয়ার সাথে সাথে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন কর, কেননা কিরামান কাতিবিন ফেরেশতারা অপবিত্র ব্যাক্তি থেকে কষ্ট পায়**"। ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলাইহ বলেছেন: "**স্বপ্নে কোণ একব্যাক্তি আমায় বলল যে, আমি কিছুটা সময় অপবিত্র অবস্থায় অতিবাহিত করেছি এর শাস্তি হিসেবে আমাকে আগুনের পোষাক পরিয়ে দেয়া হল এবং এখনও আমি আগুনের মাঝেই আছি**"। হাদিসে আরো বলা হয়েছে যে, "**ছবি, কুকুর ও অপবিত্র ব্যাক্তি যে ঘরে থাকে সেখানে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা প্রবেশ করেন না**"।

নামাজ পড়ুক কিংবা না পড়ুক এক নামাজ ওয়াক্ত পরিমান সময় যদি কেউ অপবিত্র অবস্থায় পার করে তবে তাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। পানি দিয়ে গোসল করা সম্ভব না হলে অন্তত পক্ষে তায়াম্মুম করে নিতে পারে। অপবিত্র অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজগুলি করা যায় না:

১. কোন ধরনের নামাজ আদায় করতে পারে না।

২. পবিত্র কোর্‌আন কিংবা এর কোন আয়াত স্পর্শ করতে পারে না।

৩. কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতে পারে না।

৪. মসজিদে প্রবেশ করতে পারে না।

গোসলের ফরজসমূহ:

হানাফী মাজহাব অনুযায়ী গোসলের ফরজ তিনটি।

১. মুখ ধৌত করা। মুখের ভিতরের বিন্দুমাত্র যায়গায় পানি না পৌছলে গোসল শুদ্ধ হয় না। এমনকি দাতের ফাকেও পানি পৌছাতে হয়।

২. নাক পরিষ্কার করা। নাকের ভিতরের হাড্ডি পর্যন্ত পানি পৌছাতে হয়। হানবলী মাজহাব অনুযায়ী নাক ও মুখ ধোয়া গোসলেও ফরজ অজুর জন্যও ফরজ। শাফেঈ মাজহাব অনুযায়ী গোসলের জন্য নিয়্যাত করাও ফরজ।

৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা। নাভী, দাড়ি, গোঁফ, ভ্রু, চুল ইত্যাদি এবং এগুলোর নিচের চামড়াতেও পানি পৌছাতে হবে। নখ, ঠোট, চোখের পাতায় কিংবা শরীরের অন্য যে কোন স্থানে যদি এমন কিছু থাকে যার ভিতর দিয়ে পানি চামড়ায় পৌছায় না তবে গোসলের ফরজ আদায় হবে না। যেমন, নখ পালিশ, লিপষ্টিক, রঙ ইত্যাদি।

গোসলের সুন্নতসমূহ:

১. প্রথমে দুই হাত ধুয়ে নেয়া।

২. লজ্জাস্থান পরিষ্কার করা।

৩. সমস্ত শরীর থেকে ময়লা পরিষ্কার করা।

৪. গোসলের পূর্বে অজু করা, মুখ ধোয়ার সময় গোসলের নিয়্যাত করা। শাফেঈ মাজহাব অনুযায়ী নিয়্যাত করা ফরজ।

৫. সমস্ত শরীর ডলে ডলে তিনবার ধৌত করা।

৬. শরীর ধোয়া হয়ে যাওয়ার পর সর্বশেষে দুই পা ধৌত করা।

গোসল করার পদ্ধতি:

সুন্নত অনুসারে ফরজ গোসল আদায়ের পদ্ধতি নিম্নে বর্নিত হল:

১. সর্ব প্রথম দুই হাত ভাল করে ধুয়ে নিতে হয়। হাত পরিষ্কার থাকলেও ধুয়ে নেয়া উত্তম। অতঃপর লজ্জাস্থান ও শরীরের কোন স্থানে নাপাকী লেগে থাকলে তা উত্তমভাবে পরিষ্কার করতে হয়।

২. এরপর অজু করে নিতে হয়। মুখ ধোয়ার সময় গোসলের নিয়্যাত করতে হয়। গোসলের স্থানে নিচে যদি পানি না জমে, তবে পাও ধুয়ে নিতে হয়।

৩. তারপর পুরো শরীরে তিনবার পানি দিয়ে ধুতে হয়। প্রথমে তিন বার মাথায় তারপর তিনবার ডান কাধে ও পরে তিনবার বাম কাধে পানি দিতে হয়। শরীরের সব জায়গা ভিজে এমনভাবে পানি দেয়া দরকার। প্রথম পানি দেয়ার সময় শরীর ডলে ডলে ধোয়া দরকার।

গোসলের সময় এক অঙ্গে ব্যবহৃত পানি অন্য অঙ্গে লাগলে উভয়ই পাক হয়। কারন গোসলের ক্ষেত্রে পুরো শরীর এক অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু অজুর ক্ষেত্রে এক অঙ্গে ব্যবহৃত পানি দিয়ে অন্য অঙ্গ ধুলে ঐ অঙ্গটি নাপাক অবস্থায় থেকে যায়। গোসল শেষ হওয়ার পর পুনরায় অজু করা মাকরুহ। কিন্তু যদি গোসল করার সময় অজু ভেঙ্গে যায় তবে পুনরায় অজু করা আবশ্যক।

গোসল সংক্রান্ত অন্যান্য মাস্য়ালা:

বাধাই করা অথবা ফিলিং করা দাঁত প্রসংগে:

হানাফী মাজ্হাব অনুযায়ী দাঁতের ফাঁক কিংবা গর্তে পানি না পৌছালে গোসল শুদ্ধ হবে না। এজন্য দাঁতে যদি স্বর্ন, রূপা কিংবা অন্য কিছুর প্রলেপ দেয়া থাকে এবং এ কারনে এর নিচে পানি না পৌছালে গোসল শুদ্ধ হবে না। এমতাবস্থায় এ বিষয়টির জন্য অন্য মাজ্হাবের অনুসরন করে নাপাকী থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

এব্যাপারে তাহতাবী, '**মেরাকুল-ফেলাহ**' নামক গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যায় এবং এতিএ তুরকিশ সংস্করণ **নিমাত ই ইসলাম** কিতাবে বলেন যে: হানাফী মাজ্হাবের কোন অনুসারী কোন বিষয়ে নিজ মাজ্হাবের অনুসরন করতে অক্ষম হয়ে শাফেয়ী মাজ্হাবের অনুসরন করলে কোন ক্ষতি নাই। '**বাহরুর রায়েক**' এবং '**নাহরুল ফায়েক**' কিতাবের মাঝেও এরূপ বর্ননা রয়েছে। কিন্তু কোন বিষয়ে অন্য মাজ্হাবের অনুসরন করলে ঐ বিষয় সম্পর্কিত ঐ মাজ্হাবের যাবতীয় শর্ত পালন করা আবশ্যক। একই বিষয়ের অন্যান্য শর্ত পালন না করে শুধুমাত্র নিজের সুবিধার জন্য তুলনামূলক সহজ শর্তটি পালন করা জায়েজ নয়। যে এরূপ করে তাকে **মুলাফফিক** বলা হয়।

নিজের মাজ্হাব অনুযায়ী ফরজ এমন কোন আমল করতে কেউ অপারগ হলে শধুমাত্র ঐ ফরজটি পালনের উদ্দেশ্যে অন্য মাজ্হাবের অনুসরন করা জরুরী হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ঐ ফরজের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় শর্তও পালন করা আবশ্যক। এ কারনে প্রলেপযুক্ত কিংবা ফিলিং করা দাঁত যাদের আছে তারা মালিকি অথবা শাফেয়ী মাজহাবের অনুসরনের সময় গোসল, অজু ও নামাজের নিয়্যাতের সময় ইমাম শাফেয়ী অথবা ইমাম মালিকের অনুসরনের বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন। নিয়্যাতের সময় এই বিষয়টি উল্লেখ করলে গোসল সহীহ হবে,নিয়তটি এভাবে হবে, **আমি হানাফি অথবা শাফি মাঝহাব অনুযায়ী গোসলের নিয়ত করছি**। আর এভাবে তারা অপবিত্র অবস্থা থেক মুক্তি পেতে পারে। এবং তাদের অজু ও নামাজ শুদ্ধ হবে। তিনি ইমামতিও করতে পারেন, এসকল সমস্যা ছাড়া বাক্তির পরিবর্তে।

শাফেয়ী মাজ্হাবের অনুসরন কারী ব্যক্তির, ইমামের পিছনে জামাতে নামজ পড়ার সময় সূরা ফাতিহা পড়তে হয়। এ ছাড়া নিজের কিংবা অন্য কারো লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অথবা গায়রে মাহরেম(যাদের সাথে বিয়ে বৈধ তাদের)কারো চামড়ার সাথে সরাসরি চামড়ার স্পর্শ লাগলে শাফেয়ী মাজ্হাব অনুযায়ী অজু ভেঙ্গে যায় তাই নতুন করে অজু করতে হয়। অজু করার সময় নিয়্যাত করাও ফরজ।এই মাজ্হাব অনুযায়ী পবিত্র কোর্আন স্পর্শের জন্যও অজু থাকা আবশ্যক। হানাফী মাজহাবের অনুসারী কোন ব্যাক্তি যদি মুসাফির

অবস্থায় শাফেয়ী মাজ্হাবের অনুসরন করে, যোহর ও আছ্রের নামাজ এবং মাগরিব ও এশার নামাজ তাকদিম ও তা'হির করতে ইচ্ছা পোষন করে তবে তাকে অজু করার সময়ও শাফেয়ী মাজহাবের অনুসরন করতে হবে।

হায়েজ ও নিফাস সম্পর্কে:

পাঁচটি কারনে গোসল ফরজ হয়। এগুলোর মধ্যে দুটি কারন হল মহিলাদের হায়েজ ও নিফাস অবস্থার সমাপ্তি।

ইবনে আবিদীন **মানহালুল ওয়ারিদিন** নামক গ্রন্থে বলেছেন যে: প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান রাখা ফরজ। এ ব্যাপারে সকল ফিকাহবিদ ঐক্যমত পোষন করেছেন। মুসলমান নারীদেরও তাই হায়েজ ও নিফাস সম্পর্কে জ্ঞান রাখা জরুরী। বিয়ের সময় পুরুষদের এ বিষয়ে ধারনা রাখা আবশ্যক।

হায়েজ,নারীদের নয় বছর বয়স থেকে শুরু করে লজ্জাস্থান থেকে কমপক্ষে পনের দিন অন্তর অন্তর ও নূন্যতম তিনদিন ধরে যে রক্ত বের হয় তাকে বলে। একে মাসিক ও বলা হয়। সাদা ব্যাতীত অন্য যে কোন রঙের পানিই বের হোক না কেন তা হায়েজ হিসেবে বিবেচিত হবে। কোন মেয়ের যখন প্রথম হায়েজ হয় তখন সে বালিগা অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং দ্বীনের যাবতীয় আদেশ ও নিষেধসমূহ পালনের দ্বায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত হয়। মাসিক শুরু হওয়ার দিন থেকে বন্ধ হওয়ার দিন পর্যন্ত সময়কে 'আদত' বলা হয়। আদতের সময় কমপক্ষে তিন ও সর্বোচ্চ দশ দিন হয়। প্রত্যেক নারীর নিজের আদতের দিন সংখ্যা ও সময় জানা জরুরী। আট-নয় বছরের মেয়েদেরকে **মাসিক** শুরু হওয়ার পূর্বেই এ ব্যাপারে ধারনা দেয়া দরকার। ইহা মেয়ের মা, না থাকলে নানী, দাদী, বোন, খালা ও ফুপুদের উপর ফরজ।

নিফাস, বাচ্চা প্রসবের পর মায়েদের থেকে যে রক্ত বের হয় তাকে বলে। এর নূন্যতম সময় নির্দিষ্ট নয়। যখনি রক্ত আসা বন্ধ হবে তখনি গোসল করে পবিত্র হয়ে নিতে হয়। সর্বোচ্চ সময় চল্লিশ দিন। এরপরও যদি রক্ত পরা বন্ধ না হয় তবে গোসল করে নামজ পড়া শুরু করতে হবে। চল্লিশ দিন পর যে রক্ত বের হয় তা ইস্তিহাজা অর্থাৎ অসুস্থতার রক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইস্তিহাজা(অসুস্থতার কারনে যে রক্ত বের হয়) হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী রয়েছে। তিন দিনের চেয়ে কিছু সময় কম হলে, প্রথম মাসিকের ক্ষেত্রে দশ দিনের বেশি হলে, যাদের নিয়মিত মাসিক দশ দিনের কম তাদের ক্ষেত্রে দশ দিনের পরে যে রক্ত আসে তা ইস্তিহাজার রক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। এছাড়াও নয় বছরের ছোট মেয়েদের থেকে, গর্ভবতীদের থেকে ও পঞ্চান্ন বছরের অধিক বয়স্কা মহিলাদের থেকে যদি রক্ত বের হয় তাও ইস্তিহাজা হিসেবে গন্য হবে। উপরোক্ত অবস্থাগুলিতে যে রক্ত আসে তা অসুস্থতার আলামত। এমতাবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

মহিলাদের এই ইস্তিহাজার হুকুম নাক দিয়ে কিংবা ক্ষত দিয়ে অবিরাম রক্ত বের হওয়া ব্যাক্তির মত অর্থাৎ সে ঐ অবস্থায় নামাজ আদায় করতে পারে এবং রোযাও রাখতে পারে।

হায়েজ ও নিফাসের সময় মহিলারা নামাজ পড়তে পারেনা, রোযা রাখতে পারেনা। তিলাওয়াত-ই সেজদা অথবা শুকুর সেজদা আদায় করতে পারেনা। কুরআন শরিফ স্পর্শ করতে পারেনা। মসজিদে প্রবেশ করতে পারেনা। কা'বা শরিফ তাওয়াফ করতে পারেনা। যৌনমিলন করতে পারেনা। এই অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার পর ঐ সময়ের ফরজ রোযা থাকলে কাজা করতে হবে কিন্তু ঐ অবস্থার ফরজ নামাজগুলির কাজা আদায় করতে হয়না। স্ত্রীদের জন্য নিজের স্বামীকে হায়েজের শুরু ও শেষের সময় সম্পর্কে অবগত করা আবশ্যক। এব্যাপারে মহানবী (সঃ) বলেছেন, "**যে মহিলা নিজের হায়েজের শুরুর ও শেষের সময় নিজ স্বামী থেকে গোপন রাখে সে অভিশপ্ত**"। হায়েজ ও নিফাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে গোসল করে পবিত্র হয়ে নেয়া ফরজ। এটি মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ।

তালাকের ক্ষেত্রে অনেকগুলো মতবাদ রয়েছে। কেউ তালাক সম্পাদন করলো যেন সে ইমান হারালো। **তাম ইল্মিহাল** কিতাবের ৫৮৫ নম্বর পৃষ্ঠা দেখুন।

তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের অর্থ হল মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা। অজু কিংবা গোসলের জন্য যদি পানি না পাওয়া যায় কিংবা পানি থাকা স্বত্বেও ব্যবহারে অপারগ হলে পবিত্র মাটি, বালি, ইট, পাথর ইত্যাদির মত বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। হানাফী মাজহাব অনুযায়ী নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেও তায়াম্মুম করা জায়েজ কিন্তু অন্যান্য মাজহাব অনুযায়ী ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে তায়াম্মুম করা জায়েজ নয়।

তায়াম্মুম, অজু ও গোসল করার ক্ষেত্রের কঠিন অবস্থাকে সহজ করে দিয়েছে। শরীয়ত অনুযায়ী, মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা আর পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। মাটির দ্বারা বহু পঙ্কিলতা থেকে পবিত্রতা অর্জন সম্ভব। তবে তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আছে।

নিম্নলিখিত অবস্থাগুলোতে তায়াম্মুম করা জায়েজ:

১. অজু কিংবা গোসলের জন্য পানি পাওয়া না গেলে। তবে এক্ষেত্রে ঐ স্থানের সর্বত্র ভালো করে খুজে দেখতে হবে।

২. পানি থাকা স্বত্বেও ব্যবহারে অপারগ হলে। যেমন কোন অসুস্থ ব্যাক্তির ক্ষেত্রে পানি ব্যবহার করার কারনে মৃত্যুর আশংকা কিংবা অসুস্থতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে।

৩. পানি যেখানে আছে তা যদি শত্রুর কিংবা হিংস্র ও বিষাক্ত প্রাণীর দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে।

৪. জেলে থাকার কারনে পানি ব্যবহারে সুযোগ না পেলে।

৫. পানি ব্যবহার করার জন্য মৃত্যুর হুমকির সম্মূখীন হতে হলে।

৬. মুসাফির ব্যাক্তির নিকট যদি পান করার পানি ছাড়া অতিরিক্ত পানি না থাকে।

৭. কূপে পানি থাকা স্বত্বেও যদি তা উত্তোলন সম্ভব না হয়।

তায়াম্মুমের ফরজসমূহ:

তায়াম্মুমের তিনটি ফরজ রয়েছে। অজু কিংবা গোসল উভয়ের জন্যই তায়াম্মুমের বিধান একই শুধু নিয়্যাত ভিন্ন হয়। অজুর নিয়্যাতে করা তায়াম্মুমের দ্বারা গোসল আদায় হবে না। ঐ তায়াম্মুমের দ্বারাই ফরজ গোসল আদায়ের জন্য আলাদাভাবে নিয়্যাত করতে হবে।

তায়াম্মুমের ফরজসমূহ:

১. নিয়্যাত করা।

২. দুই হাতের তালুকে পবিত্র মাটিতে ঘষে সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ্ করা।

৩. দুই হাত পুনরায় মাটিতে ঘষে প্রথমে দান হাত ও পরে বাম হাত মাসেহ্ করা।

কিছু কিছু আলিমের মতে তায়াম্মুমের ফরজ দুইটি। তারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফরজ দুটিকে একত্রে গননা করে।

তায়াম্মুমের সুন্নতসমূহ:

১. বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু করা।

২. মাটিতে হাতের তালুর অংশ স্পর্শ করানো।

৩. হাতের তালুকে মাটিতে সামনে পিছনে ঘষা।

৪. যদি হাতে মাটি লেগে থাকে তবে তা দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আঘাত করে ঝেড়ে ফেলা।

৫. হাত মাটিতে রাখার সময় আঙ্গুলগুলোকে ফাঁকা করা।

৬. প্রথমে মুখমন্ডল তারপর ডান হাত এবং শেষে বাম হাত মাসেহ্ করা।

৭. অজু মত তায়াম্মুমের সময়ও দ্রুত করতে হয়। এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গ মাসেহ করার মাঝে বিলম্ব করা ঠিক না।

৮. মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ করার সময় সামান্য স্থানও যেন বাদ না যায় সেদিকে খেয়াল রাখা।

৯. পানির অভাবে তায়াম্মুম করার ক্ষেত্রে পানি খুজে পাওয়ার জন্য আগে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

১০. হাত মাটিতে স্পর্শ করিয়ে ভালভাবে ঘষা দরকার।

১১. হাত মাসেহ করার সময় আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে ও আংটি থাকলে তার নিচেও ঘষা দরকার।

১২. আঙ্গুল সমুহে মাসেহ করা, এটি করার সময় হাতের আংটি থাকলে তা খুলে রাখা।

তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়:

১. অজুহীন অবস্থায় কেউ যদি কাউকে শিখানোর উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করে দেখায় তবে তা দিয়ে নামাজ আদায় করতে পারবে না।

২. তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্র হয়ে নামাজ আদায়ের জন্য তায়াম্মুম করার সময় যে নামাজের জন্য করছে সে নামাজের কথাও নিয়াতের সময় উল্লেখ করতে হয়।

৩. একই মাটি অথবা পাথর দিয়ে একধিক ব্যাক্তি তায়াম্মুম করতে পারে।

৪. শাফেয়ী ও হাম্বলী মাজহাব অনুযায়ী শুধুমাত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়েজ। অন্যান্য মাজহাব অনুযায়ী মাটি জাতীয় যে কোন পবিত্র বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম আদায় করা সম্ভব। যে সব জিনিষ পুরে ছাই হয় কিংবা গরমে গলে যায় তা মাটি জাতীয় পদার্থ হিসেবে গন্য হয় না। অতএব গাছ, কাঠ, ঘাস, লোহা, চাল-ডাল, তেল রঙের দেয়াল, স্বর্ন, কাঁচ ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ নয়। ইট, পাথর, মর্মর, চীনামাটি, সিমেন্ট ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম করা যায়। কাঁদার ক্ষেত্রে তাতে যদি পানির পরিমান কম থাকে তবে তা দিয়ে তায়াম্মুম করা সম্ভব।

৫. এক তায়াম্মুম দিয়ে একাধিক নামাজ আদায় করা জায়েজ।

৬. মুসাফির ব্যাক্তি যদি দুই কিলোমিটারের চেয়ে কম দূরত্বের মাঝে পানি প্রাপ্তির আলামত পায় অথবা কোন সৎ মুসলমান ব্যাক্তি যদি তাকে এ ব্যাপারে খবর দেয় তবে নিজে গিয়ে অথবা কাউকে পাঠিয়ে পানির সন্ধান করা তার জন্য ফরজ। তবে তার মাঝে যদি পানি পাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ঠ সম্ভবনার উদ্রেক না হয় তবে অনুসন্ধান করা ফরজ হবে না।

৭. কেউ যদি পানির কথা না জিজ্ঞেষ করেই তায়াম্মুম করা নামাজে দাঁড়ানোর পরে কোন ব্যাক্তি যদি পানি প্রাপ্তির ব্যাপারে খবর দেয় তবে সে নামাজ ঐ অবস্থায় ত্যাগ করে পানি দিয়ে অজু করে পুনরায় নামাজ আদায় করবে।

৮. পানির অবস্থান যদি দুই কিলোমিটারের অধিক দূরত্বে হয় সেক্ষেত্রে তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে নামাজ আদায় করা যায়েজ।

৯. কেউ যদি জিনিষপত্রের মাঝে থাকা পানির কথা ভুলে গিয়ে পানি নাই মনে করে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে আর ঐ অবস্থায় লোকালয় থেকে দূরের কোন স্থানে থাকে তবে তার নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

১০. পানি শেষ হয়ে গেছে ভেবে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ার পর যদি কেউ পানির সন্ধান পায় তবে অজু করে পুনরায় নামাজ আদায় করতে হবে।

১১. মুসাফির ব্যাক্তির নিজের কাছে পানি না থাকা অবস্থায় অজুর জন্য সহযাত্রীদের থেকে পানি চাওয়া ওয়াজিব। তারা পানি না দিলে তায়াম্মুম করতে পারে। যদি সহযাত্রী বাজার মূল্যে পানি বিক্রি করতে রাজি হয় এবং মুসাফিরের কাছে পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ থাকলে তার পানি কিনে অজু করা জরুরী। তবে যদি তার কাছে পর্যাপ্ত পরিমান টাকা না থাকে অথবা সহযাত্রী অতিরিক্ত মূল্য দাবি করলে তার জন্য তায়াম্মুম করা যায়েজ।

১২. মরুভূমিতে কিংবা ভ্রমন পথে মুসাফিরের নিকটে পান করার জন্য পানি থাকা স্বত্বেও তায়াম্মুম করা যায়েজ।

১৩. পানি যদি কম থাকে তখন প্রথমে যার গোসল ফরজ হয়েছে সে করবে, পরে অন্যরা করবে, যেমন মাসিক বন্ধ হওয়া মহিলা ও মৃত ব্যক্তির গোসল পরে করাতে হবে।

একাধিক ব্যক্তির গোসল ফরজ হলে পানির মালিক প্রথমে গোসল করবে।

পানির মালিক একাধিক হলে সে ক্ষেত্রে সব পানি মিলিয়ে প্রথমে মৃত ব্যাক্তিকে গোসল করিয়ে পরে নিজেরা করবে।

১৪. গোসল ফরজ হয়েছে এমন কোন ব্যাক্তি তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের পর যদি তার অজু নষ্ট হয় তবে সে অল্প পানি থাকলে শুধু অজু করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারে। কারন এ অবস্থায় তার উপর পুনরায় গোসল ফরজ হয় না।

১৫. গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যাক্তির শরীরের চামড়ার অধিকাংশ স্থানে যদি ঘা, ক্ষত, ফোঁড়া ইত্যাদি থাকে তবে সে তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে। চামড়ার অধিকাংশ স্থান সুস্থ হলে এবং ক্ষতের স্থান না ভিজিয়ে গোসল করা সম্ভব হলে তাই করবে। ক্ষতের স্থান না ভিজিয়ে গোসল করা সম্ভব না হলে তায়াম্মুম করবে।

তায়াম্মুম কিভাবে করতে হয়?

১. প্রথমে তায়াম্মুমের দ্বারা নাপাক অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাত করতে হয়।

তায়াম্মুমের দ্বারা নামাজ আদায় করতে পারার জন্য শুধুমাত্র তায়াম্মুমের নিয়্যাত করা যথেষ্ঠ নয়। তায়াম্মুমের দ্বারা যে ইবাদত পালন করতে

চায় তারও নিয়্যাত করতে হয়। যেমন জানাজার নামাজ, তিলাওয়াতে সিজদা ইত্যাদির জন্য তায়াম্মুম করলে নিয়্যাতে তা উল্লেখ করতে হয়।

তায়াম্মুম ফরজ গোসলের বদলে নাকি অজুর বদলে করা হচ্ছে তা নিয়্যাতে উল্লেখ করতে হয়। ফরজ গোসলের পরিবর্তে যে তায়াম্মুম করা হয় তা দিয়ে নামাজ আদায় করা যায় না। এর জন্য আলাদাভাবে অজুর পরিবর্তের তায়াম্মুমও করতে হয়।

২. এরপর দুই হাতের তালু ও আঙ্গুল কে পবিত্র মাটি, পাথর, ইট অথবা সিমেন্টের দেয়াল ইত্যাদির গায়ে স্পর্শ করিয়ে ঘসে তা দিয়ে সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে সামান্যতম স্থানও যেন বাদ না যায়।কেননা তাহলে তায়াম্মুম হবে না।

মুখমন্ডল সম্পূর্নরূপে মাসেহ করার জন্য হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলো মিলিত রেখে দুই হাতের মধ্যমা আঙ্গুল দুটিকে পরস্পরের সাথে মিলাতে হবে।তারপর কপালের উপরের চুলের গোঁড়া থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে নিচের দিকে দাঁড়ির নিচ পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। আঙ্গুলগুলো কপাল, চোখ, নাক ও নাকের পাশ, ঠোট, দাঁড়ি ইত্যাদি স্থানকে আর হাতের তালু দিয়ে গাল ও অন্যান্য স্থানকে ভালভাবে মাসেহ করতে হয়।

৩. দুই হাতের তালুর দিক পুনরায় মাটিতে ঘসে এবং লেগে থাকা মাটি ও ধূলা ঝেড়ে ফেলে প্রথমে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ব্যাতীত অন্য চার আঙ্গুলকে মিলিত করে এর ভিতরের দিক দিয়ে ডান হাতের বাইরের দিক আঙ্গুলের মাথা থেকে শুরু করে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করতে হয়। পরে ভিতরের দিকে কনুই থেকে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত বাম তালু দিয়ে মাসেহ করতে হয়। আর বাম বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল মাসেহ করতে হবে। হাতে আংটি থাকলে তা তায়াম্মুমের জন্য খুলতে হবে। অতঃপর ঠিক একই নিয়মে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ করতে হয়। তায়াম্মুমের জন্য হাতের তালুকে মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুতে ঘসতে হয় পরে মাটি বা ধূলা ঝেড়ে ফেলতে হয়। কেননা মাটি বা ধূলা দিয়ে মাসেহ করা জরুরী নয়।

অজু এবং গোসল উভয়ের জন্যই একই নিয়মে তায়াম্মুম করতে হয়।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারন:

অজু ও গোসল ভঙ্গের যেসব কারন আছে সেসব কারনে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়। এ ছাড়াও যে পরিস্থিতির কারনে অজু ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায়েজ হয়েছে সে পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেলে কিংবা পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়।

অজু, গোসল ও তায়াম্মুমের উপকারিতা:

ইবাদতের নিয়্যাতে অজু ও গোসল করা হলেও আমাদের শারীরিক সুস্থতার জন্য এ ধরনের পরিচ্ছন্নতার প্রচুর উপকারিতা রয়েছে। এর মাঝে

শারীরিক উপকারের পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রেও ব্যাপক ফায়দা বিদ্যমান রয়েছে। প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য উপকারের মধ্য থেকে কয়েকটি নিম্নে বর্নিত হল:

১. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলতে ফিরতে কত ধরনের বস্তুর সাথে হাতের স্পর্শ লাগে। যা থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অজুর সময়ে হাত, মুখ ও পা ধোয়ার মাধ্যমে এ ধরনের রোগজীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে পারি। কেননা এমন অনেক জীবাণু আছে যারা চামড়া দিয়েও শরীরের মাঝে প্রবেশ করতে পারে।

২. শ্বাসতন্ত্রের দ্বাররক্ষকের দ্বায়িত্ব পালনকারী নাকের ছিদ্রকে অজুর সময় ধোঁয়ার মাধ্যমে আমাদের শরীরকে ধূলাবালি ও রোগজীবাণুর প্রবেশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি।

৩. মুখমণ্ডল ধৌত করলে ত্বক সজীব থাকে, মাথার ভার ও ক্লান্তি হ্রাস পায়। শিরা-ধমনী ও স্নায়ুতন্ত্র উজ্জীবিত হয়। আর একারণেই নিয়মিত অজু আদায়কারী ব্যাক্তি যখন বৃদ্ধ হয়ে যায় তখনও তার চেহারা থেকে ঔজ্জ্বল্য লোপ পায় না।

৪. গোসল ফরজ হওয়ার অন্যতম কারণ তথা যৌনমিলনের সময় বিপুল পরিমাণ শক্তি খরচ হয়। এ সময় হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমের কারণে ক্লান্তি, দুর্বলতা, অবসাদ অনুভূত হয়। এমতাবস্থায় সাধারণত মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমে আসে। গোসল করার মাধ্যমে শরীর তখন পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায়। নির্দিষ্ট সময় পরপর নিয়মিতভাবে গোসল করা শারীরিক সুস্থতার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয়।

৫. আমাদের দেহে ইলেকট্রনের একটি স্বাভাবিক ভারসাম্য রয়েছে। দেহের সুস্থতা এই ইলেকট্রনের ভারসাম্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই ভারসাম্য মানসিক টানাপোড়ন, পরিবেশ-পরিস্থিতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবন যাপনের ধরণ, কাজের পরিবেশ ইত্যাদিতে সমস্যা হলে নষ্ট হয়। একইসাথে যে সব অবস্থায় গোসল ফরজ হয় সেসব অবস্থায়ও ভারসাম্য নষ্ট হয়। এই ইলেকট্রন প্রবাহের চাপ রাগান্বিত অবস্থায় স্বাভাবিকের চেয়ে চারগুণ বৃদ্ধি পায়। আর যৌনমিলনের সময় তা বারগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ইনফ্রারেড রশ্মির মাধ্যমে মানুষের চামড়ার বিশেষ ছবি তোলা হয়েছে। এই ছবিগুলির দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, যৌন মিলনের পরে মানুষের শরীরের সম্পূর্ন ত্বকে অতিরিক্ত পরিমাণে ইলেকট্রন জড়ো হয়ে আবরণের সৃষ্টি করে। এই আবরণ ত্বকের দ্বারা অক্সিজেন আদান-প্রদাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। একইসাথে তা ত্বককে মলিন করে ও দ্রুত কুঁচকে যাওয়ার কারণ হয়। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, তিল পরিমাণ স্থানও যেন বাদ না পড়ে এমনভাবে সম্পূর্ন শরীর ধৌত করা আবশ্যক। এভাবে গোসল করলে, পানির কণাগুলি ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক প্রবাহকে প্রতিরোধ করে এবং দেহকে স্বাভাবিক

অবস্থায় ফিরিয়ে আনে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গোসল, চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ীও অবশ্য পালনীয় একটি পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬. দেহের সংবহন তন্ত্রের উপরও অজু ও গোসলের ইতিবাচক প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। শিরা-উপশিরা ও ধমনীকে অনমনীয় ও সংকুচিত হওয়া থেকে বিরত রাখে। অজুতে এক ধরণের স্থানীয় উদ্দীপন রয়েছে। লসিকাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ন কেন্দ্রের মধ্য থেকে নাকের ছিদ্র ও গলার টনসিলের দুই পাশকে অজুর সময় ধৌত করার মাধ্যমে একধরণের উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। এছাড়া ঘাড় ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানকে ধৌত করলেও লসিকাতন্ত্রে উদ্দীপনের সৃষ্টি হয়। অজু ও গোসলের মাধ্যমে লসিকাতন্ত্রের সংবহন সহজতর হয়, এর দ্বারা লসিকায় শ্বেতকনিকার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা শরীরকে ক্ষতিকারক রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৭. পানি ব্যবহারে অপারগ হওয়ার কারণে মাটি দিয়ে যে তায়াম্মুম করা হয় তার দ্বারাও শরীরে উৎপাদিত অতিরিক্ত ইলেকট্রন বহু অংশে হ্রাস পায়।

নাজাসাত থেকে পবিত্রতা:

শরীর, পোশাক ও নামাজের স্থান সকল ধরনের নাপাকী থেকে পবিত্র হতে হবে। মাথার কাপড়, ওড়না, টুপি, পাগড়ী, মুজা এবং মাস্ত্(শীতের দেশের মানুষদের পরিহিত চামড়ার মুজা) ইত্যাদি পোশাক হিসেবে গণ্য হওয়ায় এগুলিও পবিত্র হতে হবে। নামাজের সময় শরীরের সাথে নড়ে এমন কিছু পরিহিত থাকলে তাও পোশাক হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন: মাফলার। জায়নামাজের যে স্থানে সেজদা দেয়া হয় এবং যেখানে দাঁড়ানো হয় সেসব স্থান পবিত্র হলে এবং অন্য কোন অংশে নাজাসাত থাকলেও নামাজ কবুল হয়। কেননা জায়নামাজ পোশাকের মত নয়। নামাজ আদায়ের সময় পোশাকের পকেটে বোতলে বদ্ধ অবস্থায় কিংবা প্ল্যাস্টিক, কাগজ ইত্যাদি দ্বারা আবৃত কোন কিছুর মাঝে নাপাকী থাকলে নামাজ কবুল হয় না। নামাজের সময় যে স্থানে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা হয় এবং যেখানে সেজদা দেয়া হয় সেসব স্থান অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। অপবিত্র কোন বস্তুর উপরে চাঁদর, গ্লাস, কাঠ, প্ল্যাস্টিক ইত্যাদি জাতীয় কিছু বিছিয়ে নামাজ আদায় করা জায়েজ। সেজদার সময় পোশাকের ঝুলন্ত অংশে শুকনো নাপাকীর স্পর্শ লাগলেও নামাজের ক্ষতি হয় না।

শরীরে, পোশাকে ও নামাজের স্থানে এক দিরহাম পরিমানের সমান বা তার চেয়ে কম নাজাসাতে গালিজা থাকলে নামাজ কবুল হয়। তবে এক্ষেত্রে নাপাকীর পরিমান এক দিরহামের সমান হলে ঐ অবস্থায় নামাজ আদায় করা মাকরুহে তাহরিমী হয় এবং এ থেকে পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব হয়। নাপাকীর পরিমান এক দিরহামের চেয়ে বেশি হলে ঐ অবস্থায় নামাজ কবুল হয় না এবং এ থেকে পবিত্রতা অর্জন করা ফরজ। দিরহামের চেয়ে কম

পরিমানে নাপাকী থাকলে তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নত। মদের ক্ষেত্রে বিন্দু পরিমাণে লাগলেও ধুয়ে নেয়া ফরজ। ইমামাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র:) ও অপর তিন মাজহাবের মতে, বিন্দু পরিমাণে হলেও সবধরনের নাজাসাতে গালিজার ক্ষেত্রেই ধৌত করে পবিত্র হওয়া ফরজ। নামাজে দাঁড়ানোর সময় কি পরিমাণে নাজাসাত রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে হুকুম প্রয়োগ করা হয়, নাজাসাত লাগার সময়ের পরিমাণকে বিবেচনা করা হয় না।

নাজাসাতে গালিজার ক্ষেত্রে এক দিরহাম বলতে এক মিসকাল পরিমাণকে বুঝায়, যা চার গ্রাম চুরাশি সেন্টিগ্রামের সমান। আর তরল নাজাসাতের ক্ষেত্রে, খোলা হাতের তালুতে যে পরিমাণ পানি ধরে তা সমতল পৃষ্ঠে যে পরিমাণ স্থান দখল করে তার সমান হয়। এক মিসকালের চেয়ে কম পরিমাণ নাজাসাতে গালিজা যদি পোশাকে লাগে এবং হাতের তালুর চেয়েও বেশী পরিমাণ স্থানে ছড়িয়ে যায় তবুও তা নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য হয় না।

নাজাসাত দুই প্রকার।

১. **নাজাসাতে গালিজা**: মানুষের শরীর থেকে যা কিছু বের হলে অজু-গোসল ভঙ্গ হয় তার সবকিছু, প্যাঁচা ব্যাতীত যে সমস্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম তাদের গোশত, অপ্রক্রিয়াজাত চামড়া, মল-মূত্র, মানুষ সহ সকল প্রাণীর রক্ত, মদ, মৃত জন্তুর ও শূকরের গোশত, খাঁচায় পালিত প্রাণীর মল-মূত্র এবং ভার বহনকারী পশুর, ছাগল ও ভেড়ার মল-মূত্র নাজাসাতে গালিজার অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ এগুলি ভারী নাপাকি।

২. **নাজাসাতে খফীফা**: নাজাসাতে খফীফা থেকে শরীরের কোন অঙ্গে কিংবা পোশাকের কোন অংশে লাগলে,আর তা যদি ঐ অঙ্গের কিংবা পোশাকের এক-চতুর্থাংশের চেয়ে কম হয় তবে তা নামাজের কোন ক্ষতি হয় না। যে সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সে সব প্রাণীর প্রস্রাব এবং যে সমস্ত পাখির গোশত খাওয়া হারাম সে সব পাখির মল-মূত্র নাজাসাতে খফীফা হিসেবে গণ্য হয়। কবুতর, চড়ুই এবং এদের মত যে সমস্ত পাখির গোশত খাওয়া হালাল সে সব পাখির মল-মূত্র নাজাসাত হিসেবে গণ্য নয়। মদ থেকে পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে রাকী, অ্যালকোহল ইত্যাদি উৎপন্ন করা হয় তা নাজাসাতে গালিজা হিসেবে বিবেচিত হয়, মদের মতই ওগুলি পান করাও হারাম। নামাজ আদায় করার সময় শরীরের চামড়া ও পোশাক থেকে লেগে থাকা রক্ত, মদ ও অ্যালকোহল পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা দরকার। কেননা এগুলি শুকিয়ে গেলেও অপবিত্র হিসেবে গণ্য হয়। এগুলি যদি বোতল কিংবা

কোন পাত্রে আবদ্ধ অবস্থায়ও থাকে, তবুও নামাজ আদায়ের সময় তা পকেটে রাখা উচিত নয়।

সব ধরণের পরিষ্কার পানি ও অজু-গোসলে ব্যবহৃত হয়েছে এমন পানি দিয়ে এবং শিরকা ও গোলাপ জলের মত অঘনীভূত তরল দ্বারা পরিষ্কার করা যায়। অজু ও গোসলের জন্য যে পানি ব্যবহৃত হয়েছে তাকে 'মা'উ-মুস্তা'মাল' বলা হয়। এ ধরণের পানি পবিত্র কিন্তু এর দ্বারা অজু-গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে এর দ্বারা নাজাসাত পরিষ্কার করা সম্ভব। কেননা এ ধরণের পানি নিজে পবিত্র কিন্তু মানুষের অপবিত্র অবস্থাকে পবিত্র করতে পারে না।

ইস্তিনজা:

মানুষের সামনের ও পিছনের রাস্তা দিয়ে নাজাসাত বের হওয়ার পরে এই জায়গাগুলি পরিষ্কার করাকে ইস্তিনজা বলা হয়। ইস্তিনজা তথা পবিত্র হওয়া হল সুন্নত-ই মুয়াক্কাদা। অর্থাৎ, টয়লেটে মল-মূত্র ত্যাগ করার পরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই মাটির দলা, পাথরের টুকরা কিংবা পানি দিয়ে সামনের ও পিছনের উভয় রাস্তাকেই নাপাকী থেকে সম্পূর্নরূপে পরিষ্কার করা সুন্নত। কিন্তু যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, অন্যের সামনে গোপনাঙ্গ উম্মুক্ত না করে পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা অসম্ভব, সে ক্ষেত্রে পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা থেকে বিরত থাকবে। ঐ অবস্থাতেই নামাজ আদায় করবে। তবুও গোপনাঙ্গ উম্মুক্ত করবে না। যদি উম্মুক্ত করে তবে ফাসিক হিসেবে বিবেচিত হবে। একটি হারাম সম্পাদনকারী হবে। পরবর্তীতে সুযোগ বুঝে নিরিবিলি কোন স্থানে পানি দ্বারা ইস্তিনজা করে নামাজ পুনরায় আদায় করে নিবে। কেননা কোন আদেশ তথা ফরজ পালন করতে গিয়ে যদি হারাম সম্পাদনে বাধ্য হতে হয় সেক্ষেত্রে ঐ হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য ঐ ফরজকে (বিলম্বিত করতে হয় কিংবা) ত্যাগ করতে হয়।

হাড্ডি, খাদ্য, গোবর, ইট, ফুলদানী, কাঁচের টুকরো, কয়লা, পশুপাখির খাদ্য, অন্যের জিনিস, আর্থিক মূল্য আছে এমন জিনিসপত্র যেমন রেশমী কাপড়, মসজিদের থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে এমন কিছু, জমজমের পানি, পাতা, কাগজ ইত্যাদি দিয়ে ইস্তিনজা করা মাকরূহে তাহরিমী। খালি কাগজকেও সম্মান দেখানো দরকার। মূল্যহীন জিনিসপত্র, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অপ্রয়োজনীয় লেখালেখি আছে এমন কাগজপত্র ও পত্রিকা দ্বারা ইস্তিনজা করা জায়েজ। তবে ইসলামী হরফে লেখা হয়েছে এমন কোন কাগজ দ্বারা ইস্তিনজা করা যায় না। কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা পিঠ ফিরিয়ে টয়লেট করা মাকরূহ। এছাড়া দাঁড়িয়ে কিংবা কোন ধরণের উজর না থাকা সত্ত্বেও উলঙ্গ অবস্থায় টয়লেট করাও মাকরূহ। প্রস্রাব জমা হতে পারে এমন স্থানে গোসল করা জায়েজ নয়। তবে যদি প্রস্রাব প্রবাহিত হয়ে চলে যায় এবং জমে থাকার কোন সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে এমন স্থানে গোসল করা জায়েজ হবে।

ইস্তিনজার জন্য ব্যবহৃত পানি অপবিত্র হয়ে যায়। তাই ইস্তিনজা করার সময় পোশাকে যেন পানির ছিটা না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। এজন্য ইস্তিনজা করার সময় গুপ্তাঙ্গের পোশাক খুলতে হয়। তবে তা অবশ্যয়ই লোকচক্ষুর আড়ালে নির্জন কোন স্থানে করতে হবে। টেপ থেকে পানি নিয়ে পোশাকের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে প্রস্রাবের রাস্তাকে হাতের পানি দিয়ে ডলে ধৌত করলে ইস্তিনজা হয় না। কেননা প্রস্রাবের ফোঁটা যখন হাতের পানিতে লাগবে তখন তা অপবিত্র হয়ে যাবে এবং পোশাকে লাগলে তাও নাপাক হয়ে যাবে। এই নাপাক পানি যদি পোশাকে হাতের তালুর পরিমাণের চেয়ে বেশী স্থানে ছরিয়ে যায় তাহলে ঐ পোশাক পরিধান করে নামাজ আদায় করলে তা কবুল হবে না।

ইস্তিবরা:

পুরুষদের জন্য প্রস্রাবের পরে হেটে, কাশি দিয়ে অথবা বাম দিকে শুয়ে **ইস্তিবরা** করা, অর্থাৎ মূত্রনালিতে বিন্দু পরিমাণেও প্রস্রাব অবশিষ্ট না রাখা ওয়াজিব। প্রস্রাবের ফোঁটার না থাকার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে অজু করা উচিত নয়। কেননা অজু করার পরে এক ফোঁটাও যদি বের হয় তাহলেও অজু নষ্ট হয় এবং পোশাক ময়লা হয়। পোশাকে যদি হাতের তালুর চেয়ে কম পরিমাণে ছড়ায় তাহলে নতুন করে অজু করে ঐ পোশাকে নামাজ আদায় করলে মাকরূহ হয়। আর হাতের তালুর চেয়ে বেশী পরিমাণ যায়গায় ছড়ালে ঐ পোশাক দিয়ে নামাজ আদায় করলে তা কবুল হয় না। ইস্তিবরার ব্যাপারে যারা সমস্যায় ভোগে তারা ডালের সম আকৃতির তুলা মূত্রনালির মুখে লাগিয়ে রাখতে পারে। এক্ষেত্রে তুলা প্রস্রাবে ফোঁটাকে শুষে নিবে বিধায় পোশাকে ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকবে না। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন তুলার কোন অংশ যেন বাইরে না থাকে।

৩.সতর ঢাকা

(লজ্জাস্থান ও মহিলাদের পর্দা)

ব্যাক্তির জন্য তার নিজ দেহের যেসব স্থানকে উম্মুক্ত করা, অন্যকে প্রদর্শন করা কিংবা অন্য কারো জন্য ব্যাক্তির যেসব স্থান দর্শন করা হারাম তা লজ্জাস্থান বা ‘আওরাত’ হিসেবে বিবেচিত। পুরুষদের ক্ষেত্রে আওরাত হল নাভী থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। হাঁটু আওরাতের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থান উম্মুক্ত থাকা অবস্থায় যে নামাজ আদায় করা হয় তা কবুল হয় না। নামাজ আদায়ের সময় পুরুষদের জন্য দেহের অন্যান্য অংশ যেমন পিঠ, বক্ষ, মাথা, হাত ইত্যাদি ঢাকা সুন্নাত। দেহের এসব অংশ অনাবৃত রেখে নামাজ আদায় করা মাকরুহ্।

মহিলাদের হাতের তালু, পায়ের পাতা ও মুখমণ্ডল ব্যাতীত সমস্ত দেহ **আওরাত** হিসেবে পরিগণিত হয়। চার মাজহাব অনুযায়ীই হাতের উপরের অংশ, চুল ও পা আওরাতের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি একারণে মহিলাদের আওরাতও বলা হয়। আওরাতের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গসমূহকে আবৃত করা ফরজ। নামাজের সময় আওরাতের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গসমূহের যে কোন একটির একচতুর্থাংশ বা তার

বেশি অংশ, কোন রুকন আদায়ের পুরো সময় ধরে অনাবৃত থাকলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়। এর চেয়ে কম অংশ অনাবৃত হলে নামাজ ভঙ্গ হবে না তবে নামাজ মাকরুহ হবে। যে পোষাক বা কাপড় খুবই পাতলা কিংবা যার দ্বারা শরীরের অবয়ব বা রঙ প্রকাশিত হয় তা শরিয়তের দৃষ্টিতে পোষাক হিসেবে বিবেচিত হয় না।

মহিলাদের জন্য নামাজের বাইরে একাকী থাকা অবস্থায়, হাটু থেকে নাভী পর্যন্ত আবৃত করা ফরজ, একইসাথে বুক ও পিঠ ঢাকা ওয়াজিব এবং শরীরের অন্যান্য অংশ আবৃত করা মুস্তাহাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "**পরনারীর প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকানো ব্যাক্তির চক্ষুগুলিকে আগুনে পূর্ণ করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পরনারীকে কামনার সাথে স্পর্শকারী ব্যাক্তির হাতকে গর্দানের সাথে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর পরনারীর সাথে অপ্রয়োজনে কামনার সাথে কথা বললে, প্রত্যেক শব্দের জন্য হাজার বছর জাহান্নামে থাকতে হবে**"।

অপর এক হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে: "**প্রতিবেশী নারী ও বন্ধুর স্ত্রীদের প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকানো, পরনারীদের দিকে তাকানোর চেয়ে দশগুণ বেশী গুনাহের কাজ। বিবাহিত নারীদের দিকে তাকানো, অবিবাহিত মেয়েদের দিকে তাকানোর চেয়ে হাজার গুণ বেশী অপরাধের কাজ। আর যিনার গুনাহও এরূপ অধিক হয়**"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "**হে আলী**! **তোমার উরুদেশ কখনো উম্মুক্ত করো না। আর জীবিত কিংবা মৃত, কখনোই কারো উরুদেশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না**"।

অন্য আরেক হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে: "**তোমাদের গোপনাঙ্গ কখনো উম্মুক্ত করো না। কেননা, তোমাদের সাথে এমন কেউ আছে যারা কখনোই তোমাদের থেকে আলাদা হয় না। অতএব তাদের ব্যাপারেও লজ্জিত হও এবং তাদের মর্যাদা রক্ষা করে চল**"। (এরা হল হাফাজা ফেরেশতা)

হাদিস শরীফে আরো বলা হয়েছে যে, "**লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখ। নিজেদের স্ত্রী ও জারিয়া ব্যাতীত অন্য কারো সামনে তা উম্মুক্ত করো না। আর একাকী থাকা অবস্থায়ও মহান আল্লাহ্‌র থেকে লজ্জা পাও**"।

"**মহিলার বেশভূষা ধারণকারী পুরুষদের ও পুরুষের বেশভূষা ধারণকারী মহিলাদের উপর মহান আল্লাহ্‌র অভিশাপ বর্ষিত হোক**"।

"**কোন নারীর সৌন্দর্য দর্শনকারী পুরুষ তৎক্ষণাৎ তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলে, মহান আল্লাহ্ তায়ালা তাকে এমন একটি নতুন ইবাদতের সওয়াব প্রদান করেন যার স্বাদ ঐ ব্যাক্তি তৎক্ষণাৎ উপভোগ করে**"।

“**নিজের গোপনাঙ্গকে উম্মুক্তকারী ও অন্যের গোপনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকারী ব্যাক্তির উপর আল্লাহ্ তায়ালার অভিশাপ বর্ষিত হোক**”।

“**নিজেকে যে জাতির রূপে প্রকাশ করবে, ব্যাক্তি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে**”। এর অর্থ হল, ব্যাক্তি আচার-আচরণ, চরিত্র, কাজকর্ম কিংবা পোশাকের দিক থেকে যাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, তাদের থেকেই বিবেচিত হবে। ফ্যাশনের নামে অমুসলিমদের প্রথাকে অনুকরণকারী, হারাম কাজকর্মকে শিল্প হিসেবে বিবেচনাকারী, হারামে লিপ্তদের শিল্পী, নায়ক-নায়িকা, আধুনিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানকারীরা উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলি থেকে শিক্ষা নিক, এ ব্যাপারে তাদের শঙ্কিত হওয়া উচিত এবং সচেতন হওয়া উচিত।

পুরুষের জন্য অপর পুরুষের এবং নারীর জন্য অপর নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকানোও হারাম। দেখা যাচ্ছে যে, যেমনিভাবে পুরুষের জন্য মহিলাদের প্রতি আর মহিলাদের জন্য পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো হারাম, ঠিক একইভাবে পুরুষের জন্য অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি ও নারীর জন্য অপর নারীর লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেয়াও হারাম। পুরুষের পুরুষের জন্য ও নারীর জন্য আওরাতের স্থান হল, হাটু থেকে নাভী পর্যন্ত। নারীর অপর নারীর জন্য আওরাতের স্থানও পুরুষদের মত। তবে নারীর পরপুরুষের জন্য আওরাতের স্থান হল, হাতের তালু ও মুখমণ্ডল বাঁধে সমস্ত শরীর। পরনারীর প্রতি কামনাহীন দৃষ্টিতে তাকানোও হারাম।

কম্বল বা চাদরের নিচে উলঙ্গ অবস্থায় শায়িত কোন রোগী, মাথা চাদরের ভিতরে রেখে ইশারায় নামাজ আদায় করলে, উলঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে বিঁধায় নামাজ বাতিল হবে। মাথা চাদর থেকে বের করে নামাজ আদায় করলে, চাদর দ্বারা আবৃত হিসেবে আদায় হবে এবং জায়েজ হবে।

পুরুষের জন্য মাহরেম তথা চিরস্থায়ীভাবে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, এমন আঠার ধরণের নারীর মাথা, মুখমণ্ডল, ঘাড়, হাত ও হাঁটুর নিচের অংশের প্রতি কামনার উদ্রেক হবে না এব্যাপারে নিশ্চিত হলে তাকাতে পারে। তবে তাদের বক্ষ, পেট, বগল, রান, হাঁটু ও পিঠের দিকে তাকাতে পারবে না।

নারীর জন্য চাচাতো, খালাতো, মামাতো ও ফুফাতো ভাইরাও পরপুরুষ হিসেবে বিবেচিত। ফুফা, খালু, দুলাভাই ও দেবরও পরপুরুষ হিসেবে গণ্য হয়। অতএব এদের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা, ঠাট্টাতামাসা করা কিংবা নির্জনে অবস্থান করা হারাম। পুরুষদের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে চাচাতো, খালাতো, মামাতো ও ফুফাতো বোনদের সাথে এবং ভাবী ও শালীদের সাথে একান্তে অবস্থান করা কিংবা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা হারাম।

পুরুষের জন্য মাহরেম হিসেবে বিবেচিত আঠার ধরণের নারীর সাথে আজীবন বিবাহ করা অসম্ভব। এদেরসাথে কথাবার্তা বলতে পারে, একান্তে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। নারীও অনুরূপভাবে আঠার ধরণের পুরুষের সাথে

কখনোই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। এই আঠার ধরণের নারী ও পুরুষ নিম্নরূপ:

বংশগত কারণে মাহরেমগণ:

পুরুষ:

১. বাবা।

২. বাবা ও মায়ের বাবাগণ। অর্থাৎ, দাদা ও নানা।

৩. ছেলে এবং ছেলে ও মেয়ের ছেলে অর্থাৎ নাতি।

৪. ভাই।

৫. ভাইয়ের ছেলে অর্থাৎ ভাতিজা।

৬. বোনের ছেলে অর্থাৎ ভাগিনা।

৭. চাচা ও মামা।

নারী:

১. মা।

২. মা ও বাবার মায়েরা। অর্থাৎ দাদী ও নানী।

৩. মেয়ে এবং ছেলে ও মেয়ের মেয়ে অর্থাৎ নাতনি।

৪. বোন।

৫. বোনের মেয়ে অর্থাৎ ভাগিনী।

৬. ভাইয়ের মেয়ে অর্থাৎ ভাতিজী।

৭. খালা ও ফুফী।

দুধপানের কারণে মাহরেম:

পুরুষ:

৮. দুধপিতা।

৯. দুধপিতা ও দুধমাতার পিতা।

১০.দুধ পানকারী ছেলে এবং দুধ পানকারী ছেলে ও মেয়ের ছেলে।

১১.দুধভাই।

১২.দুধভাইয়ের ছেলে।

১৩.দুধবোনের ছেলে।

১৪.দুধচাচা ও দুধমামা।

নারী:

৮. দুধমাতা।

৯. দুধপিতা ও দুধমাতার মাতা।

১০.দুধপানকারী মেয়ে এবং দুধপানকারী ছেলে ও মেয়ের মেয়ে।

১১.দুধবোন।

১২.দুধবোনের মেয়ে।

১৩.দুধভাইয়ের মেয়ে।

১৪.দুধখালা ও দুধফুফু।

বৈবাহিক কারণে মাহরেম:

পুরুষ:

১৫.শ্বশুর।

১৬.সৎছেলে।

১৭.সৎবাবা।

১৮.মেয়ের জামাই।

নারী:

১৫.শ্বাশুরি।

১৬.সৎমেয়ে।

১৭.সৎমা।

১৮.পুত্রবধু।

লজ্জাস্থানকে উম্মুক্ত রেখে যারা বাইরে বের হয় এবং যারা অন্যের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টি দেয় এমন নারী ও পুরুষ উভয়ই জাহান্নামের অতি উত্তপ্ত জলন্ত আগুনে পুড়বে।

৪.ইস্‌তিকবাল-ই কিবলা:
(কিবলামুখী হওয়া)

কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করা ফরজ। মক্কা-ই মুকাররমা শহরে অবস্থিত কা'বা শরীফের দিককে **কিবলা** বলা হয়। এর আগে '**কুদুস্‌**' কিবলা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদিনায় হিজরতের সতের মাস পরে শাবান মাসের মাঝের মঙ্গলবারে, কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরানোর আদেশ দেয়া হয়েছে।

কিবলা, মূলত কা'বার দেয়াল নয় বরং ঐ স্থান। অর্থাৎ কা'বার জমিন থেকে আরশ পর্যন্ত সবটুকুই কিবলার অন্তর্ভুক্ত। একারণেই সাগর কিংবা কুয়ার তলদেশ থেকে, সুউচ্চ পর্বতমালা থেকে এবং বিমান থেকে কা'বার দিক বরাবর ফিরে নামাজ আদায় করা হয়। চোখের দৃষ্টিসীমার কৌণিক প্রান্তদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে কা'বা অবস্থিত হলে নামাজ সহীহ হয়।

তবে, ১- অসুস্থতার কারণে, ২- মালসম্পদ চুরি যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে, ৩- হিংস্র প্রাণীর আক্রমণের আশঙ্কা থাকলে, ৪- শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকলে, ৫- পশুর উপর থেকে নামলে অন্যের সাহায্য ছাড়া পুনরায় আরোহণে অপারগ হলে এবং দুই ওয়াক্তের নামাজকে জাম' (অর্থাৎ যোহর ও আছর ওয়াক্তকে অথবা মাগরিব ও এশার ওয়াক্তকে, মালিকী কিংবা শাফিঈ মাজহাবের তাকলিদ করে একত্রে আদায়) করা সম্ভব না হলে, উপরোক্ত অবস্থাগুলিতে যেদিকে ফিরে নামাজ আদায় করা সম্ভব হয় সেদিকে ফিরেই আদায় করবে। জাহাজে, ট্রেনে ও বিমানে কিবলার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করা শর্ত।

নামাজের ওয়াক্তসমূহ:

শ্রেষ্ঠনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিস শরীফে বলেছেন যে, "**হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম পবিত্র কা'বা শরীফের দরজার পাশে দুইদিন আমার ইমাম হয়ে নামাজ পড়িয়েছেন। আমরা দুজন প্রথম দিনে সুবহে সাদিকের সময় ফজরের নামাজ, সূর্যের ঠিক মাথা বরাবর থেকে সামান্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পরে যোহরের নামাজ, বস্তুর ছায়া নিজ উচ্চতার সমান হওয়ার পরে আছ্রের নামাজ, সূর্যাস্থের পরপরি মাগরিবের নামাজ এবং পশ্চিম আকাশে আভা মিলিয়ে যাওয়ার পরে এশার নামাজ আদায় করলাম। দ্বিতীয় দিনে চারিদিক পরিষ্কার হওয়ার পরে ফজরের নামাজ, বস্তুর ছায়া নিজ উচ্চতার দ্বিগুণ হওয়ার সময়ে যোহরের নামাজ, এর পরপরি আছ্রের নামাজ, ইফতারের সময় মাগরিবের নামাজ আর রাতের একতৃতীয়াংশ পার হওয়ার সময়ে এশার নামাজ আদায় করলাম। এরপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম বলল, এই মুহাম্মদ! এ গুলিই আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের নামাজের সময়সূচী। আপনার উম্মতও যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের প্রতিটিই এই দুদিনের সময়ের মাঝেই আদায় করে**"। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফরজ হওয়ার বিষয়টি এ হাদিস থেকেও প্রমাণিত হয়।

ফজর নামাজের ওয়াক্ত: সুব্হে সাদিক অর্থাৎ পূর্বাকাশ যখন আলোকিত হতে শুরু করে তখন ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যোদয়ের আগ মুহূর্তে শেষ হয়।

যোহরের নামাজের ওয়াক্ত: সূর্য যখন মধ্য আকাশ থেকে পশ্চিমে হেলতে শুরু করে অর্থাৎ যখন ছায়া দিবসের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম হয়ে পুনরায় প্রলম্বিত হতে থাকে তখন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। জোহরের ওয়াক্তের শেষ সময়ের ব্যাপারে দুইটি মত রয়েছে। ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মুহাম্মদের (র:) মতে ছায়া যখন বস্তুর দৈর্ঘের সমান হয় তখন যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয় আর ইমাম আবু হানিফার (র:) এর মতে ছায়া বস্তুর দৈর্ঘের দ্বিগুণ পরিমান পর্যন্ত অতিক্রম করলে ওয়াক্ত শেষ হয়।

আছ্রের নামাজের ওয়াক্ত: যোহরের নামাজের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে আছ্রের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়।

ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র:) এর মতে কোন বস্তুর ছায়া যখন নিজ দৈর্ঘের চেয়ে বেশী প্রলম্বিত হয় তখন আছ্রের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

ইমাম আজম আবু হানিফা (র:) এর মতে বস্তুর ছায়া যখন নিজ দৈর্ঘের দ্বিগুনের চেয়ে বেশী প্রলম্বিত হয় তখন আছ্রের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের সময় শেষ হয়।

তবে সূর্য যখন রক্তিম হয়ে যায় তখন নামাজ পড়া মাকরুহে তাহরিমী। এ কারনে আছরের নামাজকে ঐ মুহূর্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করাও মাকরুহে তাহরিমী। কিন্তু কোন কারনে যদি ঐ দিনের আছ্রের নামাজ আদায় না করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সূর্যের পুরোপুরি অস্তমিত হওয়া আগেই তা আদায় করা নেয়া আবশ্যক।

মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত: সূর্যের পুরোপুরি অস্তমিত হওয়ার পরে শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে আভা মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত স্থায়ী হয়। পশ্চিম আকাশের রক্তিম আভাকে শাফাক বলা হয়।

এশার নামাজের ওয়াক্ত: মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই এশার নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয় সুব্হে সাদিক পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ইমাম আবু হানিফার মতে পশ্চিম আকাশের আভা মিলিয়ে যাওয়ার পরে এশার ওয়াক্ত শুরু হয় কিন্তু ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে পশ্চিম আকাশের রক্তিম আভা মিলিয়ে গেলেই মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয় ও এশার ওয়াক্ত শুরু হয়।

এজন্য এ ক্ষেত্রে রক্তিম আভা মিলিয়ে যাওয়ার পরে আরো কিছুক্ষন অপেক্ষা করলে আকাশের শেষ আভাটুকুও বিলীন হয়ে যাওয়ায় প্রত্যেক ইমামের মতকেই অনুসরন করা সম্ভব। বিনা কারনে ইচ্ছাকৃতভাবে এশার নামাজকে মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করা মাকরুহ।

যে কোন নামাজই তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অথবা পরে আদায় করা হারাম। এটি একটি কবিরা গুনাহ। **তুর্কি সংবাদ পত্রের** প্রকাশিত নামাজ এবং ইমসাক সময় সীমা পরিপূর্ণ ভাবে বর্ণীত হয়েছে।

তিন সময়ে নামাজ পড়া মাকরুহে তাহরিমী। এই সময়গুলোতে ফরজ নামাজ পড়তে শুরু করলে তা সহীহ হয় না। এগুলো হল সূর্যোদয়ের সময়, সূর্যাস্তের সময় এবং দিনের বেলায় সূর্য যখন ঠিক মধ্য আকাশে থাকে সেই সময়। এই তিন ওয়াক্তে, আগে থেকেই প্রস্তুত হওয়া জানাজার নামাজ, তিলাওয়াত-ই সিজদা, সাহু সিজদা ইত্যাদি আদায় করাও জায়েজ নয়। সূর্যাস্তের সময় কেবলমাত্র ঐ দিনের আছ্রের নামাজ আদায় করা যার।

শুধুমাত্র নফল নামাজ আদায় করা মাকরুহ, এমন দুইটি ওয়াক্ত রয়েছে যার একটি হল, ফজরের ওয়াক্তে ফরজ নামাজ আদায়ের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। অপরটি হল, আছরের ফরজ নামাজ আদায়ের পর থেকে মাগরিবের ফরজের আগ পর্যন্ত। এসময়ে নফল নামাজ আদায় করা মাকরুহ।

মেরু অঞ্চলে নামাজ ও রোজা:

প্রত্যেক অঞ্চলের নামাজের ওয়াক্ত, বিষুবরেখা থেকে ঐ অঞ্চলের দূরত্ব ও ঋতুর পরিবর্তন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। উত্তর মেরুর নিকটবর্তী ঠাণ্ডা অঞ্চলসমূহে যখন সূর্যের ঝুঁক বেশী থাকে তখন সন্ধ্যা না নামতেই ভোর হয়ে যায়। একারণে বাল্টিক সাগরের উত্তরাংশে গ্রীষ্মকালে রাত না হওয়ায় এশার ও ফজরের নামাজের ওয়াক্ত হয় না।

হানাফী মাজহাব অনুযায়ী, ওয়াক্ত নামাজের শর্ত নয় বরং সবব্। একারণে ঐসব অঞ্চলে সবব্ সংঘটিত না হওয়ায়, নামাজও ফরজ হয় না। এমতাবস্থায়, ঐসব অঞ্চলে বসবাসকারী মুসলমানদের উপর গ্রীষ্মকালে এই দুই ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হবে না। দক্ষিণ মেরুতে মানুষের বসবাসযোগ্য অঞ্চল না থাকায় এরূপ সমস্যাও নাই।

শাবান মাসের শেষ রাত্রিতে, কোন শহরে রমজানের চাঁদ দেখা গেলে সমস্ত দুনিয়ায় রোজা রাখা জরুরী হয়। চাঁদ দেখার সময় যেসব স্থানে দিন থাকে তারা পরবর্তী দিন থেকে রোজা শুরু করবে। (মেরু কিংবা চাঁদে গমনকারী মুসলমান যদি মুসাফির না হয় তবে তার উপরও রমজান মাসের দিনগুলিতে রোজা রাখা ফরজ হয়। যেখানে দিন চব্বিশ ঘন্টার চেয়েও দীর্ঘ হয়, সেখানে ঘড়ির সময় দেখে রোজা শুরু করবে ও ইফতার করবে। চব্বিশ ঘন্টার চেয়ে কম সময়ে দিন হয় এমন নিকটবর্তী কোন শহরের সময়কে অনুসরণ করবে। যদি এমতাবস্থায় রোজা না রাখে তবে যখন সে দীর্ঘ দিনের স্থান থেকে বের হয় স্বাভাবিক অঞ্চলে আসবে তখন ক্বাজা আদায় করবে।)

আযান ও ইকামাত

আযান শব্দের শাব্দিক অর্থ হল অবগত করা, ঘোষনা দেয়া। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, ক্বাজা নামাজ ও জুমার নামাজে খতীবের সামনে পুরুষদের আযান দেয়া সুন্নাত-ই মুয়াক্কাদা। মহিলাদের ক্ষেত্রে আযান ও ইকামাত দেয়া মাকরুহ। আযান, অন্যদেরকে ওয়াক্ত সম্পর্কে অবহিত করার জন্য উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে দেয়া হয়। আযান দেয়ার সময়, দুই হাত তুলে একটি করে আঙ্গুল দুই কানের ছিদ্রে রাখা মুস্তাহাব। ইকামাত দেয়া আযান দেয়ার চেয়ে অধিক ফজিলতপূর্ণ। আযান ও ইকামাত উভয়ই কিবলার দিকে ফিরে দিতে হয়। আযান ও ইকামাত দেয়ার সময় অন্য কথা বলা যায় না, এমনকি সালামের জওয়াবও দেয়া যায় না।

আযান ও ইকামাত দেয়ার প্রেক্ষাপট:

১. জনবসতি কিংবা জনশূন্য যে কোন স্থানেই হোক না কেন, একাকী অথবা জামাতের সাথে ক্বাজা নামাজ আদায়ের সময়, পুরুষদের জন্য উঁচু স্বরে আযান ও ইকামাত দেয়া সুন্নাত। আযান শ্রবণকারী মানুষ, জিন, পাথর সবকিছুই কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে। কয়েক ওয়াক্তের ক্বাজা নামাজ একত্রে আদায়কারী, প্রথমে আযান ও ইকামাত দিবে। পরবর্তী ক্বাজা আদায়ের সময় প্রত্যেকটির জন্য শুধুমাত্র ইকামাত দিবে। আযান না দিলেও চলবে।

২. বাসায় একাকী কিংবা জামাতের সাথে ওয়াক্তের নামাজ আদায়কারী, আযান ও ইকামাত দিবে না। কেননা, ঐ এলাকার মসজিদে দেয়া আযান ও ইকামাত বাসার জন্যও দেয়া হয়েছে বলে গণ্য হয়। তবে আযান ও ইকামাত দিলে তা উত্তম হবে। মহল্লায় অবস্থিত মসজিদ কিংবা যেখানের মুসল্লীরা নির্দিষ্ট, সেখানে ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সাথে আদায়ের পরে, কেউ একাকী নামাজ আদায় করার সময় আর আযান ও ইকামাত দিবে না। তবে পথের পাশে অবস্থিত অথবা ইমাম-মুয়াজ্জিন ও মুসল্লী নির্দিষ্ট নয় এমন মসজিদে, বিভিন্ন সময়ে আগত মুসল্লীগণ একই ওয়াক্তের নামাজের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে থাকে। এ ধরণের মসজিদে প্রত্যেক জামাতের জন্যই আলাদা আলাদাভাবে আযান ও ইকামাত দেয়া যায়। এখানে একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যাক্তিও অল্প আওয়াজে নিজে শুনতে পায় এমন করে আযান ও ইকামাত দিতে পারে।

৩. মুসাফিররা নিজেদের মাঝে জামাতের সাথে কিংবা একাকী নামাজ আদায়ের সময় আযান ও ইকামাত দিবে। একাকী নামাজ আদায়কারীর সাথে সঙ্গীরা থাকলে আযান না দিলেও হবে। মুসাফির ব্যাক্তি একলা ঘরে নামাজ আদায়ের সময়ও আযান ও ইকামাত দিবে। কেননা ঐ এলাকার মসজিদে দেয়া আযান ও ইকামাত তার নামাজের জন্য বিবেচিত হবে না। মুসাফিরদের মধ্য থেকে কেউ ঘরে আযান দিলে, পরবর্তীতে নামাজ আদায়কারী মুসাফিররা আর আযান না দিলেও হয়।

আকলওয়ালা বালক, অন্ধ, জারজ সন্তান, আযান দিতে জানে এমন জাহিলের আযান দেয়া জায়েজ। তা মাকরুহ নয়। অপবিত্র অবস্থায়, অজুহীন অবস্থায় অথবা বসে আযান দেয়া মাকরুহে তাহরিমী। একইভাবে মহিলা, ফাসিক, মাতাল ও আকলহীন বালকের আযান দেয়াও মাকরুহে তাহরিমী। এরা আযান দিয়ে থাকলে তা পুনরায় আদায় করতে হবে। আজানের সহীহ হওয়ার জন্য মুয়াজ্জিনকে অবশ্যই মুসলমান ও আকলওয়ালা হতে হবে। রেকর্ডকৃত আযানও সহীহ হবে না।

ফাসিক ব্যাক্তির আযান সহীহ না হওয়ার পিছনের কারণ হল, ইবাদতের ক্ষেত্রে তার কথা বা বক্তব্য গ্রহণীয় না হওয়া। ফাসিকের আযানের দ্বারা

নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় না। এর আযানের কিংবা ইশারাতের দ্বারা রোজা ভাঙ্গা যায় না। আযানকে যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনকারী এবং এর হরফ ও কালিমাকে পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন না করে, গানের মত সূর না দিয়ে, মিনারায় উঠে সুন্নাত অনুযায়ী পাঠকারী ব্যাক্তি, সুউচ্চ মর্যাদা অর্জন করে।

আযানে মাইকের ব্যবহার:

মিনারায় স্থাপন করা মাইকগুলি মুয়াজ্জিনের জন্য একধরণের অলসতার মাধ্যম হয়েছে। আযানকে অনেক ক্ষেত্রে ছোট কোন কক্ষে, অন্ধকারে সুন্নাত অনুযায়ী না দেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা, আরশের দিকে ছড়িয়ে যাওয়া আধ্যাত্মিকতায় সজ্জিত মিনারাগুলি এই মন্দ বিদায়াতের কারণে একএকটি মাইক বহনকারী খুটিতে পরিণত হয়েছে। ইসলামের আলেমগণ বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে সবসময়ই সাদরে গ্রহণ করেছে। যেমন, ছাপাখানা স্থাপনের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন, যেন উপকারী কিতাবসমূহ ছাপার মাধ্যমে জ্ঞানের প্রসার দ্রুত হয়। রেডিও ও মাইকের দ্বারাও সর্বত্র উপকারী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা যায়, যা নিঃসন্দেহে ইসলামের জন্য উপকারী ও পছন্দনীয় একটি আবিষ্কার। কিন্তু মুসলমানদেরকে আযানের সুমিষ্ট আওয়াজ থেকে বঞ্চিত করে, মাইকের প্রকম্পিত আওয়াজের ব্যবহার ক্ষতির কারণ হয়েছে। ঈমানপূর্ণ ক্বালবে ইলাহী প্রভাব বিস্তারকারী সালিহ মুমিনদের কন্ঠের বদলে যান্ত্রিক আওয়াজ দখল করেছে। মাইকের আবিষ্কারের আগে, মিনারা থেকে দেয়া আযান ও মসজিদের তাক্বীর ধ্বনি বিধর্মীদেরকেও প্রভাবিত করত। প্রত্যেক মহল্লায় পঠিত আযান শুনে মসজিদকে পূর্ণকারী মুসল্লীগণ, আসহাবে কিরামদের জামানার মত নিজেদের নামাজকে খুশু'এর সাথে আদায় করত। আযানে নিহিত মুমিনদের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ইলাহী প্রভাব, মাইকের যান্ত্রিকতায় বিলুপ্ত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদিস শরীফে বলেছেন

যে, "**কেউ আযানের আওয়াজ শুনে মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে তা আস্তে আস্তে বললে, প্রত্যেক অক্ষরের জন্য হাজার সওয়াব দেয়া হয় এবং তার হাজারটা গুনাহ মাফ করা হয়**"।

আযান শ্রবণকারী ব্যাক্তি, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা অবস্থায় হলেও, মুয়াজ্জিনের সাথে আযানের বাক্যগুলি বলা সুন্নাত। যখন '**হাইয়া আলা**' বাক্যগুলি শুনবে তখন তার পুনরাবৃত্তি না করে '**লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ**' বলবে। আযান শেষ হলে দুরুদ পড়বে, তারপর আযানের দোয়া পড়বে। দ্বিতীয় '**আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ**' বলার সময়ে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলের নখে চুমু দিয়ে, দুই চোখের উপর বুলিয়ে দেয়া মুস্তাহাব। ইকামাতের সময় এরূপ করা যায় না।

আযানের বাক্যসমূহ:

আল্লাহু আকবার	৪বার।
আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	২বার।
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ	২বার।
হাইয়া আলাস্-সালাহ	২বার।
হাইয়া আলাল্-ফালাহ	২বার।
আল্লাহু আকবার	২বার।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	১বার।

শুধুমাত্র ফজরের আযানের সময় 'হাইয়া আলাল-ফালাহ'এর পরে দুইবার '**আস্-সালাতু খাইরুন মিনান্-নাউম**' বলতে হয়।

আর ইকামাতের সময়, '**হাইয়া আলাল-ফালাহ**'এর পরে দুইবার '**ক্বাদ ক্বামাতিস্-সালাত**' বলতে হয়।

আযানের দোয়া:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে: "আযান দেয়ার সময় এই দোয়াটি পড়: আনা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা শারিকা লাহু, ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ও রাসূলুহু, ওয়া রাদিতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বিল ইসলামি দ্বীনান ওয়া বি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা রাসূলান নাবিয়্যা"

অপর একটি হাদিস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে, "**এই আমার উম্মত! আযান শেষ হলে এই দোয়াটি করিও: আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহিদ্ দাওয়াতিত্ তাম্মাতি, ওস্ সালাতিল ক্বায়িমাতি, আতি মুহামাদানিল অসিলাতা ওয়াল ফাদিলাতা, ওয়াদ্ দারাজাতার্ রাফিয়াতা, ওয়াবয়াসহু মাকামাম্ মাহমুদানিল্ লাজি ওয়াদ্তাহু, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মিয়াদ**"।

আযানের অর্থ:

আল্লাহু আকবার: আল্লাহ্ তায়ালা মহান। তার জন্য কিছুই আবশ্যক নয়। বান্দার ইবাদতের প্রতিও তিনি মুখাপেক্ষী নন। তার জন্য বান্দার ইবাদতের কোন উপকারিতা নাই। এই গভীর অর্থকে মস্তিষ্কে উত্তমরূপে স্থাপন করার জন্য এই বাক্যটি চার বার বলা হয়।

আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ: তার বড়ত্ব ও মহত্বের কারণে তিনি যেমন কারো ইবাদতের মুখপেক্ষী নন একইভাবে তিনি ব্যাতীত আর কারো ইবাদত পাওয়ার অধিকারও নাই, এই সাক্ষ্য দিচ্ছি ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করছি। কোন কিছুই তার তুলনা নয়।

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রাসূলুল্লাহ: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার প্রেরিত পয়গম্বর ও তার পছন্দনীয় ইবাদতের পদ্ধতি মানবজাতিকে শিক্ষাদানকারী হিসেবে মেনে নিলাম। আর মহান আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলের মাধ্যমে যেই ইবাদতের শিক্ষা দিয়েছেন তার জন্য শুধুমাত্র ওই ইবাদতগুলিই উপযুক্ত তাও বিশ্বাস করি।

হাইয়া আলাস্ সালাত, হাইয়া আলাল্ ফালাহ: এর দ্বারা মুমিনদের জন্য মুক্তি, সৌভাগ্য ও সফলতা অর্জনের মাধ্যম এই নামাজের প্রতি আহ্বান করা হয়।

আল্লাহু আকবার: তার উপযুক্ত কোন ইবাদত কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়। তার জন্য যতই ইবাদত করা হোক না কেন, এগুলোর চেয়ে তিনি অনেক উর্দ্ধে, অনেক মহান।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ: ইবাদত পাওয়ার, সম্মানে মাথা ঝুকাবার অধিকারী একমাত্র তিনি, তার উপযোগী কোন ইবাদত কারো পক্ষে করা যেমনিভাবে সম্ভব নয় একইভাবে তিনি ব্যাতীত কারো ইবাদত পাওয়ারও নূন্যতম অধিকার নাই।

নামাজের মর্যাদা ও মহানত্ব, এর ব্যাপারে সবার প্রতি খবর দেয়ার জন্য বাছাইকৃত এই বাক্যগুলির অর্থের গভীরতা ও বড়ত্ব থেকেও প্রতীয়মান হয়।

৬. নিয়্যাত:

ইফতিতাহ তাকবীর বলার সময়ে নিয়্যাত করতে হয়। নামাজের জন্য নিয়্যাত বলতে নামাজের নাম, ওয়াক্ত, কিবলা ও ইমামের অনুসরণের বিষয়গুলি মনেমনে স্থির করা বুঝায়।

ইফতিতাহ তাকবীরের পরে নিয়্যাত করলে তা শুদ্ধ হবে না, তাই নামাজও কবুল হয় না। ফরজ ও ওয়াজিব নামাজের নিয়্যাতের সময় কোন ফরজ বা ওয়াজিব তা জানা আবশ্যক। তবে রাকাতের সংখ্যা নিয়্যাত না করলেও চলবে। সুন্নাতের ক্ষেত্রে শুধু নামাজের জন্য নিয়্যাত করাও যথেষ্ঠ। জানাজার নামাজের জন্য, **আল্লাহ্র জন্য নামাজ ও মাইয়িতের জন্য দোয়ার নিয়্যাত করলাম, বলা যথেষ্ঠ**।

ইমামের জন্য পুরুষ জামাতের ঈমাম হিসেবে নিয়্যাত না করলেও চলবে। তবে, উপস্থিত জামাতের ইমাম হিসেবে নামাজ আদায় করছি বলে নিয়্যাত না করলে, জামাতে নামাজ আদায়ের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। ইমামের নিয়্যাত করলে, জামাতের সওয়াব অর্জন করবে। তবে জামাতে মহিলাদের উপস্থিতি থাকলে, **মহিলাদের ইমাম হিসেবে নিয়্যাত করা আবশ্যক।**

ইবাদত করার সময়, শুধুমাত্র মুখ দিয়ে উল্লেখ করাকে নিয়্যাত বলে না। ক্বালবের দ্বারা নিয়্যাত না করলে, ইবাদত কবুল হয় না।

৭. তাকবীরে তাহরীমা:

নামাজে দাঁড়ানোর সময় '**আল্লাহু আকবার**' বলে শুরু করা ফরজ। এর বদলে অন্য শব্দ বললে হবে না। কিছু আলিম, তাকবীরে তাহরীমাকে নামাজের অন্তর্গত ফরজ হিসেবে গণ্য করেছেন। তাদের মতে, নামাজের শর্ত ও রুকন উভয়ই ছয়টি।

নামাজের রুকনসমূহ:

নামাজের ভিতরের ফরজগুলিকে রুকন বলা হয়। এগুলো পাঁচটি:

১.কিয়াম:

নামাজের পাঁচটি রুকনের মধ্য থেকে প্রথমটি হল কিয়াম। কিয়ামের অর্থ হল, দাঁড়িয়ে থাকা। পায়ে দাঁড়াতে অক্ষম অসুস্থ ব্যাক্তি বসে নামাজ আদায় করবে। যদি অসুস্থতা এমন হয় যে, বসতেও অক্ষম, তবে চিত হয়ে শুয়ে মাথার দ্বারা নামাজ আদায় করবে। মুখমণ্ডল আকাশের দিকে নয়, কিবলার দিকে ফিরাবে। এর জন্য মাথার নিচে বালিশ ব্যবহার করতে পারে। পাগুলিকে খাঁড়া করে রাখবে, কিবলার দিকে ছড়িয়ে রাখবে না। যখন দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে তখন দুই পা পরস্পর থেকে চার আঙ্গুল পরিমান খালি রাখবে।

দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি কিংবা দাঁড়ালে মাথা ঘুরা, দাঁত- চোখ কিংবা অন্য কিছুর ব্যাথা বৃদ্ধি পায়, সামনের বা পিছনের রাস্তা দিয়ে মূত্র কিংবা বাতাস বের হয়, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়, শত্রুর আক্রমণের শঙ্কা বৃদ্ধি পায়, মাল চুরি হওয়ার সম্ভাবনা হয়, বমি হয় বা রোজা ভঙ্গ হয় অথবা লজ্জাস্থান অবমুক্ত হয় এমন ব্যক্তিগণ বসে নামাজ আদায় করবে। রুকুর জন্য সামান্য ঝুঁকবে, আর সিজদার জন্য মাথা জমিনে রাখবে। যদি মাথা জমিনে রাখতেও অক্ষম হয় তবে, রুকুর জন্য সামান্য আর সিজদার জন্য এর চেয়ে বেশী ঝুঁকাবে। যদি রুকুতে যতখানি মাথা ঝুঁকাবে তার চেয়ে সিজদাতে বেশী মাথা না ঝুঁকায় তবে নামাজ সহীহ হবে না। জমিনে পাথর অথবা কাঠ রেখে তার উপরে সিজদা করলে, নামাজ সহীহ হলেও গুনাহগার হবে। কেননা তা মাকরুহে তাহরিমী হয়।

২. কিরাত:

সুন্নাত ও বিতরের নামাজের প্রত্যেক রাকাতে এবং একাকী আদায় করার সময় ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে, দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআন থেকে অন্ততপক্ষে একটি আয়াত তিলাওয়াত করা ফরজ। সংক্ষিপ্ত সূরা পড়লে আরো উত্তম হবে।

কিরাত হিসেবে এসব স্থানে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা এবং সুন্নাত ও বিতর নামাজের প্রত্যেক রাকাতে এবং ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে অন্য কোন সূরা, কিংবা তিন আয়াত তিলাওয়াত করা ওয়াজিব।

সূরা ফাতিহা অন্য সূরার আগে তিলাওয়াত করাও ওয়াজিব। এই ওয়াজিবগুলি থেকে কোনটি ভুলে পালন না করলে এর জন্য সাহু সিজদা দিতে হবে।

কিরাত হিসেবে, কুরআন-ই কারীমের তরজমা পড়লে তা জায়েজ হবে না।

ইমামের জন্য, জুমা ও ঈদের নামাজ ব্যাতীত প্রত্যেক নামাজের প্রথম রাকাতে, দ্বিতীয় রাকাতে যতটুকু পড়বে তার দ্বিগুণ পরিমাণ তিলাওয়াত করা সুন্নাত। একাকী নামাজ আদায়ের সময় প্রত্যেক রাকাতে সমপরিমাণ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে। ইমামের জন্য একই ওয়াক্তের নামাজের একই রাকাতে একই আয়াত পড়ার অভ্যাস করা মাকরুহ। প্রথম রাকাতে তিলাওয়াতকৃত আয়াত বা সূরা দ্বিতীয় রাকাতেও পুনরায় তিলাওয়াত করা মাকরুহে তানজিহী। কুরআনের ধারাবাহিকতার বিপরীত তিলাওয়াত করা অধিকতর অপছন্দনীয়। প্রথম রাকাতে যেই সূরা পরা হয়, দ্বিতীয় রাকাতে তার পরবর্তী সূরা না পড়ে তার পরেরটি তিলাওয়াত করাও মাকরুহ। পবিত্র কুরআনের মুসহাফ হিসেবে যেভাবে আছে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তিলাওয়াত করা সবসময়ের জন্যই ওয়াজিব।

৩. রুকু:

দাঁড়ানো অবস্থায় কিরাতের পরে তাকবীর বলে রুকুর জন্য ঝুকতে হয়। রুকুতে, পুরুষগণ আঙ্গুলগুলিকে ফাঁকা ফাঁকা করে হাঁটুর উপরে রাখবে, পিঠ ও মাথাকে এক সমতলে রাখবে।

রুকুতে কমপক্ষে তিনবার '**সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম**' বলবে। তবে তিনবার না পরার আগেই যদি ইমাম মাথা তুলে ফেলে তবে মুসল্লীও মাথা তুলে ফেলবে। রুকুতে হাত ও পা সোজা করে রাখতে হয়। মহিলাগণ হাতের আঙ্গুলগুলি ফাঁকা করে রাখবে না। পিঠ, হা ও পা ও সোজা করে রাখবে না।

রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় '**সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ**' বলা ইমাম কিংবা একাকী আদায়কারীর জন্য সুন্নাত। জামাতে নামাজের সময় মুসল্লীগণ তা বলবে না। বরং এর পরপরই '**রব্বানা লাকাল্ হামদ**' বলবে। সোজা হয়ে দাঁড়াবে পরে **আল্লাহু আকবার** বলে সিজদায় যাওয়ার সময়ে প্রথমে ডান ও পরে বাম হাঁটু, তারপর ডান ও পরে বাম হাত, এরপর নাক ও কপাল জইনে রাখবে।

৪. সিজদা:

সিজদার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি একত্রিত করে কিবলা অভিমুখে কান বরাবর জমিনে রাখবে, মাথা দুইহাতের মাঝে অবস্থান করবে। কপাল পবিত্র স্থানে তথা মাটি, পাথর, কাঠ, চাঁদর ইত্যাদির উপর রাখা ফরজ, একইসাথে নাকও জমিনে রাখা ওয়াজিব। উজর না থাকলে, শুধুমাত্র নাক দিয়ে সিজদা করা জায়েজ নয়। শুধুমাত্র কপাল দিয়ে সিজদা করা মাকরুহ।

দুই পা অথবা কমপক্ষে প্রত্যেক পায়ের একটি করে আঙ্গুল জমিনে রাখা ফরজ, কারো মতে ওয়াজিব। অর্থাৎ দুই পা মাটিতে না রাখলে নামাজ কবুল হবে না অথবা মাকরুহ হবে।

সিজদার সময় পায়ের আঙ্গুলগুলিকে বাঁকা করে কিবলার দিকে ফিরানো সুন্নাত।

সিজদার সময় পুরুষরা, হাত ও রানকে পেট থেকে আলাদা করে রাখবে। হাত

ও হাঁটু মাটিতে রাখা সুন্নাত। পায়ের গোড়ালিদ্বয় দাঁড়ানোর সময় চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা, রুকু ও সিজদার সময় মিলিত রাখা সুন্নাত।

সিজদায় যাওয়ার সময় প্যান্টের নীচের অংশকে উপরে টানা মাকরুহ, এগুলিকে বটে নামাজে দাঁড়ানোও মাকরুহ। জামার হাতা ও প্যান্টের অথবা পায়জামার নিম্নাংশকে বটে, ছোট করে নামাজ আদায় করাও মাকরুহ। অলসতা করে কিংবা গুরুত্বের কথা না ভেবে মাথা অনাবৃত রেখে নামাজ আদায় করা মাকরুহ। নামাজকে গুরত্ব না দেয়া কুফুরীর শামিল। ময়লা পোশাক কিংবা কাজের পোশাক পরে নামাজ আদায় করাও মাকরুহ।

৫. শেষ বৈঠক:

শেষ রাকাতে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়তে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় পর্যন্ত বসা ফরজ। বসার সময়ে হাতের আঙ্গুলের দ্বারা ইশারা করবে না। পুরুষরা বাম পাকে, আঙ্গুলগুলি যেন ডান দিকে ফিরে থাকে এমনকরে জমিনে রাখবে, এর উপরে বসবে। ডান পাকে খাঁড়া করে রাখবে, এর আঙ্গুলগুলি জমিনে লেগে থাকবে। আঙ্গুলের মাথাগুলি কিবলার দিকে যতটা সম্ভব ফিরিয়ে রাখবে। এভাবে বসা সুন্নাত।

মহিলারা সরাসরি জমিনে বসবে, রানদ্বয় মিলিয়ে রাখবে। ডান পা ডান দিক থেকে বাইরের দিকে রাখবে, বাম পাকে আঙ্গুলগুলি ডান দিকে ফিরিয়ে তার নিচে রাখবে।

নামাজ আদায়ের পদ্ধতি:

একাকী আদায়কারী পুরুষের নামাজ:

উদাহরণস্বরূপ ফজরের নামাজের সুন্নাত নিম্নরূপে আদায় করবে:

১. প্রথমে কিবলার দিকে ফিরে দাঁড়াবে। দুই পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ খালি জায়গা রেখে সমান্তরালে রাখবে। দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলকে কানের লতি পর্যন্ত তুলে স্পর্শ করিয়ে হাতের তালু কিবলামুখী করে খোলা রেখে নিয়্যাত করবে। '**আল্লাহ্‌র সন্‌তুষ্টি অর্জনের জন্য কিবলামুখী হয়ে আজকের ফজরের সুন্নাত নামাজ আদায়ের জন্য নিয়্যাত করলাম**' বলে মনে মনেও

তা স্থির করার পর '**আল্লাহু আকবার**' বলে নাভির উপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপরে রেখে বাঁধবে।

২. দৃষ্টি সর্বদা সিজদার স্থানের দিকে থাকবে। এ অবস্থায় প্রথমে '**সুবহানাকা**' পড়বে, এরপর 'আউজুবিল্লাহ' 'বিসমিল্লাহ' পড়ে **সূরা ফাতিহা** পড়বে। ফাতিহার পরে 'বিসমিল্লাহ্' না পরেই আরেকটি সূরা পাঠ করবে। উদাহরণস্বরূপ: 'আলাম তারা কাইফা' পাঠ করল।

(শাফিঈ মাজহাব অনুযায়ী সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরার মাঝে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ করতে হয়)

৩. সূরা পাঠ করার পরে '**আল্লাহু আকবার**' বলে রুকুর জন্য ঝুঁকবে। দুই হাত দুই হাটুর উপরে ছড়িয়ে রাখবে ও হাটু ধরে রাখবে। কোমর, পিঠ ও মাথা সমান্তরালে রাখবে। দৃষ্টি পা বরাবর থাকবে। এ অবস্থায় তিনবার '**সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম**' বলবে, চাইলে পাঁচ অথবা সাতবারও পড়তে পারে।

৪. এরপর '**সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্**' বলে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় পায়জামা বা প্যান্টের নিচের অংশ নিয়ে টানাটানি করবে না এবং দৃষ্টি সিজদার স্থানে স্থির থাকবে। সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর '**রব্বানা লাকাল হামদ**' বলবে। (এইসময়ের সোজা হয়ে দাঁড়ানোকে 'কাওমা' বলা হয়।)

৫. বেশীক্ষণ এভাবে না থেকে '**আল্লাহু আকবার**' বলে সিজদায় যাবে। সিজদায় যাওয়ার সময় ধারাবাহিকভাবে নিম্নে বর্নিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে: ক) ডান হাঁটু, পরে বাম হাঁটু, ডান হাত পরে বাম হাত, নাক ও কপাল জমিনে রাখবে। খ) পায়ের আঙ্গুলগুলিকে কিবলার দিকে বাঁকাবে। গ) মাথাকে দুই হাতের মাঝ বরাবর স্থাপন করবে। ঘ) হাতের আঙ্গুলগুলিকে মিশিয়ে রাখবে। ঙ) হাতের তালু জমিনের সাথে মিশিয়ে রাখবে। চ) এই অবস্থায় থেকে কমপক্ষে তিনবার '**সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা**' বলবে।

৬. এরপর '**আল্লাহু আকবার**' বলে বাম পাকে জমিনে বিছিয়ে, ডান পায়ের আঙ্গুলগুলিকে কিবলার দিকে ফিরিয়ে রানের উপরে বসবে। হাতের তালু হাটুর উপরের অংশে স্বাভাবিকভাবে রাখবে।

৭. এভাবে বেশিক্ষণ বসে না থেকে '**আল্লাহু আকবার**' বলে পুনরায় সিজদায় যাবে। (দুই সিজদার মাঝের এই বসাকে 'জালসা' বলা হয়।

৮. সিজদায় পুনরায় কমপক্ষে তিনবার '**সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা**' বলার পরে '**আল্লাহু আকবার**' বলে দাঁড়াবে। দাঁড়ানোর সময় হাত দিয়ে জমিনে ভর দিবে না এবং পা নাড়াচাড়া করবে না। সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল, পরে নাক, এরপর বামহাত ও ডানহাত, তারপর বাম হাঁটু ও ডান হাঁটু জমিন থেকে উঠাবে।

৯. দাঁড়ানো অবস্থায় 'বিসমিল্লাহ্' পড়ে সূরা **ফাতিহা** ও অন্য একটি সূরা মিলিয়ে পড়ার পরে **'আল্লাহু আকবার'** বলে আবার রুকুতে যাবে।

১০.দ্বিতীয় রাকাতও প্রথম রাকাতের বর্ননা অনুযায়ী সম্পূর্ণ করবে। তবে, দ্বিতীয় সিজদার পর '**আল্লাহু আকবার**' বলে দাঁড়িয়ে না গিয়ে রানের

উপরে বসবে এবং '**আত্তাহিয়্যাতু', 'আল্লাহুম্মা সাল্লি', 'আল্লাহুম্মা বারিক' ও 'রব্বানা আতিনা'** দোয়াসমূহ পাঠ করার পরে প্রথমে ডান দিকে **'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'** পরে বাম দিকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে।

সালাম ফিরানোর পরে, '**আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালাম ওয়া মিনকাস্ সালাম, তাবারকতা ইয়া জাল-জালালি ওয়াল ইকরাম**' দোয়াটি পড়বে এবং কোন কথা না বলে ফজরের নামাজের ফরজ আদায়ের জন্য দাঁড়াবে। সুন্নাত ও ফরজ নামাজের মাঝে কথা বললে বহু সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। নামাজের পরে, সম্পূর্ণ ইসতিগফার দোয়াটি তিন বার পাঠ করবে। এরপর 'আয়াতুল কুরসী' ও তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশবার 'আলহামদু লিল্লাহ', তেত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' এবং একবার 'তাহলিল' অর্থাৎ '**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদির'** পড়বে। (এই দোয়াগুলি নিচুস্বরে পরবে।)

এরপর দোয়া করবে। দোয়ার সময় পুরুষগণ তাদের হাতকে বুক বরাবর তুলবে ও কনুইর থেকে ভাঙবে না। হাতের তালু খোলা রাখবে ও আসমানের দিকে ফিরিয়ে রাখবে। কেননা, নামাজের জন্য যেমন কা'বা শরীফ কিবলা, ঠিক একইভাবে দোয়ার জন্য কিবলা হল আসমান। দোয়ার পরে প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদাভাবে 'বিসমিল্লাহ্' সহ এগারবার সূরা ইখলাস্, দুই 'ক্বুল আউজু' সূরা, এবং সাতষট্টিবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। এরপর '**সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি**' আয়াতটি পাঠ করে হাতগুলি মুখমণ্ডলে মুছবে।

চার রাকাত বিশিষ্ট সুন্নাত ও ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাকাতের পরে 'আত্তাহিয়্যাতু' পরে দাঁড়িয়ে যাবে। সুন্নাত নামাজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে অন্য একটি সূরা মিলাতে হয়। কিন্তু ফরজ নামাজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তে হয়, অন্য কোন সূরা মিলাতে হয় না। মাগরিবের ফরজের ক্ষেত্রেও একইভাবে তৃতীয় রাকাতে সূরা মিলাতে হয় না। বিতর নামাজের তিন রাকাতের প্রতিটিতেই সূরা ফাতিহার পরে সূরা মিলাতে হয়। তৃতীয় রাকাতে সূরা মিলানোর পরে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাতগুলি কানের লতি পর্যন্ত তুলে আবার নাভির উপরে বেঁধে **দোয়া-ই কুনুত** পাঠ করতে হয়। আছর ও এশার ফরজ নামাজের পূর্বে যে 'সুন্নাত-ই গায়রি মুয়াক্কাদা' রয়েছে তা অন্যান্য চার রাকাত বিশিষ্ট সুন্নাতের মতই আদায় করতে হয়। তবে দ্বিতীয় রাকাতের পরে বসা অবস্থায় 'আত্তাহিয়্যাতু' এর পরে 'আল্লাহুম্মা সাল্লি' ও 'আল্লাহুম্মা বারিক' দুরুদ শরীফ পড়তে হয়।

একাকী আদায়কারী মহিলার নামাজ:

উদাহরণস্বরূপ ফজরের নামাজের সুন্নাত নিম্নরূপে আদায় করবে:

দেহের গড়ন ও ভাঁজ প্রকাশ পাবে না, এমনভাবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করবে। শুধুমাত্র হাত ও মুখমণ্ডল খোলা থাকবে। নামাজে পঠিত ক্বিরাত

ও দোয়া, উপরে বর্নিত একাকী আদায়কারী পুরুষের নামাজের মতই। যেসব বিষয়ে পার্থক্য আছে তা নিম্নরূপ:

ক. তাকবীরের সময় হাতগুলিকে পুরুষদের মত কান পর্যন্ত তুলবে না। কাঁধ বরাবর তুলে, নিয়্যাত করে তাকবীর দিবে। এরপর বুকের উপরে হাত রেখে নামাজ শুরু করবে।

খ. রুকুতে পিঠ পুরোপুরি সোজা করবে না।

গ. সিজদার সময় হাতের কনুই জমিনে রাখবে।

ঘ. তাশাহহুদ পড়ার সময় রানের উপরে বসবে, অর্থাৎ ডান ও বাম পা ডান দিকে ছড়িয়ে বাম রানের উপর বসবে।

নামাজে মহিলাদের জন্য উত্তমরূপে পর্দা করার সহজ উপায় হল, হাত সহ সমস্ত শরীর আবৃত করতে পারবে এমন দীর্ঘ ওড়না এবং পা পর্যন্ত ঢেকে রাখবে এমন ঢোলা ও লম্বা পোশাক পরিধান করা।

নামাজের ওয়াজিবসমূহ:

নামাজের ওয়াজিবসমূহ নিম্নরূপ:

১. সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

২. সূরা ফাতিহার পর একটি সূরা অথবা কমপক্ষে সংক্ষিপ্ত তিন আয়াত তিলাওয়াত করা।

৩. এক্ষেত্রে প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়া তারপর অন্য সূরা পড়া।

৪. সূরা ফাতিহা ও এর সাথে মিলিয়ে অন্য সূরা ফরজ নামাজের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে আর ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাজের প্রত্যেক রাকাতে পড়া।

৫. সিজদা সবসময় একসাথে দুইটি করে আদায় করা।

৬. তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের দ্বিতীয় রাকাতের পরে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা। শেষ বৈঠকে বসা ফরজ।

৭. দ্বিতীয় রাকাতের পর তাশাহহুদের চেয়ে অতিরিক্ত সময় না বসা।

৮. সিজদায় নাক কপালের সাথে একত্রে জমিনে রাখা।

৯. শেষ বৈঠকে বসার সময়ে ‘আত্তাহিয়্যাতু’ পাঠ করা।

১০.নামজের মাঝে তা’দিল-ই এরকান বা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

১১.সর্বশেষে আসসালামু আলাইকুম বলে নামাজের সমাপ্ত করা।

১২.বিতর নামাজের তৃতীয় রাকাতের শেষে দোয়া-ই কুনুত্ পড়া।

১৩.ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবীর দেয়া।

১৪.ইমামের জন্য ফজর, জুমা, ঈদ, তারাবীহ ও বিতর নামাজের সব রাকাতে এবং মাগরিব ও এশার নামাজের প্রথম দুই রাকাতে কিরাত আওয়াজ করে পড়া।

১৫.ইমামের ও একাকী আদায়কারী মুসল্লীর জন্য যোহর ও আছরের ফরজ নামাজে, মাগরিবের তৃতীয় রাকাতে এবং এশার ফরজের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে নীচুস্বরে কিরাত পড়া। উপরে বর্নিত যেসব স্থানে ইমামের জন্য আওয়াজ করে কিরাত পড়া ওয়াজিব সেসব স্থানে একাকী নামাজ আদায়কারী মুসল্লীর জন্য উচুস্বরে কিংবা নীচুস্বরে কিরাত তিলাওয়াত করা উভয়ই জায়েজ।

কুরবানীর ঈদে আরাফাতের দিন ফজরের নামাজ থেকে চতুর্থ দিনের আছরের নামাজ পর্যন্ত তেইশটি ফরজ নামাজ আদায়ের পরে 'তাশরিক তাকবীর' আদায় করা ওয়াজিব।

সাহু সিজদা:

নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি, নামাজের ফরজগুলি থেকে কোন একটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলে ত্যাগ করলে নামাজ ভঙ্গ হয়। তবে যদি কোন একটি ওয়াজিব ভুলে আদায় না করলে নামাজ নষ্ট হবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে তাকে সাহু সিজদা আদায় করতে হবে। সাহু সিজদাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করলে অথবা নামাজের ওয়াজিবগুলি থেকে কোন একটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করলে মুসল্লীর উপর ঐ নামাজ পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হয়। তা আদায় না করলে গুনাহগার হবে। নামাজের সুন্নাত আমলের মধ্য থেকে কোন একটি আদায় না করলে সাহু সিজদা দিতে হয় না। সাহু সিজদা মূলত নামাজের কোন ফরজকে বিলম্বিত করার জন্য অথবা ওয়াজিবের বিলম্ব কিংবা ত্যাগের জন্য আদায় করতে হয়।

একই নামাজের মধ্যে একাধিকবার সাহু সিজদা ওয়াজিব হলেও, একবার আদায় করাই যথেষ্ঠ। জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের সময় ইমামের ওয়াজিবের ক্ষেত্রে ভুল হলে, তার অনুসরণকারী মুসল্লীদেরও তার সাথে সাহু সিজদা আদায় করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে মুসল্লীর ভুলের কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হলেও জামাত থেকে আলাদাভাবে তার সাহু সিজদা আদায় করতে হবে না।

সাহু সিজদা আদায়ের জন্য, শেষ বৈঠকে 'তাহাইয়্যাত' পড়ার পরে ডান দিকে সালাম ফিরানোর পরে দুইবার সিজদা করে বসবে এবং **'তাহিয়্যাত', 'আল্লাহুম্মা সাল্লি ও বারিক' ও 'রাব্বানা'** দোয়াসমূহ পড়ে নামজ শেষ করবে। এক বা দুইদিকেই সালাম ফিরিয়ে কিংবা কোনদিকেই সালাম না ফিরিয়েও সাহু সিজদা আদায় করা যায়।

সাহু সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারন:

যেখানে বসতে হবে সেখানে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে কিংবা দাঁড়াতে হবে এমন জায়গায় বসে গেলে, আওয়াজ করে কিরাত পড়তে হবে এমন জায়গায় নীচুস্বরে কিংবা নীচুস্বরে পড়তে হবে এমন জায়গায় আওয়াজ করে কিরাত পড়লে, দোয়া পড়ার জায়গায় কিরাত পড়লে কিংবা কিরাত পড়ার জায়গায় দোয়া পড়লে সাহু সিজদা দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সূরা ফাতিহার জায়গায়

আত্তাহিয়্যাতু পড়লে কিংবা আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জায়গায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা। নামাজ সম্পূর্ণ শেষ না করে সালাম ফিরালে, ফরজ নামাজের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা না মিলিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে পাঠ করলে কিংবা সূরা ফাতিহার পরে কোন কিরাত না পড়লেও সাহু সিজদা দিতে হবে। এছাড়াও ঈদের নামাজের বিশেষ তাকবীর না দিলে কিংবা বিতর নামাজে দোয়া-ই কুনুত না পড়লেও সাহু সিজদা দিতে হবে।

তিলাওয়াত-ই সিজদা:

পবিত্র কুরআনের চৌদ্দটি স্থানে সিজদার আয়াত রয়েছে। এগুলির থেকে যে কোন একটি আয়াত তিলাওয়াত করলে কিংবা শুনলে, এর অর্থ না বুঝলেও একবার সিজদা করা ওয়াজিব হবে। তবে সিজদার আয়াত লিখলে কিংবা ছাপার জন্য সাঁজালে তার সিজদা করতে হবে না।

পর্বত, মরুভূমি কিংবা অন্যকিছু থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে পুনরায় ফিরে আসা সিজদা আয়াতের আওয়াজ শ্রবণকারীর কিংবা পাখির মুখ থেকে ঐ আয়াতগুলি শ্রবণকারী ব্যক্তির উপর সিজদা করা ওয়াজিব হবে না। মানুষের কন্ঠ থেকে শুনা জরুরী। রেডিও, মাইক ইত্যাদি থেকে শুনা আওয়াজ, মানুষের কন্ঠ না হওয়ায় বরং হাফিজের স্বরের অনুরূপ প্রাণহীন যন্ত্রের আওয়াজ হওয়ায় এসব যন্ত্রের থেকে শুনা সিজদার আয়াতের জন্য সিজদা করা ওয়াজিব নয়।

তিলাওয়াত-ই সিজদা আদায়ের জন্য অজু অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে , কান পর্যন্ত হাত না তুলে '**আল্লাহু আকবার**' বলে সিজদায় জেতে হবে। সিজদায় কমপক্ষে তিনবার '**সুবহানা রব্বিয়াল আলা**' বলতে হবে। এরপর '**আল্লাহু আকবার**' বলে সিজদা থেকে উঠার মাধ্যমে তিলাওয়াত-ই সিজদা আদায় করা হয়ে যায়। তবে সিজদা দেয়ার পূর্বে এর জন্য নিয়্যাত করা শর্ত। নিয়্যাত না করে সিজদা দিলে তা তিলাওয়াত-ই সিজদা হিসেবে কবুল হবে না।

নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত পাঠ করলে, সাথেসাথে রুকুতে-সিজদাতে যাবে অথবা একটি সিজদা আদায় করে দাঁড়িয়ে ক্বিরাত পড়া চালিয়ে যেতে পারে। সিজদা আয়াত পাঠ করার পরে আরো দুই-তিন আয়াত তিলাওয়াত করে রুকুতে গেলে এবং তিলাওয়াত-ই সিজদার নিয়্যাত করলে, নামাজের রুকু ও সিজদাসমূহ তিলাওয়াত-ই সিজদা হিসেবে কবুল হবে, আলাদাভাবে সিজদার প্রয়োজন নাই। জামাতের সাথে আদায়কারী ব্যক্তি, ইমামের সিজদা আয়াতের তিলাওয়াত করার সময় শুনুক বা না শুনুক, ইমামের সাথে সিজদা-ই তিলাওয়াতের নিয়্যাতে রুকু ও দুই সিজদা করবে। রুকুতে যাওয়ার সময় তিলাওয়াত-ই সিজদার জন্য জামাতেরও নিয়্যাত করা আবশ্যক। নামাজের বাইরে সিজদার আয়াত পাঠ করলে সাথেসাথে না করে সুবিধাজনক সময়েও তিলাওয়াত-ই সিজদা আদায় করতে পারে।

শুকুর সিজদা:

তিলাওয়াত-ই সিজদার মত আদায় করতে হয়। আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত প্রাপ্ত হলে কিংবা কোন বালা-মুসীবত থেকে মুক্তি পেলে, বান্দার উপর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য **শুকুর সিজদা** করা মুস্তাহাব। শুধুমাত্র সিজদায় প্রথমে **'আলহামদু লিল্লাহ'** বলবে পরে সিজদার তাসবীহ পরবে। নামাজ শেষ হওয়ার পরপর সিজদা করা মাকরুহ।

বুজুর্গগণ বলেছেন, নামাজকে যথাযথভাবে অর্থাৎ 'তা'দিল-ই এরকান'সহ আদায় না করলে, ব্যক্তি নিজের সাথেসাথে অন্যান্য মাখলুককেও ক্ষতির সম্মুখীন করে। কেননা, ঐ ব্যক্তির গুনাহের কারণে অনাবৃষ্টি কিংবা অতিবৃষ্টি হয়, ফসল ফলায় না, অসময়ে বৃষ্টি হয়, যা উপকারের বদলে ক্ষতির কারণ হয়।

নামাজের সুন্নাতসমূহ:

১. নামাজ শুরুর সময় কান পর্যন্ত হাত তোলা।

২. এসময় হাতের তালু কিবলার দিকে ফিরানো।

৩. তাকবীরের পর হাত বাঁধা।

৪. ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করা।

৫. পুরুষের জন্য নাভির উপর আর মহিলাদের জন্য বুকের উপর হাত বাঁধা।

৬. ইফতিতাহ তাকবীরের পরে 'সুবহানাকা' পড়া।

৭. ইমাম ও একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির 'আউজুবিল্লাহ' পড়া।

৮. 'বিসমিল্লাহ্' পড়া।

৯. রুকুতে তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল আজিম' বলা।

১০.সিজদায় তিনবার 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' বলা।

১১.শেষ বৈঠকে দুরুদ পড়া।

১২.শেষে সালাম ফিরানোর সময় উভয় দিকে তাকানো।

১৩.ইমামের জন্য, জুমা ও ঈদের নামাজ ব্যতীত অন্য সকল নামাজের ক্ষেত্রে প্রথম রাকাতে, দ্বিতীয় রাকাতে যততুকু ক্বিরাত পড়বে তার দ্বিগুণ দীর্ঘ ক্বিরাত পড়া।

১৪.রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় ইমাম ও একাকী আদায়কারী ব্যক্তির 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলা।

১৫.রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে 'রব্বানা লাকাল হামদ' বলা।

১৬.সিজদার সময় পায়ের আঙ্গুলগুলি বাঁকিয়ে অগ্রভাগকে কিবলামুখী করা।

১৭.রুকু থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় এবং সিজদা থেকে উঠার সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলা।

১৮.সিজদায় হাত ও হাঁটু জমিনে রাখা।

১৯.দুই পায়ের গোড়ালির মাঝে দাঁড়ানো অবস্থায় চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা। রুকুতে, কাওমাতে ও সিজদাতে মিলিত রাখা।

২০.সূরা ফাতিহার পরে ‘আমীন’ বলা, রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা, রুকুতে হাতের আঙ্গুলগুলি খোলা অবস্থায় হাঁটুর উপর রেখে আঁকড়ে ধরা, সিজদার জন্য তাকবীর দেয়া, বসার সময় বাম পা কে জমিনে বিছিয়ে, ডান পাকে খাড়া করে রেখে বসা এবং দুই সিজদার মাঝে বসা।

মাগরিবের নামাজে সংক্ষিপ্ত সূরা পড়া হয়। ফজরের নামাজের প্রথম রাকাতে, দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় দীর্ঘ ক্বিরাত পড়া উত্তম। জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি, সূরা ফাতিহা ও এর সাথে মিলিয়ে অন্য সূরা পরবে না। তবে ‘সুবহানাকা’ পড়বে। তাকবীরগুলিও বলবে। তাহিয়্যাত ও দুরুদ শরীফ পড়বে।

নামাজের মুস্তাহাবসমূহ:

১. নামাজ আদায়ের সময়ে সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা।

২. রুকুতে পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখা।

৩. সিজদার সময় নাক যেখানে রাখে সেদিকে তাকানো।

৪. বসে তাহিয়্যাত পড়ার সময়, হাঁটুর সামনের দিকে তাকানো।

৫. সূরা ফাতিহার পরে ফজরের সময় দীর্ঘ ক্বিরাত আর মাগরিবের সময় সংক্ষিপ্ত ক্বিরাত তিলাওয়াত করা।

৬. ইমামের অনুসরণকারী মুসল্লীর, তাকবীরসমূহ নীচুস্বরে দেয়া।

৭. রুকুতে হাতের আঙ্গুলগুলি মেলে হাঁটুর উপরে রাখা।

৮. রুকুতে মাথা, ঘাড় ও পিঠ সমান রাখা।

৯. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে ডান পরে বাম হাঁটু জমিনে রাখা।

১০.সিজদার সময় মাথাকে দুই হাতের মাঝে রাখা।

১১.সিজদার সময় নাকের পরে কপাল রাখা।

১২.নামাজরত অবস্থায় হাই তুললে, হাতের তালুর বিপরীত পৃষ্ঠ দিয়ে মুখ ঢাকা।

১৩.সিজদায় পুরুষগণের কনুই তুলে রাখা আর মহিলাদের কনুই জমিনে রাখা।

১৪.সিজদায় পুরুষগণ হাত ও পা পেট থেকে আলাদা রাখবে।

১৫.রুকু এবং সিজদায় অন্ততপক্ষে তিনবার তাসবীহ পড়ার সময় পরিমাণ অপেক্ষা করা।

১৬.সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পরে জমিন থেকে হাত তুলা।

১৭.হাত তুলার পরে হাঁটু তুলা।

১৮.তাহিয়্যাত পড়ার সময় হাতকে রানের উপর রেখে, আঙ্গুলগুলি কিবলা বরাবর সোজা করে রাখবে। বাঁকাবে না এবং নাড়াচাড়াও করবে না।

১৯.ডানে বামে সালাম ফিরানোর সময় মাথাও উভয়দিকে ঘুরানো।

২০.সালাম ফিরানর সময় কাঁধের প্রান্তের দিকে তাকানো।

নামাজের মাকরুহসমূহ:

১. পোষাক না পরিধান করে কাঁধের উপর রেখে নামাজ আদায় করা।

২. সিজদায় যাওয়ার সময় প্যান্ট বা পায়জামার নিম্নাংশ টেনে উপরে তুলা।

৩. পোষাকের হাতা বা পা বটে নামাজে দাঁড়ানো।

৪. নামাজের মধ্যে অর্থহীন অঙ্গভঙ্গি করা।

৫. (অতিরিক্ত পোশাক থাকা সত্ত্বেও) কাজ করার ময়লা পোশাক পরে কিংবা এমন পোশাক যা পরে সম্মানিত মানুষের সামনে যাওয়া হয় না, তা পরিধান করে নামাজে দাঁড়ানো।

৬. মুখে এমন কিছু রাখা যার কারণে ক্বিরাত তিলাওয়াতে সমস্যা হয় না। আর এর কারণে ক্বিরাতে ব্যাঘাত ঘটলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায়।

৭. মাথা খোলা রেখে নামাজ আদায় করা।

৮. টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পরও না গিয়ে নামাজে দাঁড়ানো। পিছনের রাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গমনের চাপ আসার পরও জোর করে নামাজ আদায় করাও একইভাবে মাকরুহ।

৯. নামাজরত অবস্থায় সিজদার স্থানের ধুলাবালি, পাথর ইত্যাদি সরানো।

১০.নামাজরত অবস্থায় আঙ্গুল ফুটানো।

১১.নামাজরত অবস্থায় নিতম্বে হাত রাখা।

১২.মাথা কিংবা মুখমণ্ডল কিবলার থেকে অন্য দিকে ফিরানো, চোখ দিয়ে অন্য দিকে তাকানো। যদি বক্ষ কিবলা থেকে সরে যায় তবে নামাজ ভঙ্গ হয়।

১৩.তাসাহহুদের সময় কুকুরের মত বসা।

১৪.সিজদার সময় পুরুষের হাত জমিনে রাখা।

১৫.মানুষের মুখোমুখি হয়ে নামাজ আদায় করা, কিংবা উল্টা ফিরে উচ্চস্বরে কথা বলছে এমন কারো পিছনে নামাজ আদায় করা।

১৬.নামাজরত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে হাতের ইশারায় অথবা মাথা নেড়ে জবাব দেয়া।

১৭.নামাজের মাঝে হাই তুলা।

১৮.নামাজে চোখ বন্ধ রাখা।

১৯.ইমামের সম্পূর্ণরূপে মিহরাবের মধ্যে দাঁড়ানো।

২০.শুধুমাত্র ইমাম একাকী, জামাত থেকে অর্ধমিটারের বেশী উঁচুতে অবস্থান করলে।

২১.একাকী ইমামের জামাত থেকে নীচে অবস্থান করাও মাকরুহ।

২২.সামনের কাতারে খালি জায়গা থাকা অবস্থায় পিছনের কাতারে দাঁড়ানো। একইভাবে সামনের কাতারে খালি জায়গা না থাকার কারণে পিছনের কাতারে একাকী নামাজ আদায় করা।

২৩.নামাজ আদায়ের সময়, মানুষ বা প্রাণীর ছবি সম্বলিত পোশাক পরিধান করা।

২৪.নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির উপরে, সামনে, ডানে ও বামে দেয়ালে অঙ্কিত অবস্থায় প্রাণীর ছবি থাকলে কিংবা ছবি সম্বলিত কাপড় বা কাগজ থাকলে নামাজ মাকরুহ হয়। ক্রুশও প্রাণীর ছবির মত মাকরুহ।

২৫.জ্বলন্ত আগুনকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করা।

২৬.নামাজরত অবস্থায় আয়াত, তাসবীহ হাতের সাহায্যে গুনলে।

২৭.মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটি মাত্র চাঁদর জড়িয়ে নামাজ আদায় করা।

২৮.মাথার উপরের অংশ উম্মুক্ত রেখে খালি মাথায় পাগড়ী পেঁচিয়ে নামাজ আদায় করা।

২৯.নাক-মুখ ঢেকে নামাজ আদায় করা।

৩০.বিনা উজরে কাশি দেয়া, কফ বের করা।

৩১.এক-দুইবার হাত নাড়াচাড়া করা।

৩২.নামাজের সুন্নাতসমূহ থেকে কোন একটি ত্যাগ করা।

৩৩.বিনা প্রয়োজনে, বাচ্চা কোলে নিয়ে নামাজ আদায় করা।

৩৪.মনোযোগ নষ্ট করে বা নামাজের খুশুর ক্ষতিসাধন করে এমন পরিবেশে কিংবা এমন বস্তুর পাশে নামাজ আদায় করা। যেমন: সুসজ্জিত বা নকশা করা কোন বস্তুকে কিংবা সুস্বাদু বা প্রিয় খাবারকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করা, খেলা চলছে কিংবা বাদ্য বাজছে এমন পরিবেশে নামাজ আদায় করা।

৩৫.ফরজ নামাজ আদায়ের সময় বিনা উজরে দেয়ালে কিংবা পিলারে ভর দেয়া।

৩৬.রুকুতে যাওয়ার সময় কিংবা রুকু থেকে উঠার সময় কান পর্যন্ত হাত উঠানো।

৩৭.রুকুতে যেতে যেতে কিরাত শেষ করা।

৩৮.রুকুতে বা সিজদায় ইমামের আগে যাওয়া বা উঠা।

৩৯.নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন জায়গায় নামাজ আদায় করা।

৪০.কবরকে সামনে রেখে নামাজ আদায় করা।

৪১.তাশাহহুদ পড়ার সময় সুন্নাত অনুযায়ী না বসা।

৪২.দ্বিতীয় রাকাতে প্রথম রাকাতের চেয়ে তিন আয়াত বেশী তিলাওয়াত করা।

নামাজের বাইরের মাকরুহসমূহ:

১. টয়লেটে কিংবা অন্য যে কোন স্থানে কিবলার দিকে কিংবা পিছন ফিরে প্রস্রাব, পায়খানা করা।

২. সরাসরি সূর্যের কিংবা চাঁদের আলোতে টয়লেট করা।

৩. নাবালক শিশুদেরকে কিবলামুখী করে টয়লেট করালে, যে করাবে তার উপর মাকরুহ হবে। কেননা, বড়দের জন্য যা হারাম, ছোটদেরকে দিয়ে তা করানোও বড়দের উপর হারাম হয়।

৪. বিনা উজরে কিবলার দিকে পা প্রসারিত করা।

৫. পবিত্র কুরআন কিংবা অন্য কোন দ্বিনী কিতাবের দিকে পা প্রসারিত করা। তবে পা বরাবর না হয়ে উপরে থাকলে গুনাহ হয় না।

নামাজ ভঙ্গকারী কারণসমূহ:

১. বিনা উজরে কাশি দেয়া অথবা গলা পরিষ্কার করা।

২. নামাজরত অবস্থায় অন্যের হাঁচির জবাবে ‘**ইয়ারহামুকাল্লাহ**’ বলা।

৩. একাকী নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি, পাশে জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারী ইমামের ভুল হচ্ছে বুঝতে পেরে তাকে শুধরে দিলে নিজের নামাজ নষ্ট হয়। যদি ইমাম এই ব্যক্তির কথা অনুযায়ী আদায় করে, তবে ইমামের নামাজও ভঙ্গ হবে।

৪. কোন কিছুর জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে নামাজরত অবস্থায় ‘**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’** বললে নামাজ ভঙ্গ হবে। তবে যদি তা অবগত করার উদ্দেশ্যে বলে তবে নামাজ ভঙ্গ হবে না।

৫. সতর তথা লজ্জাস্থান উম্মুক্ত হলে।

৬. ব্যাথা কিংবা দুনিয়াবী কোন কারণে কান্না করলে। তবে, জান্নাত কিংবা জাহান্নামের কথা স্মরণ করে সেখানকার অবস্থার কথা ভেবে কান্না করলে নামাজ ভঙ্গ হবে না।

৭. মুখে কিংবা হাতের ইশারায় সালামের জওয়াব দিলে।

৮. পাঁচ ওয়াক্তের কম নামাজ ক্বাজা হলে এবং তা নামাজরত অবস্থায় স্মরণে আসলে।

৯. নামাজের মধ্যে এমন কোন আচরণ বা কাজ করা যা কেউ দেখলে, বুঝবে যে সে নামাজ আদায় করছে না।

১০.নামাজরত অবস্থায় কোন কিছু খেলে কিংবা পানি পান করলে।

১১.নামাজরত অবস্থায় কথা বললে।

১২.ইমাম ব্যতীত অন্য কারো ভুল ধরলে।

১৩.নামাজরত অবস্থায় হাসলে।

১৪.নামাজের মধ্যে আওয়াজ করে কাঁদলে কিংবা হাহুতাশ করলে।

যে সব অবস্থায় নামাজ ভঙ্গ করা মুবাহ:

১. সাপ মারার জন্য।

২. পলায়নরত পশু ধরার জন্য।

৩. পশুপালকে হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

৪. জ্বলন্ত চুলায় থাকা পাতিল থেকে পানি বা খাবার উথলে পড়ার উপক্রম হলে তা নিবারণের জন্য।

৫. ওয়াক্ত বা জামাত হারানোর আশঙ্কা না থাকলে, অন্য মাজহাবে যেসব কারণে নামাজ ভঙ্গ হয় সেসব কারণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নামাজ ভঙ্গ করা জায়েজ। যেমন, এক দিরহামের চেয়ে কম পরিমাণ নাজাসাত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য কিংবা পরনারীর স্পর্শ লেগেছে এ কথা স্মরণে আসলে, অজু করার জন্য নামাজ ভঙ্গ করা জায়েজ।

৬. প্রস্রাব-পায়খানা বা বায়ু নির্গমনের চাপ অনুভব করলে তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নামাজ ভঙ্গ করা জায়েজ।

যে সব অবস্থায় নামাজ ভঙ্গ করা ফরজ:

১. 'বাঁচাও' বলে কেউ চিৎকার করলে তাকে বাঁচানোর জন্য কিংবা কুয়ায় পড়ার আশঙ্কা আছে এমন অন্ধ কাউকে রক্ষার জন্য অথবা আগুনে পুড়তেছে, পানিতে ডুবে যাচ্ছে এমন কাউকে উদ্ধারের জন্য, আগুন নিভানোর জন্য নামাজ ভঙ্গ করা ফরজ।

২. মা-বাবা, দাদা-দাদী, নানা-নানী ডাকলে ফরজ নামাজ ভঙ্গ করা ওয়াজিব হয় না, তবে ভঙ্গ করা জায়েজ, প্রয়োজন না হলে ভঙ্গ না করা উত্তম। সুন্নাত সহ সকল নফল নামাজ ভঙ্গ করতে হয়। আর তারা যদি সাহায্যের জন্য ডেকে থাকে তবে নামাজ ভঙ্গ করা আবশ্যক হয়।

জামাতে নামাজ:

নূন্যতম দুইজনের মধ্য থেকে একজনের ইমাম হয়ে একত্রে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে জামাত অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফরজসমূহ জামাতের সাথে আদায় করা পুরুষদের জন্য সুন্নাত। জুমা ও ঈদের নামাজের ক্ষেত্রে জামাতে আদায় করা ফরজ। বহু হাদীস শরীফের মাধ্যমে আমাদেরকে অবগত করা হয়েছে যে, জামাতের সাথে আদায়কৃত নামাজের জন্য প্রচুর সওয়াব রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "**জামাতের সাথে আদায়কৃত নামাজের জন্য, একাকী আদায়কৃত নামাজের থেকে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব প্রদান করা হয়**"। তিনি (সঃ) আরো বলেছেন যে, "**ভালোভাবে অজু করে জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য যখন কেউ কোন মসজিদে গমন করে, তখন তার প্রতি কদমের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা একটি করে সওয়াব প্রদান করেন এবং তার আমল দফতর থেকে একটি করে গুনাহ মুছে দেন এবং জান্নাতে তার মর্যাদা একধাপ বাড়িয়ে দেন**"।

জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়। সম্প্রীতি ও বন্ধন সুদৃঢ হয়। জামাতে একত্রিত হয়ে মুসলমানগণ পরস্পরের সাথে কুশলাদি বিনিময় করেন। এর দ্বারা কারো কোন সমস্যা থাকলে কিংবা কেউ অসুস্থ হলে তা প্রকাশ পায়, অন্যদের পক্ষে তার সাহায্যে এগিয়ে আসা কিংবা তার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা সহজ হয়। সমস্ত মুসলমানগণ যে এক ক্বালব ও এক শরীর, তার সর্বোত্তম উদাহরণ হল এই জামাতের সাথে আদায়কৃত নামাজ।

অসুস্থ, পক্ষাঘাতগ্রস্থ, খোঁড়া, হাঁটতে অক্ষম বৃদ্ধ ও অন্ধের জন্য জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা আবশ্যক নয়।

জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের সময় যাকে অনুসরণ করা হয় তাকে ইমাম বলা হয়। ইমাম হওয়ার জন্য এবং তার অনুসরণ করে জামাত হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে।

ইমামতির শর্তসমূহ:

ইমাম হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত রয়েছে। এগুলির থেকে কোন একটি শর্ত যদি ইমামের মাঝে অনুপস্থিত থাকে তবে তার পিছনে আদায়কৃত নামাজ কবুল হয় না। এগুলি হল:

১. মুসলমান হওয়া। হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে যারা খলিফা হিসেবে স্বীকার করে না অথবা মিরাজ ও কবরের আযাবকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

২. বালেগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

৩. আকেল তথা বুঝ শক্তি সম্পন্ন হওয়া। মাতাল কিংবা বুদ্ধি প্রতিবন্দী ব্যক্তি ইমাম হতে পারে না।

৪. পুরুষ হওয়া। নারী কখনো পুরুষের ইমাম হতে পারে না।

৫. কমপক্ষে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি আয়াত সঠিকভাবে তিলাওয়াত করতে সক্ষম হওয়া। এক আয়াতও মুখস্ত করতে অক্ষম কিংবা মুখস্ত করা সত্ত্বেও তাজবীদ সহকারে শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতে অক্ষম কারো জন্য ইমামতি করা জায়েজ নয়।

৬. উজরহীন হওয়া। উজরওয়ালা ব্যক্তি উজরহীন ব্যক্তির ইমাম হতে পারে না।

ইমামের জন্য পবিত্র কুরআন তাজবীদ সহকারে তিলাওয়াত করা আবশ্যক। সুন্দর ক্বিরাত বলতে তাজবীদ অনুযায়ী তিলাওয়াত করাকে বুঝায়। যে সকল ইমাম নামাজের শর্তসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করে না তাদের পিছনে নামাজ আদায় করা উচিত নয়। "সালিহ (সৎ কর্মশীল) কিংবা ফাজির (পাপী) ইমামের পিছনে নামাজ আদায় কর" হাদীসটি সাধারণ মসজিদের ইমামের জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং জুমা নামাজের ইমামতি করা সুলতান, হুকুমদার কিংবা তার প্রতিনিধির জন্য প্রযোজ্য।

সুন্নাত তথা দ্বীনি ইলমের উপর যার সর্বাধিক দখল রয়েছে তিনিই ইমামতির জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। এক্ষেত্রে সমপর্যায়ের একাধিক ব্যাক্তি থাকলে, তাদের মধ্যে যিনি উত্তমভাবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন তিনি ইমাম হবেন। এক্ষেত্রেও একাধিক ব্যক্তি সমপর্যায়ের হলে তাদের মধ্য থেকে অধিক তাকওয়াবান ব্যক্তি ইমাম হবেন। তাতেও সমপর্যায়ের একাধিক ব্যক্তি থাকলে, বয়সে যিনি বড় তিনি ইমাম হবেন।

দাস, যাযাবর, পাপী, অন্ধ ও অবৈধ সন্তানের ইমামতি করা মাকরুহ। ইমামের, জামাতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বিরক্তির উদ্রেক হয় কিংবা অস্বস্থি অনুভব করে এমন দীর্ঘ ক্বিরাত তিলাওয়াত করা উচিত নয়।

মহিলাদের জন্য শুধুমাত্র নিজেদের মাঝে জামাত করে নামাজ আদায় করা মাকরুহ।

একজন মুসল্লী নিয়ে জামাতে নামাজ আদায়কারী ইমাম তাকে নিজের ডান পাশে দাঁড় করাবে। যদি কমপক্ষে দুইজন মুসল্লী নিয়ে জামাত করে তবে ইমাম তাদের সামনে দাঁড়াবে। পুরুষের জন্য নারী কিংবা শিশুর পিছনে নামাজ আদায় করা জায়েজ নয়।

ইমামের পিছনে প্রথমে পুরুষগণ কাতার করে দাঁড়াবে, তারপর শিশুরা এবং তাদের পিছনে নারীরা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।

ইমাম যদি মহিলাদের ইমামতির জন্য নিয়্যাত করে থাকে আর একই ওয়াক্তের নামাজের জন্য একই সারিতে পুরুষ ও মহিলা দাঁড়ায় তবে পুরুষের নামাজ ভঙ্গ হবে। তবে যদি ইমাম মহিলার জন্য নিয়্যাত না করে থাকে তবে পাশাপাশি নামাজ আদায়কারী পুরুষের নামাজের ক্ষতি হবে না, কিন্তু মহিলার

এভাবে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না। দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি, বসে আদায়কারী ব্যক্তির অনুসরণ করতে পারে। মুকীম ব্যক্তি, মুসাফির ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করতে পারে। ফরজ আদায়কারী ব্যক্তি নফল আদায়কারী ব্যক্তির ইমামতিতে জামাত করতে পারে না তবে নফল আদায়কারী ফরজ আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে জামাতে নামাজ আদায় করতে পারে। জামাতে নামাজ আদায়ের পরে যদি জানতে পারে যে, ইমাম অজুহীন অবস্থায় নামাজ পড়িয়েছে তাহলে মুসল্লীগণ পুনরায় ঐ নামাজ আদায় করে নিবে।

লাইলাতুল মিরাজ, লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল কদরের নফল নামাজসমূহ আযান ইকামাত ও ঘোষণার মাধ্যমে জামাতের সাথে আদায় করা মাকরুহ ।

জামাতে অংশগ্রহণকারী মুসল্লীগণ চাইলেও ফরজ নামাজ আদায়ের সময় ইমামের জন্য, ক্বিরাত ও তাসবীহসমূহ সুন্নাতের চেয়ে অতিরিক্ত দীর্ঘায়িত করা মাকরুহে তাহরিমী।

কেউ যদি রুকুর মধ্যে ইমামের পিছনে জামাতে অংশগ্রহণ করতে না পারে তবে ঐ রাকাত আদায় হবে না, ইমাম সালাম ফিরানোর পর তা আদায় করে নিতে হবে। ইমামের রুকুতে থাকা অবস্থায় কেউ জামাতে অংশগ্রহণ করতে আসলে প্রথমে নিয়্যাত করে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলে নামাজ আরম্ভ করবে পরে অনতিবিলম্বে রুকুতে যেয়ে ইমামের অনুসরণ করতে থাকবে। রুকুতে পুরোপুরি ঝুঁকার আগেই যদি ইমাম দাঁড়িয়ে যায় তবে ঐ রাকাত আদায়কৃত হিসেবে গণ্য হবে না।

ইমামের আগেই রুকুতে ঝুঁকা, সিজদায় যাওয়া কিংবা রুকু ও সিজদা থেকে ইমামের আগে উঠা মাকরুহে তাহরিমী। ফরজ নামাজ আদায়ের পরে কাতার থেকে ছড়িয়ে যাওয়া মুস্তাহাব।

কোন মুমিন ব্যক্তি যদি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করে তবে সে সমস্ত পয়গম্বর আলাইহিস্ সালামের সাথে নামাজ আদায়ের মত সওয়াব অর্জন করে।

জামাতের সাথে আদায়কৃত নামাজের এত ফযিলত তখনই অর্জিত হবে যখন ইমামের নামাজ কবুল হবে।

কেউ যদি, কোন ধরনের উজর ব্যতীত জামাত ত্যাগ করে তাহলে সে জান্নাতের সুগন্ধ গ্রহণ করতে পারবে না। উজর ব্যতীত জামাত ত্যাগকারীকে চার কিতাবে অভিশপ্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই জামাতের সাথে আদায়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। কিয়ামতের দিন যদি মহান আল্লাহ তায়ালা, সাত স্তরের জমিন, সাত স্তরের আসমান, আরশ, কুরসী ও অন্যান্য সকল সৃষ্টিকে পরিমাপকের এক পাল্লায় রাখেন আর সকল শর্ত মেনে যথাযথভাবে জামাতের সাথে আদায়কৃত এক ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব অন্য পাল্লায় রাখেন তবে জামাতের সাথে আদায়কৃত ফরজ নামাজের সওয়াবের পাল্লা অধিক ভারী হবে।

ইমামের সাথে জামাতে নামাজ শুদ্ধ হওয়ার দশটি শর্ত:

১. নামাজ শুরুর সময়, তাকবীর দেয়ার পূর্বে ইমামের অনুসরণ করে জামাতে নামাজ আদায়ের নিয়্যাত করতে হয়। ‘ইকতাদাইতু বিহাজাল ইমাম’ বলে তা মনে মনে স্থির করতে হয়। নিয়্যাতে ইমামের অনুসরণের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক।

২. জামাতে মহিলাদের উপস্থিতি থাকলে তাদের জন্য ইমামের নিয়্যাত করা আবশ্যক। পুরুষ জামাতের জন্য ইমামতির নিয়্যাত না করলেও চলবে। তবে ইমাম জামাতের ইমামতির নিয়্যাত করলে নিজে জামাতে নামাজের সওয়াব অর্জন করবে।

৩. জামাতের কাতার ইমামের গোড়ালির পিছনে থাকতে হবে।

৪. ইমামের সাথে জামাতের, একই ওয়াক্তের ফরজ নামাজ আদায় করা আবশ্যক।

৫. ইমাম ও পুরুষ জামাতের মাঝে মহিলাদের কাতার থাকতে পারবে না।

৬. ইমাম ও জামাতের মাঝে, নৌকা যেতে পারে এমন খাল কিংবা গাড়ি যেতে পারে এমন রাস্তা থাকতে পারবে না।

৭. ইমাম ও জামাতের মাঝে এমন দেয়াল বা প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারবে না, যার কারণে অপর পাশের জামাতের পক্ষে ইমাম কিংবা জামাতের কাউকেই দেখা সম্ভব না অথবা ইমামের আওয়াজও শুনা যায় না।

৮. ইমাম কোন পশুর উপরে আর জামাত নিচে অথবা জামাত পশুর উপরে, ইমাম মাটিতে হতে পারবে না।

৯. ইমাম ও জামাত যদি একাধিক নৌকা বা জাহাজে অবস্থান করে তবে নৌকা কিংবা জাহাজের পরস্পর লেগে থাকতে হবে।

১০.ইমাম অন্য মাজহাবের হলে জামাতের নামাজ শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দুইটি রিওয়ায়েত রয়েছে। প্রথম বর্ননা অনুযায়ী, জামাতে অংশগ্রহণকারীদের মাজহাব অনুযায়ী নামাজ ভঙ্গ হয় এমন কোন কারণ ইমামের মাঝে অনুপস্থিত থাকতে হবে। দ্বিতীয় মত হল, ইমামের নিজ মাজহাব অনুযায়ী নামাজ শুদ্ধ হলে, অন্য মাজহাবের অনুসারী জামাতের জন্যও নামাজ শুদ্ধ হবে। এই মত অনুযায়ী, ইমামের দাঁতে প্রলেপ অথবা ফিলিং থাকলেও, হানাফী মাজহাবের অনুসারীদের জন্য তার ইমামতিতে নামাজ আদায় করা সহীহ হবে।

দুই জনের জামাত হলে, মুসল্লী ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে। এক্ষেত্রে বাম দিকে দাঁড়ানো মাকরুহ। সরাসরি পিছনে দাঁড়ানোও মাকরুহ। মুসল্লীর

পায়ের গোড়ালি ইমামের গোড়ালির চেয়ে সামনে না থাকলে নামাজ শুদ্ধ হয়। দুই বা তার চেয়ে বেশি মুসল্লী জামাতে অংশগ্রহণ করলে ইমামের পিছনের সারিতে দাঁড়াবে।

ইমামের সাথে জামাতে নামাজ আদায় করার সময়ও একাকী আদায় করার মত করেই নামাজ পড়তে হয়। তবে নামাজের দাঁড়ানো অবস্থায়, ইমাম উচ্চস্বরে হোক কিংবা নিচুস্বরে হোক, যেভাবেই ক্বিরাত তিলাওয়াত করুক না কেন, জামাতে অংশগ্রহণকারী মুসল্লীগণ কিছুই পাঠ করবে না। শুধুমাত্র প্রথম রাকাতের শুরুতে **'সুবহানাকা'** পড়বে। (শাফিঈ মাজহাব অনুযায়ী, ইমামের সাথে সাথে জামাতকেও নিচুস্বরে সূরা ফাতিহা পড়তে হয়।) ইমাম উচ্চস্বরে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করার পরে, জামাত নিচুস্বরে **'আমীন'** বলবে। উচ্চস্বরে আমীন বলা উচিৎ নয়। রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় ইমাম যখন '**সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ**' বলবে তখন জামাত শুধুমাত্র '**রব্বানা লাকাল হামদ**' বলবে। এরপর '**আল্লাহু আকবার**' বলে ইমামের সাথে সাথে জামাতও সিজদায় যাবে। রুকুতে, সিজদায় ও বসা অবস্থায় একাকী নামাজ আদায়ের মত করেই জামাতও তাসবীহ ও দোয়াসমূহ পাঠ করবে।

বিতরের নামাজ, রমজান মাসে জামাতের সাথে আদায় করা হয়। এর বাইরে অন্যান্য সময়ে একাকী আদায় করতে হয়।

'মাস্‌বুক'এর নামাজ

ইমামের অনুসরণ করে জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারী মুসল্লীদেরকে চারটিভাগে ভাগ করা যায়। তারা হলেন: **মুদরিক, মুকতাদি, মাসবুক ও লাহিক।**

মুদরিক: 'ইফতিতাহ তাকবীর' অর্থাৎ নামাজ শুরুর জন্য যে তাকবীর দেয়া হয় সেই মুহূর্ত থেকেই সম্পূর্ণ নামাজ ইমামের সাথে আদায়কারী মুসল্লীকে বলা হয়।

মুকতাদি: ইমামের ইফতিতাহ তাকবীরের সময় উপস্থিত হতে না পেরে পরবর্তীতে নামাজে যোগদান করলে তাকে মুকতাদি বলা হয়।

মাসবুক: ইমামের সাথে জামাতে প্রথম রাকাতে অংশগ্রহণ করতে না পারলে তাকে মাসবুক বলা হয়।

লাহিক: ইফতিতাহ তাকবীর থেকেই ইমামের সাথে একত্রে নামাজ শুরু করার পরে কোন কারণে নিজের অজু ভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় জামাত থেকে বের হয়ে অজু করে পুনরায় একই নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ করে ঐ ইমামের অনুসরণকারীকে বলা হয়। এই ধরণের ব্যক্তি, আগের মত জামাতে নামাজের নিয়মেই আদায় করবে, অর্থাৎ ক্বিরাত পড়বে না, রুকু ও সিজদার তাসবীহসমূহ পড়বে ও এভাবে ইমামের সালাম ফিরানো পর্যন্ত অনুসরণ করবে এরপর যেই রাকাতগুলি বাদ গেছে তা নিজে আদায় করে নিবে। লাহিক ব্যক্তি, জামাত থেকে বের হয়ে পুনরায় জামাতে অংশগ্রহণের মাঝের সময়টুকুতে

দুনিয়াবী কোন কথা বলবে না, যেন সে জামাতেই আছে এমন থাকবে। সবচেয়ে নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে অজু করবে। কেননা অজুর জন্য খুব দূরে গেলে নামাজের ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পক্ষে কিছু আলেম মত দিয়েছেন।

মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সাথে যেই কয় রাকাত নামাজ আদায় করতে পারেনি তা ইমাম সালাম ফিরানোর পরে 'আল্লাহু আকবর' বলে দাঁড়িয়ে নিজে আদায় করে নিবে।

ক্বিরাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথম রাকাত, এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকাত আদায় করছে এমনভাবে তিলাওয়াত করবে। আর বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রথমে চতুর্থ, এরপর তৃতীয় ও দ্বিতীয় রাকাতের মত করে আদায় করবে। অর্থাৎ শেষ থেকে শুরুর মত করে আদায় করবে। উদাহরণস্বরূপ, এশার নামাজের শেষ রাকাতে জামাতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি, ইমামের সালাম ফিরানোর পরে দাঁড়িয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে আদায় করবে। কিন্তু বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রথম রাকাতের পরেই আদায় করবে, দ্বিতীয় রাকাতের পরে বসবে না।

পাঁচটি জিনিস ইমাম না করলে জামাত করতে পারে না:

১. ইমাম দোয়া-ই কুনুত না পড়লে জামাতও পড়তে পারে না।

২. ইমাম ঈদের নামাজে অতিরিক্ত তাকবীর না দিলে জামাতও দিতে পারে না।

৩. ইমাম, চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে না বসলে জামাতও বসবে না।

৪. ইমাম সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা আদায় না করলে জামাতও আদায় করবে না।

৫. ইমাম সাহু-সিজদা না করলে জামাতও তা করবে না।

চারটি জিনিস ইমাম করলেও জামাত করবে না:

১. ইমাম দুইয়ের বেশি সিজদা করলেও, জামাত তা করবে না।

২. ইমাম ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবীর এক রাকাতে তিনবারের চেয়ে বেশি করলেও, জামাত তা করবে না।

৩. ইমাম জানাজার নামাজে চারবারের চেয়ে বেশি তাকবীর দিলেও, জামাত তা করবে না।

৪. ইমাম পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়ালেও জামাত দাঁড়াবে না। ইমামের জন্য অপেক্ষা করবে ও পরে একসাথে সালাম ফিরাবে।

দশটি জিনিস ইমাম না করলেও জামাত করবে:

১. ইফতিতাহ তাকবীরের সময় হাত তুলবে।

২. সুবহানাকা পাঠ করবে।

৩. রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলবে।

৪. রুকুর তাসবীহ পাঠ করবে।

৫. সিজদায় যাওয়ার সময় ও সিজদা থেকে উঠার সময় তাকবীর বলবে।

৬. সিজদার তাসবীহ পাঠ করবে।

৭. 'সামিয়াল্লাহু' না বললেও 'রব্বানা লাকা-ল হামদ' বলবে।

৮. 'আত্তাহিয়্যাতু'এর শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে।

৯. নামাজের শেষে সালাম ফিরাবে।

১০.পবিত্র কুরবানীর ঈদের সময়, তেইশ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের শেষে সালাম ফিরানোর সাথে সাথে তাকবীর বলবে। এই তাকবীরকে 'তাশরিক তাকবীর' বলা হয়।

ইফতিতাহ তাকবীরের ফজিলতসমূহ

কোন ব্যক্তি যদি, ইফতিতাহ তাকবীরে ইমামের সাথে একত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে, তাহলে শীতের পূর্বে গাছের শুঁকনো পত্রসমূহ বাতাস প্রবাহের সাথে সাথে যেভাবে ঝরে পরে ঠিক তেমনিভাবে ঐ বক্তির গুনাহসমূহও ঝরে যায়।

একদিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ আদায়ের সময়, কোন একজন সাহাবী ফজরের নামাজে ইফতিতাহ তাকবীরের সময় উপস্থিত হতে পারেননি। এজন্য তিনি একজন দাস আযাদ করে দিলেন। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আজকে ইফতিতাহ তাকবীরে উপস্থিত হতে পারিনি এজন্য একজন দাস আযাদ করে দিয়েছি। এখন আমি কি এর দ্বারা ইফতিতাহ তাকবীরের সওয়াব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলেন, **তুমি এই ইফতিতাহ তাকবীরের ব্যাপারে কি বল**? হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন, ইয়া রাসূলুলাহ! আমি যদি চল্লিশটি উটের মালিক হতাম আর এই উটগুলি মূল্যবান রত্ন সমৃদ্ধ হত, তারপর আমি সবসহ এই উটগুলি ফকিরদের মাঝে দান করে দিতাম তবুও ইমামের সাথে একত্রে ইফতিতাহ তাকবীরে অংশগ্রহণ করলে যে সওয়াব অর্জিত হয় আমার মনে হয় এর দ্বারা তা অর্জন করতে পারব না।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, **ইয়া উমর! তুমি এই ইফতিতাহ তাকবীরের**

ব্যাপারে কি বল? হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বলল, আমার যদি মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত উটের সারি থাকে আর এগুলি রত্ন বোঝাই হয় এরপর আমি উটসহ সবকিছু ফকিরদের মাঝে দান করে দেই তাতে যে পরিমাণ সওয়াব অর্জন করব, তার দ্বারাও আমার মনে হয় ইমামের সাথে একত্রে ইফতিতাহ তাকবীরে অংশগ্রহণ করার সওয়াব অর্জন করা সম্ভব হবে না।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, **ইয়া উসমান! এই ইফতিতাহ তাকবীরের ব্যাপারে তোমার মত কি?** জবাবে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি রাতে যদি দুই রাকাত নামাজ আদায় করি এবং এর প্রত্যেক রাকাতে মহাপবিত্র কুরআন শরীফকে খতম করি তারপরও মনে হয়, ইমামের সাথে একত্রে ইফতিতাহ তাকবীরে অংশগ্রহণের সওয়াব অর্জন করতে পারব না।

অতঃপর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, **ইয়া আলী! এই ব্যাপারে তোমার অভিমত কি**? জবাবে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওজহাহু বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত কাফির দ্বারা পূর্ণ হলে আর আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে শক্তি দিলে, এর দ্বারা সমস্ত কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ করলে যে সওয়াব হবে, আমার মনে হয় তবুও তা ইমামের সাথে একত্রে ইফতিতাহ তাকবীরে অংশগ্রহণ করতে পারার দ্বারা অর্জিত সওয়াবের সমান হবে না।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **এই আমার উম্মত ও আমার সাহাবী! সাত আসমান আর সাত জমিন যদি কাগজ হয়, সমস্ত সাগর-মহাসাগর যদি কালি হয়, সমস্ত বৃক্ষরাজি যদি কলম হয়, সমস্ত ফেরেশতা যদি লেখক হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত যদি লিখতে থাকে তবুও ইমামের সাথে একত্রে ইফতিতাহ তাকবীরে অংশগ্রহণের সওয়াব লিখে শেষ করতে পারবে না**।

ঘটনা: প্রাসাদে বানানো মসজিদ

ইমাম আজম আবু হানিফা (র:) এর ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হারুনুর রশিদ'এর সময়ে কাজী (প্রধান বিচারক) এর দ্বায়িত্ব পালন করেছিলেন। একদিন হারুনুর রশিদের নিকটে থাকা অবস্থায়, একব্যক্তি অপর আরেক ব্যক্তির ব্যাপারে অভিযোগ করল। এসময় হারুনুর রশিদের উজির বলল, আমি এর সাক্ষী। হযরত আবু ইউসুফ (র:) উজিরকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করেননি। খলিফা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমার উজিরকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করছ না? ইমাম বললেন, একদিন আপনি তাকে কোন কাজের আদেশ দিচ্ছিলেন ঐ সময় সে বলেছিল, "আমি আপনার আজ্ঞাবহ দাস বা বান্দা"। এমতাবস্থায় সে যদি সত্য বলে থাকে তাহলে দাস হিসেবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি মিথ্যা বলে থাকে সেক্ষেত্রেও মিথ্যাবাদী হিসেবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়। খলিফা তখন বলল, আমি

যদি সাক্ষী দিতে চাই কবুল করবে কি? ইমাম বললেন, না। খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? ইমাম বললেন, আপনি জামাতের সাথে নামাজ আদায় করেন না। খলিফা বললেন, আমিতো মুসলমানদের জন্য কাজে ব্যস্ত থাকি। ইমাম বললেন, যে স্থানে খালেকের আনুগত্য করা আবশ্যক সেখানে খালক্ (জনতা) এর অনুগত হওয়া সম্ভব নয়। খালিফা বললেন, ঠিক বলেছ। তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদে মসজিদ নির্মানের আদেশ দিয়েছেন। পরবর্তীতে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগ দিয়েছেন ও সর্বদা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করেছেন।

জুমা নামাজ

মহান আল্লাহ্ তায়ালা জুমার দিনকে মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ করেছেন। জুমার দিনে যোহরের ওয়াক্তের সময় জুমা নামাজ আদায় করা আল্লাহ্ তায়ালার একটি আদেশ।

আল্লাহ্ তায়ালা, পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা জুমার শেষের দিকের আয়াত-ই করিমায় বলেছেন যে, **হে ঈমান গ্রহণের কারণে সম্মান অর্জনকারী বান্দা! জুমার দিন, যখন যোহরের আযান দেয়া হয় তখন খুতবা শোনার এবং জুমার নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে গমন কর। ঐ সময়ে বেচাকেনা, ব্যবসা-বানিজ্য ত্যাগ কর। জুমার নামাজ ও খুতবা তোমাদের জন্য অন্যান্য কাজকর্ম থেকে অধিক কল্যাণকর। জুমার নামাজ আদায়ের পরে, মসজিদ থেকে বের হয়ে দুনিয়াবী কাজকর্ম করার জন্য ছড়িয়ে যেতে পার। আল্লাহ্ তায়ালার থেকে রিজিক পাওয়ার আশায় পরিশ্রম কর। আর আল্লাহ্ তায়ালাকে খুব বেশি স্মরণ কর, যাতে করে তোমরা মুক্তি অর্জন করতে পার।**

নামাজ আদায়ের পরে, কেউ চাইলে কর্মস্থলে গিয়ে কাজে মনোনিবেশ করতে পারে আবার কেউ চাইলে মসজিদে বসে নফল নামাজ আদায় করতে পারে, কুরআন করীম তিলাওয়াত কিংবা দোয়া করতে পারে। জুমার দিনে যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পরে, বেচাকেনা করা গুনাহের কাজ।

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদিস শরীফের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, '**কোন মুসলমান জুমার দিনে গোসল করে জুমার নামাজে অংশগ্রহণ করলে, তার এক সপ্তাহের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয় এবং প্রত্যেক কদমের জন্য সওয়াব অর্জন করে'।**

'যারা জুমার নামাজ আদায় করে না আল্লাহ্ তায়ালা তাদের ক্বালবসমূহকে মুহুর মেরে দেন। তারা গাফিল হয়ে যায়'।

'দিবসসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হল জুমার দিন। জুমার দিন, ঈদের ও আশুরার দিনের থেকেও অধিক মূল্যবান। জুমা মুমিনদের জন্য দুনিয়া ও জান্নাতের ঈদ হিসেবে বিবেচিত'।

'কোন ব্যক্তি যদি শরয়ী উজর ছাড়া, তিন সপ্তাহ জুমা নামাজ আদায় না করে তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তার ক্বালবে মুহুর মেরে দেন'। (অর্থাৎ, পরবর্তীতে সে নেক আমল করতে অপারগ হয়।)

'জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন মুমিন কোন দোয়া করলে তা ফিরিয়ে দেয়া হয় না'।

'জুমার নামাজের পরে সাতবার সূরা ইখলাস ও মুয়াওয়ীযাতাইন তিলাওয়াত করলে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে এক সপ্তাহের জন্য বালা-মুসীবত, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন'।

'শনিবার যেভাবে ইহুদীদের এবং রবিবার খৃস্টানদের জন্য বিশেষ করা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে জুমার দিনকে মুসলমানদের জন্য বিশেষ করা হয়েছে। এই দিনের মাঝে মুসলমানদের জন্য কল্যান ও বরকত নিহিত রয়েছে'।

জুমার দিনে কৃত ইবাদতসমূহের জন্য, অন্যান্য দিনে করা ইবাদতের তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বেশি সওয়াব প্রদান করা হয়। জুমার দিনে করা গুনাহের জন্যও দ্বিগুণ লিখা হয়।

জুমার দিনে, রূহসমূহ একত্রিত হয় এবং পরস্পর পরিচিত হয়। কবরসমূহ জিয়ারত করে। এই দিনে কবরের আজাব স্থগিত করা হয়। কোন কোন আলেমের মতে, এরপর আর মুমিন ব্যক্তির আজাব শুরু হয় না। কাফিরের ক্ষেত্রে, জুমা ও রমজান মাস ব্যতীত কিয়ামত পর্যন্ত আজাব চলতে থাকে। এই দিনে কিংবা রাতে মৃত্যুবরণকারী মুমিন ব্যক্তি কবর আজাব ভোগ করে না। জাহান্নাম জুমার দিনে তুলনামূলক কম গরম হবে। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে জুমার দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জুমার দিনেই জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। জান্নাতবাসীগণ আল্লাহ্ তায়ালাকে জুমার দিনে দেখতে পারবে।

জুমা নামাজের ফরজসমূহ:

জুমার দিনে যোহরের ওয়াক্তে ষোল রাকাত নামাজ আদায় করা হয়। এর মধ্যে দুই রাকাত ফরজ। জুমার নামাজ যোহরের ফরজ নামাজের চেয়ে অধিক গুরত্বপূর্ণ। জুমার নামাজের ফরজ হওয়ার জন্য দুই ধরণের শর্ত রয়েছে।

১. আদা' শর্তসমূহ।

২. উজুব শর্তসমূহ।

আদা' শর্তসমূহ থেকে কোন একটির ঘাটতি থাকলে নামাজ কবুল হয় না। উজুব শর্তসমূহ থেকে কোনটি অপূর্ণ থাকলেও নামাজ কবুল হয়।

আদা' অর্থাৎ জুমার নামাজের সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ সাতটি:

১. নামাজ আদায়ের স্থান শহর হতে হবে। (এখানে শহর বলতে বুঝানো হয়েছে এমন জনপদ, যে এলাকায় মুসল্লীগণের জন্য ঐ স্থানের সবচেয়ে বড় মসজিদে স্থান সংকুলান হয় না।)

২. রাষ্ট্রীয় প্রধান অথবা প্রশাসকের অনুমতি সাপেক্ষে নামাজ আদায় করা। তাদের নিযুক্ত খতীব, নিজের বদলে অন্য কাউকে দ্বায়িত্বভার অর্পন করতে পারে।

৩. যোহরের ওয়াক্তের মধ্যেই জুমা নামাজ আদায় করতে হয়।

৪. খুতবাও যোহরের ওয়াক্তের মধ্যে দিতে হবে। (আলেমগণের মতে, জুমার নামাজের খুতবা বলা , নামাজ শুরুর জন্য যে আল্লাহু আকবর বলা হয় তার অনুরূপ।)

অর্থাৎ, জুমার দুই খুতবার প্রত্যেকটিই আরবী ভাষায় দেয়া উচিত। খতীব সাহেব, নীচু স্বরে 'আউজু বিল্লাহ' পড়ে উঁচু স্বরে হামদ ও ছানা, কালিমা-ই শাহাদাত, দুরুদ ও সালাম পাঠ করবে। এরপর সওয়াব অর্জনের এবং আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়সমূহ স্মরণ করিয়ে সংশ্লিষ্ট আয়াত-ই কারিম তিলাওয়াত করবে। অতঃপর বসবে ও পুনরায় উঠে দাঁড়াবে। খুতবার দ্বিতীয় অংশে ওয়াজের বদলে মুমিনদের জন্য দোয়া করবে। এ সময় চার খলীফার নাম উল্লেখ করা তাদের জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব। খুতবার মধ্যে দুনিয়াবী কথাবার্তার মিশ্রণ করা হারাম। খুতবাকে বক্তৃতা কিংবা কনফারেন্সের মত করে বলা উচিত নয়। খুতবাকে সংক্ষিপ্ত করা সুন্নাত। অতি দীর্ঘ করা মাকরূহ।

৫. নামাজের পূর্বেই খুতবা দিতে হয়।

৬. জুমার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতে হয়।

৭. যেই মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করা হবে সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকতে হবে।

জুমার নামাজ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ:

১. শহর অথবা গ্রামে অবস্থান করা, মুসাফির ব্যক্তির জন্য জুমা ফরজ নয়।

২. সুস্থ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়। অসুস্থ ব্যক্তি, রোগীর সার্বক্ষনিক পরিচর্যাকারী ও বৃদ্ধদের উপর জুমা ফরজ নয়।

৩. স্বাধীন হওয়া।

৪. পুরুষ হওয়া, নারীর উপর জুমা ফরজ নয়।

৫. আকেল ও বালেগ হওয়া। অর্থাৎ মুকাল্লিফ হওয়া।

৬. দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন হওয়া। মসজিদে যাওয়ার পথে সাহায্য করার মত কেউ থাকলেও অন্ধ ব্যক্তির উপর জুমা ফরজ নয়।

৭. হাঁটতে সক্ষম হওয়া। কোন গাড়ি বা অন্য কিছুর মাধমে যেতে সক্ষম হলেও পঙ্গু ব্যক্তির জন্য জুমা ফরজ নয়।

৮. বন্দী না হওয়া। জেলে বন্দীর জন্য কিংবা শত্রু, সরকার বা জালিমের ভয়ের কারণে মসজিদে যেতে অপারগ হলে তার উপর জুমা ফরজ নয়।

৯. অতিরিক্ত বর্ষন, তুষারপাত, ঝড়, বন্যা, কাঁদা ও শীত না হওয়া।

জুমার নামাজ আদায়ের পদ্ধতি

জুমার দিনে, যোহরের ওয়াক্তে আযান দেয়ার পর, ষোল রাকাত জুমা নামাজ আদায় করা হয়। এগুলি ধারাবাহিকভাবে নিম্নরূপ:

১. শুরুতে, জুমা নামাজের চার রাকাত ‘কাবলা-ল জুমা’ সুন্নাত আদায় করা হয়। এই **সুন্নাত নামাজ** যোহরের প্রথম চার রাকাত সুন্নাতের মতই আদায় করা হয়। এই নামাজের জন্য এভাবে নিয়্যাত করা হয়, চার রাকাত কাবলাল জুমা সুন্নাত নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কিবলামুখী হয়ে আদায় করার নিয়্যাত করলাম।

২. এরপর, মসজিদের মধ্যে জুমার দ্বিতীয় আযান ও খুতবা পাঠ করা হয়।

৩. খুতবা পেশ করার পর, ইকামত দিয়ে জামাতের সাথে জুমার দুই রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করা হয়।

৪. জুমার ফরজ নামাজ আদায়ের পরে চার রাকাত ‘বা’দাল জুমা’ নামক সুন্নাত নামাজ আদায় করা হয়। এই নামাজ যোহরের প্রথম চার রাকাত সুন্নাতের নিয়মেই আদায় করা হয়।

৫. এরপরে, “শেষ যোহরের চার রাকাত নামাজ যা আমার উপর ফরজ হয়েছে কিন্তু আদায় করা হয় নি তা আদায়ের জন্য” বলে নিয়্যাত করে ‘যোহর-উ আখের’ নামাজ আদায় করা হয়। চার রাকাত বিশিষ্ট এই নামাজ, যোহরের ফরজ নামাজের নিয়মে আদায় করতে হয়।

৬. এরপরে দুই রাকাত ‘ওয়াক্তের সুন্নাত’ নামাজ আদায় করা হয়। এই নামাজ আদায়ের পদ্ধতি ফজরের সুন্নাতের অনুরূপ।

৭. তারপর, ‘আয়াতুল কুরসী’ ও তাসবীহসমূহ পড়ে দোয়া করা হয়।

জুমার দিনের সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ

১. জুমাকে বৃহস্পতিবার থেকেই স্বাগত জানানো ও এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

২. জুমার দিনে গোসল করা।

৩. চুল কাটা, এক মুষ্ঠির চেয়ে অতিরিক্ত দাঁড়ি ছাঁটা, নখ কাটা ও পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা।

৪. জুমার নামাজে যথাসম্ভব আগে উপস্থিত হওয়া।

৫. সামনের কাতারে যাওয়ার জন্য জামাতে উপস্থিত মুসল্লীদের কাঁধ না ডিঙ্গানো।

৬. মসজিদে নামাজরত কারো সামনে দিয়ে অতিক্রম না করা।

৭. খতীব সাহেব মিম্বারে উঠার পর কোন ধরণের কথাবার্তা না বলা। এমনকি কেউ কথা বললে তাকে চুপ করানোর জন্য কিংবা জবাব দেয়ার জন্য ইশারা পর্যন্ত না করা। এসময় আযানের পুনরাবৃতি করাও উচিত নয়।

৮. জুমা নামাজ আদায়ের পরে সূরা ফাতিহা, কাফিরুন, ইখলাস, ফালাক ও নাস্ সাতবার করে পাঠ করা।

৯. সম্ভব হলে আছরের ওয়াক্ত পর্যন্ত মসজিদে থেকে ইবাদত করা।

১০. আহলি সুন্নাত আলেমগণের রচিত কিতাবসমূহ থেকে আলোচনা করা হয় এমন আলেমের দারসে বা ওয়াজে অংশগ্রহণ করা।

১১. জুমার দিন, যথাসম্ভব ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করা।

১২. জুমার দিন রাসূলের প্রতি বেশি বেশি দুরুদ ও সালাম পেশ করা।

১৩. পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। বিশেষ করে ‘**সূরা কাহফ**’ তিলাওয়াত করা।

১৪. দান-সদকা করা।

১৫. মা-বাবা এবং কবর জিয়ারত করা।

১৬. ঘরে বেশি খাবারের ব্যবস্থা করা, মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা।

১৭. বেশি বেশি নামাজ আদায় করা। যাদের ক্বাজা নামাজ রয়েছে তারা ঐ ক্বাজা নামাজ আদায় করবে।

ঈদের নামাজ

শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ‘ফিতর’ অর্থাৎ রোজার ঈদের প্রথম দিন। আর জিলহজ্জ মাসের দশম দিন হল কুরবানীর ঈদের প্রথম দিন। এই দুই দিনে, সূর্যোদয়ের পরের মাকরুহ ওয়াক্ত অতিবাহিত হলে, দুই রাকাত ঈদের নামাজ আদায় করা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব।

ঈদের নামাজের শর্তসমূহ জুমা নামাজের শর্তসমূহের অনুরূপ। কিন্তু এক্ষেত্রে পার্থক্য হল, খুতবা দেয়া সুন্নাত এবং তা নামাজের পরে পেশ করা হয়।

রোজার ঈদে নামাজের পূর্বে মিষ্টান্ন খাওয়া (খেজুরও হতে পারে), গোসল করা, মিসওয়াক ব্যবহার করা, উত্তম পোশাক পরিধান করা, ফিতরা প্রদান করা ও ঈদগাহে যাওয়ার সময় আস্তে আস্তে তাকবীর বলা মুস্তাহাব।

কুরবানীর ঈদে নামাজের পূর্বে কোন কিছু না খাওয়া, নামাজের পরে সর্বপ্রথম কুরবানীর গোশত খাওয়া, নামাজে যাওয়ার সময় উচুস্বরে তাকবীর বলা মুস্তাহাব। কারো উজর থাকলে নিচুস্বরেও তাকবীর বলতে পারে।

ঈদের নামাজ দুই রাকাত। তা জামাতের সাথে আদায় করতে হয়। একাকী আদায় করা যায় না।

ঈদের নামাজ আদায়ের পদ্ধতি

১. প্রথমে, ইমামের অনুসরণ করে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে ঈদের দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ কিবলামুখী হয়ে আদায়ের নিয়্যাত করা নামাজ শুরু করতে হবে। এরপর ছানা অর্থাৎ **‘সুবহানাকা’** পড়তে হবে।

২. সুবহানাকার পরে তিনবার তাকবীর বলে কান পর্যন্ত হাত তুলতে হবে। প্রথম দুইবার হাত তুলে দুই পাশে ছেড়ে দিতে হবে। তৃতীয় তাকবীরের সময় কান পর্যন্ত হাত তুলে পরে নাভির উপরে বামহাতের উপরে ডান হাত স্থাপন করবে। এরপর ইমাম আওয়াজ করে প্রথমে সূরা ফাতিহা ও পরে অন্য আরেকটি সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করবে। অতঃপর একসাথে রুকুতে যাবে। যথারীতি প্রথম রাকাত শেষ করে উঠে দাঁড়াবে।

৩. দ্বিতীয় রাকাতে ফাতিহা এবং অন্যান্য সূরা পড়ার পরে পুনরার তিনবার তাকবীর দিয়ে হাত ছেড়ে দিতে হবে। চতুর্থ তাকবিরে হাত না ছেড়ে আপনাকে রুকুতে যেতে হবে। এই নয় তাকবীর ভুলে না যাওয়ার জন্য মনে রাখতে হবে এভাবে : **“দুইবার হাত ছেড়ে রাখতে হবে এবং আকবার বাধতে হবে, তিনবার ছেড়ে রাখতে হবে অতঃপর বাধতে হবে।”**

তাশরীক তাকবীর:

কুরবানীর ঈদের আরাফা’র দিন ফজরের নামাজ থেকে চতুর্থ দিন আছরের নামাজ পর্যন্ত হাজী হোক বা না হোক, জামাতের সাথে আদায় করুক কিংবা একাকী আদায় করুক প্রত্যেক নারী পুরুষের উপর প্রত্যেক ফরজ নামাজের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে একবার ‘**তাশরীক তাকবীর**’ পাঠ করা ওয়াজিব।

ঐ সময় যদি কোন জানাজার নামাজ আদায় করা হয় তবে তার পরে তাশরীক তাকবীর পড়তে হয় না। মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে কিংবা নামাজের পরে কথা বলার পরে এই তাকবীর পাঠ করা ওয়াজিব নয়।

ইমাম যদি এই তাকবীর দিতে ভুলে যায়, জামাতের মনে থাকলে তারা তা ত্যাগ করবে না। পুরুষগণ উঁচুস্বরে আর নারীরা নিচুস্বরে তাকবীর বলবে।

তাশরীক তাকবীর: **“আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ”**।

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি

মৃত্যুকে স্মরণ করা সবচেয়ে বড় উপদেশ। প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য মৃত্যুকে স্মরণ করা সুন্নাত। এটি বিধি নিষেধ মেনে চলতে এবং পাপ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। এটি মানুষকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে রাখে। আমাদের রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালাম বলেছেন: **" মাঝে মাঝে মৃত্যুকে স্মরণ করো, এটি আমোদ প্রমদ থেকে দূরে রাখে!"** তাসাওফের কিছু মানুষ প্রতিদিন মৃত্যুকে স্মরণ করা অভভাসে পরিনত করেছিলেন। মুহাম্মাদ বাহাউদ্দিন ই বুখারি নিজেকে মৃত মনে করতেন এবং দিনে বিশবার নিজেকে প্রোথিত মনে করতেন।

পৃথিবীর মোহের কারনে মানুষ অনেকদিন বাঁচতে চায়। ইবাদাতের এবং ইসলামের খেদমতের জন্য বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা দুনিয়াবি মোহ নয়। যাদের এই মোহ রয়েছে তারা নির্ধারিত সময়ে ইবাদাত করবে না। তারা তাওবা করবে না পাপ থেকে বাঁচার জন্য, পুনরায় পাপ না করার জন্য, কিংবা আল্লাহ তালার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য। তাদের হৃদয় অভেদ্য। তারা মৃত্যুকে স্মরণ করে না। উৎসাহ এবং উপদেশ তাদের কোন কাজেই আসবে না।

যে ব্যক্তি শুধু পৃথিবীর চিন্তা করে, সে শুধুমাত্র পদ এবং মরজাদার পেছনে দৌড়ায় এবং সেগুলো অরজনের জন্য পুর জীবন কাজ করে যায়। সে তার পদ মর্যাদা এবং প্রাচুর্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং পরবর্তী জীবনের কথা ভুলে যায়। এক হাদিসে বলা হয়েছে:

(মৃত্যুর আগে মর। নিজের হিসেব নিজে নাও, তোমার হিসেব নেয়ার আগে)

(আপনি যা জানেন প্রানিরা তা যদি জানতো মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে, আপনি কোন প্রানিকে ভালোভাবে প্রতিপালিত করতে পারতেন না।)

(যিনি নিয়মিত মৃত্যুকে স্মরণ করেন, সকাল সন্ধ্যা,তারা কিয়ামাতের দিন শহীদদের সাথে থাকবেন।)

পৃথিবীর মোহ সমূহ হচ্ছে, ভালোবাসা এবং প্রমোদে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা, মৃত্যুর চিন্তা থেকে দূরে থাকা, নিজের অল্প স্থায়ী তারুণ্য এবং শরীরে বিশ্বাস করা। এই সকল কারন থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত পৃথিবীর মোহ থেকে বাঁচার জন্য। সকলের জানা উচিত এই সকল মোহের ভয়াবহতা এবং মৃত্যুকে স্মরণ করার সুফল। হাদিস শারিফে বলা হয়েছে: **মাঝে মাঝে মৃত্যুকে স্মরণ করো। মৃত্যুকে স্মরণ করা আপনাকে পাপ থেকে দূরে**

রাখবে এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে রেখে মৃত্যুর পরের আজাব থেকে রক্ষা করে।

মৃত্যু কি?

মৃত্যু মানেই সব কিছুর শেষ নয়। মৃত্যু হচ্ছে শরীর থেকে আত্মার বিচ্ছ্যেদ। এটির মাধ্যমে শরীর থেকে আত্মা আলাদা হয়ে যায়। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ এক জগত থেকে অন্য জগতে যায়। এটি এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি তে যাওয়ার মত। উমার ইবনে আব্দুল আজিজ রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, " তোমাকে অনন্তকালের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তুমি শুধু এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ভ্রমন করবে!" মৃত্যু বিশ্বাসীদের জন্য রহমত এবং পুরস্কার সরূপ। পাপীদের জন্য এটি শাস্তি সরূপ। মানুষ মৃত্যু চায় না। যদিও অপকর্মের চেয়ে মৃত্যুর উপকার বেশি। মানুষ বাঁচতে চায়। যদিও মৃত্যু তার জন্য উপকারী। সত্য বিশ্বাসীরা মৃত্যুর মাধ্যমে মুক্তি পায় পৃথিবীর পরিশ্রম এবং যন্ত্রণা থেকে। নিষ্ঠুরের মৃত্যুর মাধ্যমে দেশ এবং জাতি মুক্তি পায়। একটি পুরাতন কবিতা রয়েছে, নিষ্ঠুর কোন বাক্তির মৃত্যুতে লেখা:

না সে সুখে থাকলো, না তার সাথের মানুষেরা সুখ পেল।
অবশেষে তার সমাপ্তি ঘটেছে, শান্ত হউ, হাঁ তুমি, তার সাথে থাকবে!

কোন বিশ্বাসীর শরীর থেকে আত্মার বের হওয়ার মানে সে যেন বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেল। এক সময় মৃত বিশ্বাসী বাক্তি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরতে চায় না। একজন শাহীদ পুনরায় ফিরতে চান আবার শহীদ হওয়ার জন্য। মৃত্যু প্রত্যেক মুসলিমের জন্য পুরুস্কার সরূপ। একজন বাক্তির বিশ্বাস কেবল মাত্র তার কবরের মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়। কবরের জীবন হয় জান্নাতের বাগান অথবা নরকের অংশবিশেষ।

মৃত্যু অপরিহার্য

মৃত্যু থেকে বাঁচা কি সম্ভব? অবশ্যই না। কেউ নিজের ইচ্ছামত এক সেকেন্ড বাঁচতে পারে না। মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত সময়ে সে মারা যাবে। এই মুহূর্তটি কিছুটা চখের পলক পড়ার সমান। কুরআনে কারিমের একটি আয়াতে বলা হয়েছে: **(যখন মৃত্যুর সময় হয়, তারা এটিকে এক ঘণ্টা পেছাতে বা আগাতে পারে না।) আল্লাহ তালা কোন বাক্তির যেখানে মৃত্যু নির্ধারিত রেখেছেন সেখানেই তার মৃত্যু হবে, সকল সম্পদ এবং সন্তান রেখে যাবেন। আল্লাহ তালা জানেন ঠিক কতবার আমরা দিনে নিঃশ্বাস নেই। এমন কিছু নেই যা তিনি জানেন না। আমাদের জীবন যদি ইবাদাত এবং বিশ্বাসের মাঝে অতিবাহিত হয় তবে, তার শেষ রহমতের হবে। আজরাইল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন: (আমার প্রিয় বান্দাদের যান সহজে কবজ করো আর আমার অপ্রিয় দের**

আজাবের সাথে কবজ করো!) বিশ্বাসীদের জন্য, এটি শুভ সংবাদ। যারা ইমান থেকে দূরে থাকে তাদের জন্য এটি দুঃখের সংবাদ।

জানাজার নামাজ

কোন মুমিন যখন মৃত্যু বরণ করে, তখন এ সংবাদ যারা শুনতে পায় সেসকল পুরুষের উপরে, পুরুষ না থাকলে নারীদের উপরে তার জন্য জানাজা নামাজ আদায় করা ফরজ-ই কিফায়া হয়। জানাজার নামাজ, আল্লাহ্‌র জন্য নামাজ আর মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া স্বরূপ। এই নামাজকে গুরুত্ব না দিলে ঈমান লোপ পায়।

জানাজার নামাজের শর্তসমূহ

১. মৃত ব্যক্তির মুসলমান হতে হবে।

২. মুর্দাকে গোসল করিয়ে নিতে হবে। গোসল না করিয়েই কবরে শায়িত করলে ও উপরে মাটি দিয়ে ঢেকে না দিলে সেখান থেকে তুলে গোসল করিয়ে তারপর জানাজার নামাজ আদায় করতে হবে। যেখানে জানাজা রাখা হবে ও যেখানে ইমাম দাঁড়াবেন সেসব স্থানের পবিত্র হওয়া আবশ্যক।

৩. মুর্দার পুরো শরীর, না থাকলে অর্ধেকের বেশী দেহ কিংবা মাথার বা মাথাবিহীন অর্ধেকের চেয়ে বেশী পরিমাণ দেহ, ইমামের সামনে উপস্থিত রাখা আবশ্যক।

৪. মুর্দাকে মাটিতে অথবা মাটির নিকটে, হাতে ধরে কিংবা পাথরের উপরের রাখা উচিত। মুর্দার মাথা ইমামের ডান দিকে আর পা ইমামের বাম দিকে রাখতে হবে। এর উল্টো করে রাখলে গুনাহ হবে।

৫. জানাজা ইমামের সামনে উপস্থিত রাখতে হবে।

৬. মুর্দার ও ইমামের সতর ঢাকা থাকতে হবে।

জানাজার নামাজের ফরজসমূহ

১. চারবার তাকবীর দেয়া।

২. দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা।

জানাজার নামাজের সুন্নাতসমূহ

১. 'সুবহানাকা' পাঠ করা।

২. দুরুদ শরীফ পাঠ করা।

৩. নিজের, মৃত ব্যক্তির ও সমস্ত মুসলমানদের ক্ষমা ও মাগফেরাতের উল্লেখ আছে এমন দোয়া পাঠ করা।

জানাজার নামাজ মসজিদের ভিতরে আদায় করা যায় না। শিশু জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে মারা গেলে তার নাম রাখতে হবে। পরে গোসল করিয়ে, কাফন পরিয়ে জানাজার নামাজ আদায় করতে হবে।

জানাজা বহনের সময়, খাটিয়ার চার কোণাকে ধরতে হয়। প্রথমে জানাজার মাথার দিক ডান কাঁধে পরে পায়ের দিক ডান কাঁধে এরপর মাথার দিক বাম কাঁধে ও পায়ের দিক বাম কাঁধে রেখে প্রত্যেকে দশ কদম বহন করবে ও এভাবে পরিবর্তন করে কবর পর্যন্ত চলবে। কবরে পৌঁছার পরে লাশ জমিনে না রাখা পর্যন্ত কেউ বসবে না। দাফনের সময় যাদের কাজ থাকবে না তারা বসতে পারবে।

জানাজার নামাজ আদায়ের পদ্ধতি

জানাজার নামাজ চার তাকবীরের দ্বারা আদায় কোয়া হয়। এর প্রত্যেক তাকবীর এক রাকাতের ন্যায়। চার তাকবীরের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময় কান পর্যন্ত হাত তুলতে হয়। পরবর্তী তিন তাকবীরের সময় হাত তুলতে হয় না।

১. প্রথম তাকবীরের পরে হাত বেঁধে **'সুবহানাকা'** পাঠ করতে হয় ও এর সাথে '**ওয়া যাল্লা ছানাউকা'** যোগ করতে হয়। এর সাথে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যায় না।

২. দ্বিতীয় তাকবীরের পরে নামাজের শেষ বৈঠকে যে দুরুদ পড়া হয় তা পড়তে হয়। একে দুরুদে ইবরাহীম বলা হয়। অর্থাৎ, **'আল্লাহুম্মা সাল্লি'** ও '**বারিক**' এই দুরুদটি পাঠ করতে হয়।

৩. তৃতীয় তাকবীরের পরে জানাজার দোয়া পড়তে হয়। (জানাজার দোয়ার বদলে '**রব্বানা আতিনা'** অথবা শুধু '**আল্লাহুম্মাগফিরলাহ**' বললে কিংবা দোয়ার নিয়্যাতে সূরা **ফাতিহা** পাঠ করলেও হবে।)

৪. চতুর্থ তাকবীরের পরে সাথে সাথে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে হয়। সালাম ফিরানোর সময় মুর্দার ও জামাতের প্রতি নিয়্যাত করতে হয়।

ইমাম শুধুমাত্র চার তাকবীর ও দুই দিকে দেয়া সালামকে উঁচুস্বরে বলবে, বাকী সবকিছু নিচুস্বরে বলবে।

তারাবীহের নামাজ

নারী ও পুরুষের জন্য তারাবীহের নামাজ আদায় করা সুন্নাত। রমজান শরীফের প্রত্যেক রজনীতে আদায় করা হয়। জামায়াতের সাথে আদায় করা সুন্নাতে কিফায়া। এর ওয়াক্ত এশার নামাজের পরে ও বিতির নামাজের আগ পর্যন্ত। তবে বিতিরের পরেও আদায় করা যায়। যেমন কেউ তারাবীহের নামাজের একাংশ ইমামের সাথে আদায়ের সুযোগ পেল, পরে ইমামের সাথে

বিতির নামাজও আদায় করল তারপর সে তারাবীহর যে কয় রাকাত আগে বাদ গেছে তা একাকী আদায় করে নিতে পারে।

তারাবীহের নামাজের ক্বাযা নাই। তাই কেউ যদি ক্বাযার নিয়্যাতে আদায় করে তবে তা নফল হিসেবে বিবেচিত হবে। তারাবীহ হবে না। তারাবীহের নামাজ বিশ রাকাত।

তারাবীহের নামাজ আদায়ের পদ্ধতি

শুধুমাত্র রমজান মাসেই বিতির নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা হয়। তারাবীহের নামাজ দুই দুই রাকাত করে, দশ সালামের দ্বারা আদায় করা হয়। প্রত্যেক চার রাকাতের পরে কিছুটা অপেক্ষা করে তাসবীহ পড়তে হয়। এভাবে আদায় করা মুস্তাহাব। যাদের ক্বাযা নামাজ আছে তাদের উচিত অবসর সময়ে এবং পাঁচ ওয়াক্তের সুন্নাত ও তারাবীহের যায়গায় ঐ ক্বাযা নামাজ আদায় করে দ্রুত শেষ করা। এরপর এই নামাজগুলি আদায় করা।

তারাবীহের নামাজ যখন মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা হয় তখন কেউ বাড়িতে একাকী তারাবীহের নামাজ আদায় করলে গুনাহ হবে না, জায়েজ হবে। তবে মসজিদের জামাতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। ঘরে বসে, একাধিক ব্যক্তিকে নিয়ে জামাতের সাথে আদায় করলে, একাকী আদায় করার চেয়ে সাতাশ গুণ অধিক সওয়াব পাবে। প্রত্যেক ইফতিতাহ তাকবীরের সময় নিয়্যাত করা অধিক উত্তম। এশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতে না পারলে তারাবীহের জামাতে যোগ দেয়া যায় না। এর জন্য প্রথমে তাঁকে একাকী এশার ফরজ নামাজ আদায় করতে হবে এরপর সুযোগ থাকলে তারাবীহের নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায়
সফরে নামাজ

হানাফী মাজহাব অনুযায়ী কোন ব্যাক্তি পনের দিনের চেয়ে কম থাকার নিয়তে একশত চার কিলোমিটারের অধিক কোন দূরত্বে গমন করলে মুসাফির হিসেবে গণ্য হয়।

মুসাফিরের শাব্দিক অর্থ হল ভ্রমণকারী বা যাত্রী। মুসাফির ব্যাক্তি চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজগুলির ক্ষেত্রে দুই রাকাত আদায় করে। জামাতে নামাজ আদায়ের সময় ইমাম মুকীম(মুসাফির নয় এমন ব্যাক্তি) হলে তাকে অনুসরন করে পুরো চার রাকাত পড়তে হয়। মুসাফির ব্যাক্তি ইমাম হলে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে। তবে তার অনুসারীদের মাঝে যারা মুকীম তারা সালাম না ফিরিয়ে বাকী দুই রাকাত নামাজ আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে।

মুসাফির ব্যাক্তি চামড়ার মোজার উপরে তিন দিন তিন রাত মাসেহ করতে পারে। রমজানের রোজা ভেঙ্গে পরবর্তীতে ক্বাযা হিসেবে আদায় করতে

পারে। তবে ভ্রমণ কষ্টদায়ক না হলে রোজা রাখা উত্তম। মুসাফির ব্যাক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব হয় না, জুমার নামাজও ফরজ না। জুমার ওয়াক্তে যোহরের নামাজ আদায় করতে হবে। তবে জুমা আদায়ের সুযোগ থাকলে তা পড়তে পারে।

ওয়াক্তের শেষ সময়ে কেউ যদি ঐ ওয়াক্তের নামাজ না আদায় করে সফরে বের হয় তবে সে পরবর্তীতে ঐ নামাজ মুসাফির হিসেবে আদায় করবে অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজের ক্ষেত্রে দুই রাকাত আদায় করবে। কিন্তু যদি ওয়াক্তের শেষ সময়ে ঐ ওয়াক্তের নামাজ না আদায় করে সফর থেকে নিজ আবাসস্থানে ফিরে সেক্ষেত্রে সে মুকীম হিসেবে পুরো নামাজ আদায় করবে।

‘**নিয়ামতে ইসলাম**’ নামক গ্রন্থে বর্নিত আছে যে, নফল নামাজসমূহ পড়ার ক্ষেত্রে সবসময় এবং সবজায়গাতেই দাঁড়িয়ে পড়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বসে পড়া জায়েজ। বসে নামাজ পড়ার সময় রুকু’ করার জন্যে সামনে ঝুকতে হয় আর সেজদার জন্য কপাল মাটিতে রাখতে হয়। তবে কোন ধরনের অপারগতা না থাকা সত্ত্বেও বসে নামাজ আদায় করলে দাঁড়িয়ে আদায় করা নামাজের অর্ধেক সওয়াব অর্জন করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নামাজের সুন্নতসমূহ এবং তারাবীহ এর নামাজ নফলের অন্তর্ভুক্ত। যাত্রাপথে অর্থাৎ শহর কিংবা গ্রামের বাইরে পশুর উপরে (বর্তমান সময়ে যানবাহনে) নফল নামাজ আদায় করা জায়েজ। এক্ষেত্রে কিবলামূখী হওয়া, রুকু ও সেজদা করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে যতটুকু সম্ভব আদায় করা উচিত। সম্ভব না হলে ইশারার মাধ্যমে আদায় করবে। যেমন রুকু’র জন্য শরীরকে সামান্য সামনের দিকে ঝুকাবে আর সেজদার জন্য এর চেয়ে আরো বেশী ঝুকবে। পশুর শরীরে অনেক নাজাসাত লেগে থাকলেও তা নামাজ আদায়ের জন্য মানী’ (অনুপযুক্ত) নয়। নফল নামাজ আদায়ের সময় কেউ ক্লান্তির কারণে লাঠিতে কিংবা মানুষ বা দেয়ালের গায়ে ঠেশ দিয়ে পড়লে তাতে নামাজ ভঙ্গ হয় না। এটা জায়েজ। তবে হাটা অবস্থায় নামাজ আদায় করা শুদ্ধ নয়।

ফরজ ও ওয়াজিব নামাজসমূহ একেবারে বাধ্য না হলে পশুর উপরে আদায় করা জায়েজ নয়। তবে কোন উজর (যুক্তিসংগত কারণ) থাকলে জায়েজ হবে। যেসব উজরের কারণে পশুর উপরে নামাজ আদায় করা জায়েজ সেগুলি হল: জান, মাল কিংবা পশুর বিপদের আশংকা থাকলে, পশু থেকে নেমে নামাজ আদায় করতে গেলে পশু কিংবা সম্পদের চুরি যাওয়ার আশংকা থাকলে, আশেপাশে হিংশ্র জন্তু জানোয়ার কিংবা শত্রু থাকলে, জমিন কর্দমাক্ত হলে, বর্ষন হলে, অসুস্থ ব্যাক্তির উঠানামা করতে গিয়ে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে, সফর সঙ্গীদের অপেক্ষা না করে চলে যাওয়ার কারণে বিপদের আশংকা থাকলে, অন্যের সহযোগিতা ছাড়া পশুতে আরোহণ করা সম্ভব না হলে। সম্ভব হলে পশুকে কিবলামূখী করে থামিয়ে নামাজ আদায় করবে আর সম্ভব না হলে গন্তব্যের দিকে চলতে চলতে আদায় করবে। হাতী বা উটের পিঠে বসার জন্য পালকির মত যে ঘর থাকে তাতেও একই নিয়মে নামাজ আদায় করতে হয়। পশুকে দাঁড়া করিয়ে পালকি খুটির উপরে রাখলে টেবিল,

খাট ইত্যাদির ন্যায় একই হুকুম হবে অর্থাৎ ভূমিতে পড়ার মত হবে। এমতাবস্থায় কিবলামূখী হয়ে স্বাভাবিক নিয়মে নামাজ আদায় করতে হবে। নামার সুযোগ থাকলে ফরজ নামাজগুলি অবশ্যই নিচে নেমে পড়তে হবে।

জলযানে(জাহাজ, নৌকা, বোট ইত্যাদি) নামাজ আদায়ের নিয়ম হযরত জাফর তাইয়ার(রা:)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবসিস্থানে(ইথিওপিয়া) হিজরতের সময় শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তা হল: চলন্ত অবস্থায় জাহাজে অন্য কোন উজর না থাকলেও ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ আদায় করা যায়। জাহাজে জামাতের সাথেও নামাজ আদায় করা যায়। চলন্ত জাহাজেও নামাজ রুকু ও সেজদা সহই আদায় করতে হয়। ইশারায় আদায় করা জায়েজ নয়। কিবলামূখী হওয়াও আবশ্যক। কিবলামূখী হয়ে নামাজ শুরু করবে পরবর্তীতে জাহাজ ঘুরার সাথে সাথে কিবলামূখী হওয়ার জন্য নিজেও ঘুরে দাঁড়াবে। জাহাজে নামাজ আদায়ের জন্য নাজাসাত থেকে পরিপূর্ন পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। ইমাম আজম আবু হানিফা(র:) এর মতে, চলন্ত জাহাজে ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে কোন ধরনের উজর না থাকা সত্ত্বেও বসে আদায় করা জায়েজ হবে।

সাগরের মাঝে নোঙর ফেলে অবস্থানরত জাহাজ যদি খুব দুলতে থাকে তবে চলন্ত জাহাজের নিয়মে আর অল্প দুললে তীরে থাকা জাহাজের নিয়মে নামাজ আদায় করতে হয়। বন্দরে অবস্থানরত জাহাজে ফরজ নামাজ বসে আদায় করা যায় না। যদি জাহাজ থেকে তীরে নামা সম্ভব হয় তবে জাহাজে দাঁড়িয়ে আদায় করাটাও সহীহ (শুদ্ধ) হবে না। স্থলে নেমে আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি জান, মালের ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা জাহাজের বন্দর ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে জাহাজেই দাঁড়িয়ে আদায় করা জায়েজ হবে।

ইবনে আবেদিন বলেন যে: "দুই চাকা বিশিষ্ট গাড়ি যা পশুর সাথে না বাঁধলে স্থিরভাবে সোজা হয়ে থাকতে পারে না তাতে নামাজ আদায়ের নিয়ম পশুর উপরে নামাজ আদায়ের নিয়মের অনুরূপ। তা থামা অবস্থায় হোক কিংবা চলন্ত অবস্থায়। চার চাকা বিশিষ্ট গাড়িতে থেমে থাকা অবস্থায় নামাজ আদায়ের নিয়ম টেবিল, খাট ইত্যাদির উপরে আদায়ের নিয়মের অনুরূপ।

উপরে উল্লেখিত যেসব কারণে পশুর উপরে ফরজ নামাজ আদায় করা জায়েজ ঐসব কারণে গাড়িতেও ফরজ নামাজ আদায় করা যায়। এক্ষেত্রে গাড়ি থামিয়ে কিবলামূখী হয়ে আদায় করতে হয়। যদি গাড়ি থামানো সম্ভব না হয় তবে চলন্ত জাহাজের নিয়মে আদায় করতে হয়"। চলন্ত অবস্থায় যদি কিবলামূখী হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে শাফী' মাজহাবের তাক্বলীদ (অনুসরণ) করে দুই ওয়াক্তের নামাজকে জাম' (একত্রে) করবে। এটাও যদি সম্ভব না হয় তখন তার জন্যে কিবলামূখী হওয়ার শর্ত রহিত হয়। চেয়ারে, আসনে বসে ইশারায় নামাজ আদায় করা কারো জন্যেই জায়েজ নয়। বাসে, বিমানে নামাজ আদায় করার পদ্ধতি গাড়িতে আদায়ের নিয়মের অনুরূপ।

মুসাফির অবস্থায় ফরজ ও ওয়াজিব নামাজসমূহ বাধ্য না হলে পশুর উপরে আদায় করা উচিত নয়। বহনকারী মাধ্যমকে থামিয়ে কিবলামূখী হয়ে

দাঁড়িয়ে আদায় করা উচিত। এজন্যে যাত্রা শুরুর আগেই প্রয়োজনীয় তদবির (ব্যাবস্থা) নেয়া উচিত।

মুসাফির ব্যাক্তি ট্রেনে কিংবা ফেরীতে ফরজ নামাজ আদায়ের সময় কিবলামূখী হয়ে আদায় করবে এবং সম্ভব হলে সেজদার স্থানের পাশে একটি কম্পাস রাখবে। ফেরী বা ট্রেনের দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেকেও কিবলার দিকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। বক্ষ কিবলার দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। বাসে, ট্রেনে, ঝড়ের সময় সাগরে কিবলামূখী হওয়া সম্ভব না হলে ফরজ নামাজ আদায় করাও শুদ্ধ হয় না। যারা এ অবস্থার সম্মুখীন তারা যতক্ষন সফরে থাকবেন ততক্ষন শাফী' মাজহাবের তাক্বলীদ করে যোহরের সাথে আছরের নামাজকে এবং মাগরিবের সাথে এশার নামাজকে জাম' (একত্রিত) করে আদায় করতে পারবেন। অর্থাৎ মুসাফির অবস্থায় উল্লেখিত দুই ওয়াক্তের নামাজকে একসাথে পরপর আদায় করে নিবে। কেননা শাফী' মাজহাব অনুযায়ী আশি কিলোমিটারের অধিক পথ ভ্রমণকারী মুসাফির হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সে আছরকে যোহর নামাজের ওয়াক্তে ও এশার নামাজকে মাগরিবের ওয়াক্তে তাক্বদীম করে (এগিয়ে এনে) আদায় করতে পারে। কিংবা সুবিধা অনুযায়ী যোহরকে আছরের নামাজের ওয়াক্তে ও মাগরিবকে এশার নামাজের ওয়াক্তে তা'খির (বিলম্বিত) করেও আদায় করতে পারে। একারণে হানাফী মাজহাবের অনুসারী কোন ব্যাক্তির পক্ষে যদি মুসাফির অবস্থায় কিবলামূখী হয়ে নামাজ আদায় করা সম্ভব না হয় তবে দিনের বেলা (দুপুরের পরে) কোথাও যাত্রা বিরতি হলে যোহরের নামাজ আদায়ের সাথে সাথে আছরের নামাজও আদায় করে নিবে। আর সন্ধ্যার পরে রাতে যখনি যাত্রা বিরতি পাবে তখনি প্রথমে মাগরিব ও পরেই এশার নামাজ আদায় করে নিবে। শাফী' মাজহাবের অনুসরণ করে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে নিয়্যাতের সময়ে তা উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ মনে মনে '**আমি শাফী' মাজহাবের অনুসরণ করে নামাজ আদায় করছি**' বলবে। সফরে বের হওয়ার পূর্বে কিংবা সফর সমাপ্তির পরে দুই ওয়াক্তের নামাজকে জাম' (একত্রিত) করে আদায় করা জায়েজ নয়।

অসুস্থ অবস্থায় নামাজ

যে সব কারণে অজু ভঙ্গ হয় তা যদি বিরামহীনভাবে কারো মাঝে প্রকাশিত হতে থাকে তবে তা শরীয়ত অনুযায়ী **উজর** (যুক্তি সঙ্গত কারণ) হিসেবে বিবেচিত হবে। কারো যদি কোণ নামাজের ওয়াক্তের পুরো সময় ধরে বিরামহীনভাবে প্রস্রাব বের হয়, পিছনের রাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গমন হয়, নাক দিয়ে রক্ত ঝরে, চোখে ব্যাথা থাকায় পানি পরে, শরীরের কোন ক্ষত থেকে রক্ত বের হয় কিংবা ফোঁড়া থেকে পুঁজ বের হয় তবে সে উজরওয়ালা ব্যাক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। যে সব মহিলার ইস্তিহাজার রক্ত বের হতে থাকে সেও উজরওয়ালা হিসেবে বিবেচিত হয়। যে সব কারণে অজু ভঙ্গ হয় তা থেকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যেমন, ওষুধ

ব্যাবহার করে, ব্যান্ডেজ লাগিয়ে, প্যাড ব্যবহারের মাধ্যমে অথবা বসে কিংবা ইশারায় নামাজ আদায়ের মাধ্যমে ঐ অবস্থা থেকে সাময়িকভাবে পরিত্রান পেতে পারে। যে সমস্ত পুরুষের প্রস্রাব অল্প অল্প করে অবিরাম ঝরতে থাকে তারা প্রস্রাবের রাস্তা তুলা, টিস্যু জাতীয় কোন কিছু দিয়ে বন্ধ করে দ্রুত অজু করে নামাজ আদায় করবে। পরে তা খুলে ফেলবে। তুলা বা টিস্যু ভিজে প্রস্রাব বাইরে না আসা পর্যন্ত অজু ভঙ্গ হয় না তাই উজর থেকে মুক্তি পাবে। তবে যদি কিছুটা বেশী পরিমাণে বের হয় যা তুলা বা টিস্যু ভিজিয়ে বাইরে চলে আসে তবে অজু ভেঙ্গে যাবে। খেয়াল রাখা উচিত প্রস্রাব যেন পোশাকে লেগে নাপাক করে না দেয়। কোন উপায়েই যারা উজর থেকে মুক্তি পেতে পারে না তারা প্রত্যেক নামাজের ওয়াক্তের জন্য নতুন করে অজু করে তারপর নামাজ আদায় করবে। উজরওয়ালা ব্যাক্তিরা এক অজু দিয়ে ঐ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফরজ, ক্বাযাসহ যত খুশি নফল নামাজ আদায় করতে পারবে, কুরআন করীম তিলাওয়াত করতে পারবে। তবে ঐ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তার অজু ভেঙ্গে যাবে। নতুন করে নতুন ওয়াক্তের জন্য অজু করে নিতে হবে। যেই ওয়াক্তে অজু করা হয় সেই ওয়াক্তেও যদি উজরের কারণ ব্যাতীত অজু ভঙ্গের অন্য কোন কারণ প্রকাশ পায় সেক্ষেত্রেও উজরওয়ালার অজু ভঙ্গ হয়। যেমন, কারো নাকের এক ফুটা থেকে অবিরাম রক্ত ঝরার কারণে উজরওয়ালা বিবেচিত হওয়ায় অজু করার পর নাকের ঐ ফুটা দিয়ে রক্ত ঝরা স্বত্বেও তার অজু ভঙ হয় না। কিন্তু যদি নাকের অন্য ফুটা দিয়ে সামান্য রক্তও ঝরে সাথেসাথেই তার অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

উজরওয়ালা বিবেচিত হওয়ার জন্য, যে সব কারণে অজু ভঙ্গ হয় তা এক নামাজ ওয়াক্তের পুরো সময় জুড়ে সংঘটিত হতে হয়। যদি অজু করে ওয়াক্তের ফরজ নামাজটুকু আদায় করার মত সময় অজু ভঙ্গের কারণ বন্ধ থাকে তবে ব্যাক্তি উজরওয়ালা বিবেচিত হবে না। ইমাম মালিকের একটি মত অনুযায়ী এক ফোটা প্রবাহিত হলেও উজরওয়ালা বিবেচিত হবে। উজরওয়ালা কোন ব্যাক্তির উজর যদি পরবর্তী ওয়াক্তে একবারের জন্যও প্রকাশ পায়, এক ফোঁটাও যদি প্রবাহিত হয় তবে সেই ওয়াক্তের জন্যও সে উজরওয়ালা বিবেচিত হবে। যদি পরবর্তী কোন ওয়াক্তে একবারের জন্যও উজর প্রকাশ না পায় তবে ব্যাক্তি আর উজরওয়ালা বিবেচিত হবে না। উজরের কারণে যদি পোশাকে এক দিরহাম পরিমানের চেয়ে অতিরিক্ত নাজাসাত লাগে এবং পুনরায় নাজাসাত লাগা থেকে পোশাককে রক্ষা করা সম্ভব হলে, যে স্থানে নাপাকী লেগেছে তা ধুয়ে ফেলা আবশ্যক।

ফরজ গোসল আদায় করলে যদি রোগাক্রান্ত হওয়ার কিংবা রোগের তীব্রতা বৃদ্ধির অথবা রোগ থেকে মুক্তি পেতে বিলম্ব হওয়ার আশংকা থাকে তবে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে হয়। এই আশংকা যথার্থই কিনা তা ব্যাক্তির অতীত অভিজ্ঞতা থেকে কিংবা সৎ মুসলমান চিকিৎসকের পরামর্শ থেকে প্রতীয়মান হবে। অমুসলিম কিন্তু সৎ ও পেশাদার চিকিৎসকের মতামত অনুযায়ীও আশংকার যথার্থতা সাব্যস্ত হয়। আবহাওয়া অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হলে,

তীব্র শীতের সময়ে গোসলের পানি গরম করার ব্যাবস্থা না থাকায় ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করলে অসুস্থ হওয়ার আশংকা থাকে। হানাফী মাজহাব অনুযায়ী এক তায়াম্মুম দিয়ে যত ইচ্ছা তত ফরজ নামাজ আদায় করা সম্ভব যদি তায়াম্মুম ভঙ্গ না হয়। কিন্তু শাফী ও মালিকী মাজহাব অনুযায়ী প্রত্যেক ফরজ নামাজের জন্য নতুন করে তায়াম্মুম করতে হয়।

অজুতে যেসব অঙ্গ ধৌত করতে হয় তার অর্ধেকে যদি ক্ষত থাকে তবে তায়াম্মুম করতে হয়। যদি ক্ষত অর্ধেকের কম অঙ্গে থাকে তবে সুস্থ অঙ্গসমূহ ধৌত করে ক্ষতস্থানে মাসেহ করতে হবে। ফরজ গোসলের ক্ষেত্রে সম্পূর্ন শরীর একটি অঙ্গ হিসেবে বিবাচিত হওয়ায় শরীরের অর্ধেক বা তার বেশী স্থানে ক্ষত থাকলে তায়াম্মুম করতে হয়। ক্ষতের পরিমাণ শরীরের অর্ধেকের চেয়ে কম হলে, সুস্থ অংশ ধৌত করে ক্ষতস্থানে মাসেহ করতে হয়। ক্ষতস্থানে মাসেহ করাতে ক্ষতির আশংকা থাকলে ব্যান্ডেজের উপর দিয়ে মাসেহ করতে হবে। তাতেও ক্ষতির আশংকা থাকলে মাসেহ করা থেকে বিরত থাকবে। অজু ও গোসলের সময়ে মাথা মাসেহ করতে গিয়া ক্ষতির আশংকা থাকলে মাসেহ করতে হবে না। কারো হাতে ক্ষত থাকার কারণে পানি ব্যাবহারে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করবে। এরজন্য তার মুখমণ্ডল ও দুহাতকে দেয়ালে, পাথরে কিংবা মাটি জাতীয় কোন কিছুতে ঘষে তায়াম্মুম করে নিবে। কারো যদি হাত পা কাটা থাকে আর মুখমণ্ডলে ক্ষত থাকে তবে সে অজুবিহীন অবস্থাতেই নামাজ আদায় করবে।

কোন ব্যাক্তি নিজে নিজে অজু করতে অপারগ হলে এবং তাকে অজু করিয়ে দেয়ার মত কাউকে খুজে না পেলে তায়াম্মুম করবে। তার নিজের সন্তান, দাস কিংবা অর্থের বিনিময়ে সেবাদানকারী ব্যাক্তি তাকে অজু করার জন্য সাহায্যের হাত বারিয়ে দিতে বাধ্য। এদের কাউকে না পেলে অন্যদের নিকট সাহায্য চাইবে। তবে অন্য কেউ তাকে সাহায্য করতে বাধ্য নয়। এমনকি স্বামী-স্ত্রীও একে অপরকে অজুর ব্যাপারে সাহায্য করতে বাধ্য নয়।

যাদের শরীরে ক্ষতের জন্য ব্যাণ্ডেজ আছে কিংবা হাড্ডিতে ভাঙ্গন অথবা চিড় ধরার কারণে প্লাস্টার করা হয়েছে তারা অজু গোসলের সময় যখন তা পানি দিয়ে ধৌত করতে অপারগ হবে তখন তার উপরে মাসেহ করে নিবে। যদি পুরো অংশে মাসেহ করতে অপারগ হয় তবে এর অর্ধেকের চেয়ে বেশী অংশে একবার মাসেহ করবে। ব্যান্ডেজ খুললে ক্ষতির আশংকা থাকলে এর নিচে থাকা সুস্থ চামড়া ধৌত করতে হবে না। তবে ব্যান্ডেজের ফাঁক দিয়ে যতটুকু ভাল চামড়া দেখা যায় সেখানে মাসেহ করে নিতে হবে। অজু অবস্থায় ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে এমন কোন শর্ত নাই। মাসেহ করার পর ব্যান্ডেজ পরিবর্তন করে আরেকটি লাগানো হলে নতুনটির উপরে পুনরায় মাসেহ করার প্রয়োজন নাই।

কারো যদি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করার কারণে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকে কিংবা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়ে অক্ষম হলে, বসে নামাজ আদায় করবে। রুকুর জন্য শরীরকে সামান্য সামনের দিকে ঝুকাবে অতঃপর সোজা হবে। সেজদা স্বাভাবিক নিয়মেই আদায় করবে। আর যেভাবে বসলে সুবিধা হয়

সেভাবেই বসবে। হাটু ভেঙ্গে, পা বিছিয়ে কিংবা পাছার উপরেও বসতে পারে। মাথা ব্যাথা, দাঁত ব্যাথা, হাটু ব্যাথা, চোখের ব্যাথা ইত্যাদি সবই রোগ হিসেবে গণ্য হবে। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আশংকাও উজর হিসেবে বিবেচিত হবে। দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে গেলে যার অজু ভেঙ্গে যায় সে বসে আদায় করবে। কোন কিছুতে ভর করে যদি দাঁড়িয়ে আদায় করা সম্ভব হয় তবে দাঁড়িয়েই নামাজ আদায় করবে। যদি কারো পক্ষে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব না হয় তবে সে তাক্বীর-ই তাহরীমার সময় দাঁড়াবে পরবর্তীতে ব্যথা বাড়লে বাকী নামাজ বসে আদায় করবে।

ভূমিতে সেজদা করতে অক্ষম হলে দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করবে, রুকু করবে এবং পরে সেজদার জন্য বসে যথাসম্ভব মাথা ঝুঁকিয়ে ইঙ্গিতের মাধ্যমে আদায় করবে। বসে নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি রুকুর জন্য সামান্য আর সেজদার জন্য তার চেয়ে বেশী ঝুঁকবে। উঁচু কোন কিছুর উপরে সেজদা করা জরুরী নয় বরং মাকরুহ। তবে উঁচু কোন কিছুর উপরে সেজদা করলে আর তাতে রুকুর চেয়ে অধিক ঝুঁকা হলে নামাজ সহীহ হবে। কোন কিছুতে হেলান দিয়ে বসে নামাজ আদায় করা সম্ভব হলে শুয়েশুয়ে ইশারার মাধ্যমে আদায় করা জায়েজ হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা এক অসুস্থ সাহাবীকে যিয়ারতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, সাহাবী হাত দিয়ে একটি বালিশ তুলে তাতে সিজদা করছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালিশটি নিয়ে নিলেন। তখন সাহাবী একটি কাঠ তুলে তাতে সিজদা করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কাঠটিও নিয়ে নিলেন এবং বললেন, "**সামর্থ্য থাকলে জমিনে সিজদা কর। জমিনে সিজদা করতে না পারলে, কিছু মুখের কাছে তুলে তার উপর সিজদা কর না। তখন ইশারায় নামাজ পড় ও সিজদায়, রুকুর চেয়ে অধিক ঝুঁক**"।

'**বাহরুর-রাইক**' নামক কিতাবে, সূরা আলে ইমরান'এর একশ একানব্বইতম আয়াতে করীমার ভাবার্থে বলা হয়েছে যে, '**যার সামর্থ্য আছে সে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করবে, অক্ষম হলে বসে পড়বে, তাতেও অক্ষম হলে শুয়ে পড়বে**'। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু যখন অসুস্থ হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "**দাঁড়িয়ে নামাজ পড়, এতে অক্ষম হলে বসে পড়, তাতেও যদি সামর্থ্য না থাকে তবে পাশ ফিরে কিংবা চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ আদায় কর**"। অতএব, বুঝা যাচ্ছে যে, অসুস্থ ব্যক্তির কিংবা বাসে, ট্রেনে, বিমানে ভ্রমণকারী ব্যক্তির চেয়ারে বা আসনে বসে নামাজ আদায় করাটা, শরীয়ত অনুযায়ী হয় না। মসজিদের মধ্যে চেয়ার বা আসনে বসে, ইশারার মাধ্যমে নামাজ আদায় করা জায়েজ নয়। ইসলামিয়্যাত যা অবহিত করেনি, সেভাবে ইবাদত করা **বিদায়াতের** শামিল। আর বিদায়াতের কাজ করা কবীরা গুনাহ, এ ব্যাপারে ফিকাহের কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে।

অসুস্থ ব্যক্তি যদি কোন কিছুতে ভর দিয়েও বসতে অক্ষম হয় তবে চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ আদায় করবে, চিৎ হয়ে শুতে না পারলে ডান কাঁত হয়ে শুয়ে

মাথার দ্বারা ইশারা করে নামাজ আদায় করবে। চিৎ হয়ে শোয়া ব্যক্তির মাথার নিচে কিছু রেখে, চেহারাকে কিবলামুখী করে দিতে হবে। এসময় হাঁটু খাঁড়া করে রাখা উত্তম।

কেউ যদি মাথা দিয়েও ইশারা করে নামাজ আদায়ে অক্ষম হয় তবে সে ঐ অবস্থার নামাজগুলিকে ক্বাযা করা জায়েজ হবে। নামাজরত অবস্থায় কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে, বাকী নামাজ যেভাবে সামর্থ্য হয় সেভাবে আদায় করবে। বসে নামাজ আদায়কারী অসুস্থ ব্যক্তি নামাজরত অবস্থায় সুস্থ হলে, বাকী নামাজ সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে আদায় করবে। যার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে কিংবা জ্ঞান হারায়, তার নামাজ আদায় করতে হয় না। এই অবস্থা থেকে পাঁচ ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই স্বাভাবিক হলে ঐ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ক্বাযা করতে হবে। ঐ অবস্থা যদি পাঁচ ওয়াক্তের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয় তবে সেই ওয়াক্তগুলির নামাজ ক্বাযা আদায় করতে হবে না।

ইশারার দ্বারাও যে সমস্ত নামাজ আদায় করা সক্ষম হয়নি, অতি দ্রুত সেগুলির ক্বাযা আদায় করা ফরজ। ক্বাযা আদায়ের পূর্বেই ব্যক্তির মৃত্যু হলে, যত ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা হয়নি সেগুলির জন্য রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে 'ফিদিয়া' দেয়ার জন্য অসিয়ত করে যাওয়া তার জন্য ওয়াজিব হবে। ঐ ব্যক্তি যদি অসিয়ত করে না যায়, তবুও ওয়ারিশগণের জন্য এমনকি অন্য যে কারো জন্য নিজেদের সম্পদ থেকে তার নামাজের ইসকাত করা জায়েজ হবে বলে উল্লেখ আছে।

ক্বাযা নামাজ

নামাজ একটি শারীরিক ইবাদত হওয়ার কারণে, কেউই অন্য কারো বদলে আদায় করতে পারে না। প্রত্যেককেই নিজের নামাজ আদায় করতে হয়, এটা সকলের জন্যই ফরজ। ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ পড়াকে **'আদা'** বলা হয়। যে কোন সময় তা পুনরায় পড়াকে **'ইয়াদা'** বলা হয়। যেমন, কোন নামাজ আদায় করা হয়েছে, কিন্তু মাকরুহ হয়েছে, এমতাবস্থায় ঐ নামাজ ঐ ওয়াক্তের মধ্যেই সম্ভব না হলে যে কোন সময় তার 'ইয়াদা' করা ওয়াজিব। ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ, এর জন্য নির্ধারিত ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পরে আদায় করাকে **'ক্বাযা'** বলা হয়।

একদিনের পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ ও বেতেরের ওয়াজিব নামাজ আদায়ের সময় যেমন ধারামাহিকতা বজায় রাখতে হয়, একইভাবে এর ক্বাযা নামাজ আদায়ের সময়ও তারতীব বজায় রাখতে হয়। অর্থাৎ নামাজের ওয়াক্তের ক্রমধারা অনুসরণ করে আদায় করতে হবে। যার পাঁচ ওয়াক্তের বেশী ক্বাযা হয় নাই তাকে '**সাহিবুত তার্তীব**' বলা হয়। জুমার ফরজ ক্বাযা হলে যোহরের নামাজের ক্রম অনুযায়ী আদায় করতে হবে। জুমার দিনে ফজরের নামাজ ক্বাযা হলে আর খুৎবার সময় তা স্মরণ হলে, তৎক্ষণাৎ এর ক্বাযা আদায় করে নিতে হবে। এক ওয়াক্তের ক্বাযা না আদায় করা পর্যন্ত পরের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা জায়েজ নয়। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, "**কোন ওয়াক্তের**

নামাজ ঘুমিয়ে থাকার কারণে কিংবা ভুলে যাওয়ার কারণে ক্বাযা হওয়ার পর, পরের ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সাথে আদায়ের সময় তা স্মরণে আসলে, ইমামের সাথে ঐ নামাজ শেষ করে প্রথমে আগের ওয়াক্তের ক্বাযা আদায় করবে। তারপর ইমামের সাথে যে নামাজ আদায় করেছিল তা পুনরায় পড়বে”।

ফরজের ক্বাযা করা ফরজ, একইভাবে ওয়াজিবের ক্বাযা করা ওয়াজিব। তবে সুন্নাতের ক্বাযা করার জন্য বলা হয়নি। হানাফী মাজহাবের আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সুন্নাত নামাজ কেবলমাত্র নিজ ওয়াক্তের মধ্যেই আদায় করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। ওয়াক্তমত সুন্নাত নামাজ আদায় না করলে তা আর ঋণ হিসেবে বিবেচিত হয় না। একারণেই ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পরে সুন্নাতের ক্বাযা করতে হয় না। তবে ফজরের সুন্নাত ওয়াজিবের কাছাকাছি হওয়ায়, ঐ দিন যোহরের পূর্বে ফরজের সাথে ক্বাযা করতে হয়। ফজরের সুন্নাত ঐ দিনের যোহর ওয়াক্তের পরে আর অন্য সুন্নাতগুলি নিজ ওয়াক্তের পরে কখনোই ক্বাযা করতে হয় না। কেউ ক্বাযা হিসেবে আদায় করলে তাতে সুন্নাতের সওয়াব অর্জিত হবে না, নফল হিসেবে বিবেচিত হবে।

হযরত **ইবনে আবেদীন** রহমতুল্লাহি আলাইহি তার **‘তারগীবুস্ সালাত’** নামক কিতাবের ১৬২তম পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, “বিনা উজরে সুন্নাত নামাজ বসে বসে আদায় করা জায়েজ। একদম আদায় না করলে গুনাহ হবে। ফরজের ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র উজর থাকলে বসে আদায় করা জায়েজ হবে”।

ফরজ নামাজসমূহ বিনা উজরে, ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা কবীরা গুনাহ। ওয়াক্তমত এরূপ যত নামাজ আদায় করা হয়নি তার ক্বাযা করা আবশ্যক। ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ, দুই ধরণের উজরের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্বাযা করা যায়। তার একটি হল শত্রুর মুখোমুখি থাকা অবস্থায়, আর দ্বিতীয়টি হল সফরে থাকা অবস্থায়, এক্ষেত্রে তিন দিনের অধিক দূরত্ব অতিক্রমের নিয়্যাত না থাকলেও পথে চোর-ডাকাত, হিংস্র পশু, ঝড়-বন্যা ইত্যাদির আশঙ্কা থাকলে নামাজ ক্বাযা করা যায়। তবে শর্ত হল, উপরোক্ত অবস্থাগুলিতে বসে বা যেকোন দিকে ফিরে কিংবা পশুর পিঠে চলন্ত অবস্থায় ইঙ্গিতের দ্বারাও যদি নামাজ আদায়ে সক্ষম না হয়, সেক্ষেত্রে ক্বাযা করতে পারবে। এই দুই অবস্থায় এবং ঘুম ও ভুলের কারণে নামাজ ক্বাযা হলে গুনাহ হবে না।

‘আশবাহ্’ কিতাবের (ব্যাখ্যায়) বলা হয়েছে যে, কারো ডুবে বা অন্য কোন কারণে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলে, তাকে সেই অবস্থা থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে যেয়ে ঐ ওয়াক্তের নামাজ ক্বাযা হিসেবে আদায় করলে সহীহ হবে। তবে ঐ অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সাথে সাথেই ক্বাযা করা ফরজ।

নামাজ পড়া হারাম দিনের এমন তিন ওয়াক্ত বাদে অন্য সময়ে আদায় করবে এই শর্তে, বৌ-সন্তানদের অতি জরুরী রিজিক অন্বেষণের জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন ততটুকু সময় বিলম্ব করে নামাজ আদায় করা জায়েজ। তবে

এর চেয়ে বেশী বিলম্ব করলে গুনাহ হবে। কেননা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের তীব্রতার জন্য যে চার ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারেননি, তা যুদ্ধের তীব্রতা কমার সাথে সাথে ঐ রাতেই সাহাবীদের নিয়ে জামাতে ক্বাযা আদায় করেছিলেন। যদিও ঐ সময়ে সাহাবীগণের প্রত্যেকেই খুব ক্লান্ত ছিলেন এমনকি অধিকাংশই আহত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "**দুই ফরজ নামাজকে একত্রিত করা কবীরা গুনাহ**"। অর্থাৎ এক ওয়াক্তের নামাজকে সময়মত আদায় না করে ঐ ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পরে আদায় করা কবীরা গুনাহ। অপর আরেকটি হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে, "**কোন নামাজকে যদি কেউ এর ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পরে আদায় করে, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে আশি 'হুকবা' জাহান্নামের আযাব দিবেন**"। এক 'হুকবা' হল আখেরাতের আশি বছর আর আখিরাতের একদিন হল দুনিয়ার হাজার বছরের সমান। এক ওয়াক্ত নামাজ ক্বাযা করার শাস্তি যদি এরূপ ভয়াবহ হয় তবে যে নামাজ আদায়ই করল না তার কি শাস্তি হতে পারে তা চিন্তা করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "**নামাজ হল দ্বীনের স্তম্ভ। যে নামাজ আদায় করল সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করল, আর যে নামাজ আদায় করল না সে দ্বীনকে ধ্বংস করল**"। আরেকটি হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে, "**কিয়ামতের দিন, ঈমানের পরে সর্বপ্রথম নামাজ সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে**"। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন যে, "**হে আমার বান্দা, যদি নামাজের হিসাব ঠিকমত দিতে পার তবে মুক্তি তোমার হবে। কেননা অন্যান্য হিসাবগুলি আমি সহজ করে দিব**"। সূরা আনকাবুতের পঁয়তাল্লিশতম আয়াতে বলা হয়েছে যে, "**ত্রুটিহীনভাবে আদায়কৃত নামাজ, মানুষকে অনিষ্ঠ ও অশ্লীল কাজকর্ম করা থেকে বিরত রাখে**"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "**মানুষ তার রবের সবচেয়ে বেশী নিকতবর্তী তখনই হতে পারে যখন সে নামাজ আদায় করে**"।

একজন মুসলমানের কোন ওয়াক্তের ফরজ নামাজ ত্যাগ করা দুইভাবে হতে পারে। ১. শরয়ী কোন উজরের কারণে ক্বাযা করতে পারে। ২. নামাজকে ফরজ হিসেবে জানা সত্ত্বেও, গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও অলসতার কারণে ত্যাগ করতে পারে।

কোন ফরজ নামাজকে বিনা উজরে তার ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পরে আদায় করা অর্থাৎ ক্বাযা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। ঐ নামাজের ক্বাযা আদায়ের দ্বারা গুনাহ থেকে মাফ পাওয়া যায় না। তবে ক্বাযা আদায় করলে, শুধুমাত্র নামাজ আদায় না করার গুনাহ থেকে মাফ পেতে পারে। কেউ যদি নামাজের ক্বাযা আদায় না করে শুধুমাত্র তওবা করে তবে মাফ পাবে না। ক্বাযা আদায়ের পরে তওবা করলে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়। তওবা করার সময় ক্বাযা নামাজগুলি আদায় করা আবশ্যক। ক্বাযা আদায়ের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও,

আদায় না করলে তা আলাদাভাবে আরেকটি কবীরা গুনাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই কবীরা গুনাহ প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সময় (প্রতি ছয় মিনিট) অতিবাহিত হওয়ার সাথসাথে, ধাপে ধাপে বৃদ্ধি হতে থাকে। কেননা ক্বাযা নামাজ, খালি সময় পাওয়ার সাথে সাথে আদায় করা ফরজ। ক্বাযা আদায়ের ব্যাপারে অবহেলা করলে জাহান্নামের আজাব ভোগ করতে হবে।

'উমদাতুল ইসলাম' ও **'জামিউল ফাতাওয়া'** কিতাবে বলা হয়েছে যে, 'শত্রুর মুখোমুখি থাকা অবস্থায়ও যদি কোন ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করার সুযোগ থাকে আর তা ত্যাগ করা হয়, তবে সাতশ কবীরা গুনাহ করার মত পাপ হবে'। ক্বাযা আদায়ের ক্ষেত্রে বিলম্ব করাও নামাজ ওয়াক্ত মত আদায় না করার অনুরূপ কবীরা গুনাহ। কোন নামাজের প্রথম ক্বাযা আদায়ের নিয়্যাত করে একটির ক্বাযা আদায়ের সাথে সাথে, এই সমস্ত গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে।

সুন্নাত নামাজের বদলে ক্বাযা আদায়:

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী কুদ্দিসা সিররুহু তাঁর' **ফুতুহুল গায়িব '** নামক কিতাবে বলেছেন যে ,মুমিনের সর্বপ্রথম ফরজসমূহ আদায় করা আবশ্যক। ফরজ আদায় সম্পন্ন হলে, সুন্নাতসমূহ আদায় করবে। তারপর নফলসমূহ পালনে সচেষ্ট হবে। ফরজের ঋণ বাকী থাকা অবস্থায় সুন্নাত আদায়ের জন্য মশগুল হলে বোকামি হবে। কোন ইবাদতের ফরজ আদায় না করে সুন্নাত আদায় করলে তা কবুল হয় না। হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ননা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "**ফরজ বাকী রয়ে গেছে এমন ব্যক্তি এর ক্বাযা আদায় না করে নফল পালন করলে তা অর্থহীন পরিশ্রম করা হবে। ঐ ব্যক্তি ফরজের ক্বাযা আদায় না করা পর্যন্ত, আল্লাহ্ তায়ালা তার নফল নামাজ কবুল করবেন না"।**

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক উদ্‌ধৃত এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় হানাফী মাজহাবের বিখ্যাত আলেম হযরত আব্দুল হক্ব দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, উক্ত খবরের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যার ফরজের ঋণ রয়েছে তার সুন্নাত ও নফলসমূহ কবুল হয় না। আমরা জানি যে, সুন্নাত ফরজকে পূর্নতা দান করে। এর অর্থ হল, ফরজ আদায়ের সময় এর কামালাত বা পরিপূর্ণতা অর্জনের সবব হবে এমন কোন কিছুর ঘাটতি হলে, সুন্নাতসমূহ ঐ ফরজের কামাল (পূর্ণ) হওয়ার সবব হয়। যার ফরজই আদায় হয়নি তার জন্য এর সাথে সম্পর্কিত সুন্নাতসমূহ আদায় করা কোন কাজে আসবে না।

বাইতুল মুকাদ্দাস যেখানে অবস্থিত সেই কুদুস নগরীর কাজী হযরত মুহাম্মদ সাদিক রহমতুল্লাহি আলাইহি, ছুটে যাওয়া (ফায়িতা) নামাজের ক্বাযা আদায়ের ব্যাপারে বুঝানোর সময় বলেছেন, বিখ্যাত আলেম হযরত ইবনে

নুযাইম রহমাতুল্লাহি আলাইহি’কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কারো যদি নামাজ ক্বাযা হয়ে থাকে আর সে ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার সুন্নাতসমূহকে ক্বাযা নামাজ আদায়ের নিয়্যাত করে পড়লে, ঐ ব্যক্তি সুন্নাত ত্যগকারী হিসেবে বিবেচিত হবে কি? এর জবাবে তিনি বলেছিলেন, সে সুন্নাত ত্যাগকারী হিসেবে বিবেচিত হবে না। কেননা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সুন্নাতসমূহ আদায়ের মাকসাদ্ (উদ্দেশ্য) হল, ঐ ওয়াক্তের মধ্যে ফরজ বাদেও অন্য কোন নামাজ আদায় করা। শয়তানের ইচ্ছা হল, কেউ যেন কোন নামাজ আদায় না করে। এজন্য ফরজ বাদেও ওয়াক্তের মধ্যে আরেক নামাজ আদায়ের দ্বারা মূলত শয়তানের ইচ্ছাকে পদদলিত করা হয়, তাকে অপদস্ত করা হয়। সুন্নাতের বদলে ক্বাযা নামাজ আদায় করলে, সুন্নাতের মাকসাদ্ও পূর্ণ হয়। একারণে, যার ক্বাযা নামাজ রয়েছে তার উচিত প্রত্যেক ওয়াক্তে ঐ ওয়াক্তের ফরজ নামাজ আদায়ের পরে অন্য নামাজ আদায়ের দ্বারা সুন্নাতের মাকসাদ্ পূর্ণ করার জন্য আগের ক্বাযা নামাজ আদায় করা। অনেকেই ক্বাযা নামাজ আদায় না করে সুন্নাত পড়ে। তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। অথচ যারা সুন্নাতের বদলে ক্বাযা আদায় করল তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেল।

ক্বাযা নামাজ আদায়ের পদ্ধতি:

যতদ্রুত সম্ভব ক্বাযা নামাজ আদায় করে এবং আলাদাভাবে এর জন্য তওবা করে জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আর এরজন্য সুন্নাতসমূহও ক্বাযার নিয়্যাতে আদায় করা উচিত। অলসতার কারণে যারা নামাজ আদায় করছে না বা যাদের বহু বছরের নামাজ ক্বাযা হয়েছে তারা যেই ওয়াক্তে নামাজ পড়তে আরম্ভ করবে সেই ওয়াক্তের সুন্নাত পড়ার সময় ঐ ওয়াক্তের প্রথম যে নামাজ ক্বাযা হয়েছে তা আদায়ের নিয়্যাত করে পড়বে। তাদের জন্য সুন্নাতগুলিকে ক্বাযা নামাজের নিয়্যাতে আদায় করা, চার মাজহাব অনুযায়ীই আবশ্যক।

হানাফী মাজহাব অনুযায়ী, বিনা উজরে নামাজ ক্বাযা করা কবীরা গুনাহ। একইসাথে ঐ নামাজ আদায়ের জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন ততটুকু খালি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার দ্বিগুণ কবীরা গুনাহ হয়। এভাবে যতক্ষণ ক্বাযা আদায় না করা হবে ততগুণে গুনাহ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কেননা ঐ ক্বাযা নামাজ প্রথম সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথে আদায় করাও ফরজ।

অতএব, হিসাব মিলানো কঠিন এই ভয়াবহ কবীরা গুনাহ থেকে এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যোহরের নামাজের প্রথম চার রাকাত সুন্নাত আদায়ের সময়, যোহরের প্রথম যে ফরজ নামাজ ক্বাযা হয়েছিল তা আদায়ের নিয়্যাত করে পড়বে। যোহরের শেষ দুই রাকাত সুন্নাত আদায়ের সময়, ফজরের প্রথম যে ফরজ নামাজ ক্বাযা হয়েছিল তা আদায়ের নিয়্যাত করে পড়বে। আছরের চার রাকাত সুন্নাত আদায়ের সময়, আছরের প্রথম যে ফরজ নামাজ ক্বাযা হয়েছিল তা আদায়ের নিয়্যাত করে পড়বে। মাগরিবের নামাজের দুই রাকাত সুন্নাতের বদলে, মাগরিবের প্রথম যে ফরজ নামাজ ক্বাযা

হয়েছিল তার নিয়্যাতে তিন রাকাত ক্বাযা নামাজ আদায় করবে। এশার ওয়াক্তের প্রথম চার রাকাত সুন্নাত আদায়ের সময়, এশার প্রথম যে ফরজ নামাজ ক্বাযা হয়েছিল তার নিয়্যাত করে আদায় করবে আর শেষ সুন্নাতের সময় প্রথম বিতর নামাজের ক্বাযা করার নিয়্যাতে তিন রাকাত আদায় করবে। এভাবে প্রত্যেক দিন, একেক দিনের ক্বাযা আদায় হবে। তারাবীহর নামাজ পড়ার সময়ও ক্বাযার নিয়্যাত করে ক্বাযা আদায় করতে হয়। যে কয় বছরের নামাজ ক্বাযা হয়েছে, এভাবে ততবছর আদায় করে যেতে হবে। ক্বাযা আদায় শেষ হলে, স্বাভাবিক নিয়মে সুন্নাত আদায় করা আরম্ভ করবে। সুন্নাত বাদেও যখনই অবসর সময় পাওয়া যায় তখনই পূর্বের ক্বাযা আদায় করে ঋণ শেষ করা দরকার। কেননা যত ক্বাযা নামাজ বাকী আছে তা আদায় না করা পর্যন্ত প্রতিদিন এর গুনাহ গুণে গুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
নামাজ পরিত্যাগকারী

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা:) বর্ননা করেছেন যে, "যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় হয় তখন ফেরেশতারা বলে: এই আদম সন্তান জাগো! মানুষকে জ্বালানোর জন্য প্রস্তুতকৃত আগুনকে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে নিভাও"। পবিত্র হাদিস শরীফে আছে, "**মু'মিন ও কাফিরের মাঝের পার্থক্যকারী হল নামাজ**"। অর্থাৎ মু'মিন ব্যাক্তি নামাজ আদায় করে, কাফির আদায় করে না আর মুনাফিকরা কখনো আদায় করে, কখনো করে না। মুনাফিকরা জাহান্নামে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। শাহ্-ই মুফাস্সিরিন আবদুল্লাহ ইবনি আব্বাস (রা:) বর্ননা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে: "**নামাজ পরিত্যাগকারী ব্যাক্তি কিয়ামতের দিনে মহান আল্লাহ তায়ালাকে নিজেদের প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় দেখতে পারবে**"।

হাদিস ইলমের ইমামরা এই বিষয়ে একমত পোষন করেছেন যে, কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওয়াক্তের নামাজ আদায় না করে কিংবা নামাজের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার সময়ে ঐ ওয়াক্তের নামাজ আদায় করতে না পারার কারনে নিজের মাঝে যদি কোন ধরনের অনুশোচনা অনুভব না করে তবে সে কাফিরে পরিণত হয়, ঈমানহীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। এমতাবস্থায় যারা নামাজ আদায়ের ব্যাপারে কখনো চিন্তাও করল না কিংবা নামাজকে নিজেদের উপর অর্পিত একটি দ্বায়িত্ব হিসেবেই মেনে নিল না তাদের পরিণতি কি হবে? ইবাদতসমূহ ঈমানের অংশ নয় এব্যাপারে আহলে সুন্নাত আলেমদের মতৈক্য রয়েছে। শুধুমাত্র নামাজের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। ফিকহ্ ইমামদের মধ্যে থেকে **ইমাম আহমদ ইবনি হাম্বল, ইসহাক ইবনি রাহেওয়াইহ, আবদুল্লাহ ইবনি মুবারক, ইবরাহীম নাখাঈ, হাকিম বিন উতাইবা, আইয়্যুব সাহতিয়ানি, দাউদ তাই', আবুবকর ইবনি শাইবা, যুবায়ের বিন হারব** সহ আরো অনেক বিখ্যাত আলেমরা বলেছেন যে, কেউ যদি এক ওয়াক্তের নামাজ

বিনা কারনে ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে। এই প্রেক্ষিতে হে আমার দ্বিনী ভাইয়েরা, এক ওয়াক্ত নামাজও ত্যাগ করবেন না, এব্যাপারে অলসতাকে প্রশ্রয় দিবেন না। মনোযোগ দিয়ে আগ্রহ সহকারে নামাজ আদায় করুন। কিয়ামতের দিনে মহান আল্লাহ তায়ালার বিচার যদি উপরোক্ত আলেমদের ইজতিহাদের অনুরূপ হয় তখন কি পরিণতি হবে?

হাম্বলী মাজহাব অনুযায়ী কেউ যদি বিনা উজরে(কারনে) ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামাজ পরিত্যাগ করে তবে তাকে মুরতাদের ন্যায় হত্যা করা হয়। তাকে গোসল করানো হয় না, কাফন পরিধান করানো হয় না, তার জন্য জানাজার নামাজও পড়া হয় না এমন কি মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন না করে বনজঙ্গলে কিংবা পাহাড়-পর্বতে গর্ত করে সমাহিত করা হয়।

শাফী' মাজহাবে নামাজ পরিত্যাগকারীকে মুরতাদ আখ্যা দেয়া না হলেও শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। নামাজ পরিত্যাগকারীর জন্য মালেকী মাজহাবের হুকুম শাফী' মাজহাবের অনুরূপ।

আর হানেফী মাজহাবে নামাজ পরিত্যাগকারী ব্যাক্তিকে জেলে বন্দী করে রাখা হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত সে পুনরায় নামাজ আদায় করতে আরম্ভ করে। কিংবা রক্ত ঝরা পর্যন্ত প্রহার করা হয়। [শুধুমাত্র ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে এই শাস্তি প্রযোজ্য]

পাঁচটি কাজ না করলে পাঁচটি বিষয় থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এগুলি হল:

১. মাল-সম্পদের যাকাত আদায় না করলে বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।

২. উশর (ফসলের যাকাত) আদায় না করলে ফলনে বরকত কমে যায়।

৩. সদকা প্রদান না করলে শারীরিক সুস্থতা লোপ পায়।

৪. দোয়া না করলে মনোবাসনা পূরণ হয় না।

৫. নামাজের ওয়াক্ত হলে তা আদায়ে অনীহা করলে শেষ নিঃশ্বাসে কালিমা-ই শাহাদাত পড়ার সৌভাগ্য হয় না।

হাদিস শরীফে বর্নিত আছে যে:

বিনা কারণে নামাজ পরিত্যাগকারী ব্যাক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালা পনেরটি কষ্ট দেন। এর ছয়টি দুনিয়াতে, তিনটি মৃত্যুর সময়ে, তিনটি কবরে, তিনটি কবর থেকে উত্থানের সময় ভোগ করতে হয়।

দুনিয়াতেই যে ছয়টি আযাব ভোগ করতে হয়:

১. নামাজ পরিত্যাগকারীর জীবনে বরকত থাকে না।

২. আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের চেহারায় যে নূরানী সৌন্দর্য থাকে তা তার চেহারা থেকে লোপ পায়।

৩. অন্যান্য সৎকর্মের সওয়াব অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়।

৪. তার দোয়া কবুল হয় না।

৫. কারো ভালবাসা পায় না।

৬. মুসলমানদের একে অপরের জন্য মুসল্মান হিসেবে সামষ্টিক যে দোয়া করা হয় তা থেকে তার কোন ফায়দা হয় না।

মৃত্যুর সময় যে তিনটি শাস্তি ভোগ করতে হয়:

১. মন্দ, অপদস্থ ও কুৎসিত অবস্থায় মৃত্যু হয়।

২. ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যু হয়।

৩. যতই পানি পান করুক না কেন পিপাসার কষ্ট নিয়ে মৃত্যু বরণ করে।

কবরের তিনটি আযাব:

১. কবর তাকে প্রচন্ড চাপ দেয়, শরীরের এক পাশের হাড্ডি অন্য পাশের হাড্ডির মাঝে প্রবেশ করে।

২. তার কবর আগুন দ্বারা পূর্ন করা হয়। তার মাঝে রাত দিন সে জ্বলতে থাকে।

৩. মহান আল্লাহ তার কবরে অতিবিশাল সাপ পাঠান যা তাকে প্রত্যেক নামাজ ওয়াক্তের সময় ছোবল মারতে থাকে। দুনিয়ার সাপের চেয়ে ওগুলি অনেক বাশী ভয়ংকর। এক মূহুর্তের জন্যও তাকে বিরাম দেয় না।

কিয়ামতের সময় বাকী যে শাস্তিগুলি ভোগ করতে হবে:

১. আযাব প্রদানের দ্বায়িত্বে নিয়োজিত জাহান্নামের ফেরেশতারা সর্বদা তার সাথে থাকবে।

২. মহান আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাতের সময় রাগান্বিত থাকবেন।

৩. তার হিসাব প্রদান অনেক কঠিন হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

নামাজ আদায়কারীর ফজিলতসমূহ

নামাজ আদায়ের ফজিলত এবং নামাজ আদায়কারীর অর্জিত সওয়াবের ব্যাপারে খবর প্রদানকারী অনেক হাদিস শরিফ রয়েছে। আবদুল হক বিন সাইফুদ্দিন দেহলেভী'র 'আসিয়াতুল- লামায়াত' নামক গ্রন্থে নামাজের গুরুত্ব ও মহত্ব বর্ননাকারী হাদিস শরীফসমূহে বলা হয়েছে যে:

১. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, " **পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমার নামাজ পরবর্তী জুমা পর্যন্ত আর পবিত্র রমজান মাসের রোজা পরবর্তী রমজান মাস পর্যন্ত কৃত যাবতীয় (সগীরা)গুনাহসমূহের কাফফারা হবে। কবীরা গুনাহ করা থেকে বিরত থাকা ব্যাক্তির সগীরা গুনাহসমূহ মাফের সবব(কারন) হবে**"। নামাজ মধ্যবর্তী সময়ে কৃত সগীরা গুনাহসমূহের মাঝে বান্দার হক হরণকারী গুনাহ ব্যতীত বাকীগুলি মুছে দেয়। মাফ পেতে পেতে যাদের সগীরাগুনাহের খাতা শূন্য হয় তাদের কৃত কবীরা গুনাহের কারণে প্রাপ্ত

আযাবের তীব্রতাকে হ্রাস করে তবে মুছে দেয় না। কেননা কবীরা গুনাহ থেকে পরিত্রাণের জন্য বান্দাকে অবশ্যই তওবা করতে হবে। যাদের কবীরা গুনাহ নাই তাদের আধ্যাত্মিক মর্যাদা বৃদ্ধির কারন হয়। উপরোক্ত হাদিস মুসলিম শরীফেও বর্নিত হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্তের নামাজের ত্রুটিগুলি থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য জুমার নামাজসমূহ সবব(উপায়) হয়। আর জুমা নামাজসমূহের ত্রুটিগুলিকে রমজানের রোজা বিলুপ্ত করে।

২- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু পুনরায় বলেন, রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালাম বলেছেন: **'যদি কারো বাড়ির সামনে একটি পুকুর থাকে এবং সে প্রতিদিন তাতে পাঁচবার গোসল করে তার গেয়ে কি কোন ময়লা থাকবে?' সাহাবিরা উত্তর দিলেন**: " নাহ রাসুলুল্লাহ কিছু থাকবে না"। তিনি বললেন: **"প্রতিদন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও তেমন। আল্লাহ তালা , যে ব্যাক্তি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে তার গুনাহ সমূহ মুছে দেন।"** হাদিস শারিফটি **বুখারি এবং মুসলিম** শারিফে রয়েছে।

৩- আব্দুল্লাহ ইবনে মেসুদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, কোন পুরুষ যদি কোন বেগানা নারীকে চুমু খেয়েছিল। আনসারের একজন ব্যাক্তি ঐ সময় খেজুর বিক্রি করছিলেন, এসময় একজন নারী আসে খেজুর কিনতে , ঐ নারীকে দেখে তার কামের উদ্রেক হয়। তিনি তাকে বলেন, আমার বাড়িতে আরও ভালো খেজুর আছে, আমার সাথে আসো যাতে আমি তোমাকে সেগুলো দিতে পারি। যখন তারা বাসায় পৌঁছালো, লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরলো এবং চুমু খেল। সেই নারী তাকে বলল, কি করছেন আপনি? আল্লাহ তালাকে ভয় করুন। তিনি রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালামের কাছে আসলেন এবং বললেন তিনি কি করেছেন। রাসুলুল্লাহ আল্লাহ্‌র অহির জন্য অপেক্ষা করলেন। এরপর ব্যাক্তিটি ইবাদাত করলো। আল্লাহ তালা সূরা হুদের একশত পনের নম্বর আয়াত নাযিল করলেন: **"দিনের দুই ভাগে এবং যখন সূর্য অস্ত যায় নামাজ আদায় করো। নিশ্চয় ভালকাজ খারাপ কাজকে ধ্বংস করে।"** দিনের দুই ভাগ হচ্ছে দুপুরের আগে এবং দুপুরের পরে। এটি সকাল, দুপুর এবং বিকেলের নামাজ। দিনের আলোর শেষের দিকে মাগরিবের নামাজ এবং তার কিছুখন পরে ইশার নামাজ। এই আয়াতে কারিমে বলা হয়েছে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মাধ্যমে পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। লোকটি জিজ্ঞেস করলো: " হে রাসুলুল্লাহ ! এটি কি শুধু আমার জন্য, নাকি সকল উম্মাতের জন্য? তিনি বললেন: **"এটি সকল উম্মাতের জন্য।"** হাদিস শারিফটি বুখারি এবং মুসলিম শারিফে এসেছে।

৪- আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: "একজন ব্যাক্তি রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালামের কাছে আসলেন এবং বললেন: (আমি একটি পাপ করেছি যার কঠিনতম শাস্তি উচিত!) রাসুলুল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন না, তিনি কি পাপ করেছেন। যখন নামাজের সময় আসলো নবীজি

নামাজ আদায় করলেন। লোকটি দাঁড়িয়ে রাসুলুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন,আমি একটি পাপ করেছি, যার সাস্তি হওয়া উচিত। আল্লাহ তালার কিতাব অনুযায়ী আমাকে শাস্তি দেন। তিনি বললেন: **"তুমি কি আমাদের সাথে নামাজ আদায়?" লোকটি বলল : হাঁ আমি করেছি।** তখন রাসুলুল্লাহ বললেন : **দুঃখিত হয়ো না, আল্লাহ তালা তমার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন**। এই হাদিস শারিফটি ইসলামের প্রধান দুটি কিতাব সাহিহায়ান এর মধ্যে লেখা রয়েছে। লোকটি ভেবেছিল সে একটি গভীর পাপ করেছে যার কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। নামাজ আদায়ের মাধ্যমে তার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয় এরমানে হচ্ছে পাপটি গুরুতর ছিল না। অথবা তিনি **তাযির** শাস্তির বদলে হাদ্দ শব্দটি ব্যাবহার করেছেন। তিনি হাদ্দ শাস্তি অব্যাহত রাখতে চাননি এটি তাই নির্দেশ করে। হাদ্দ হচ্ছে ইসলামে বর্ণীত শাস্তির একটি মাধ্যম। তাজির শাস্তিগুলো বিভিন্ন রকমের, এগুলো ইসলামিক বিচারকার্যের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। তাজির অর্থ কোন মানুষকে ভালো ব্যাবহারের মানুষ বানানো। ইসলামে,হাদ্দের চেয়ে কম শাস্তি দিতে হবে।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় আমল কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন, "**যথাযথ ওয়াক্তে নামাজ আদায় করা**"। কিছু হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, " মহান আল্লাহ ওয়াক্ত হওয়া মাত্রই আদায় করা নামাজকে অধিক পছন্দ করেন"। এরপর কোন আমলটি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন? জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন(স:), মা-বাবার খেদমত। তারপর কোন আমলটি পছন্দ করেন? বললেন(স:), আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করাকে। এই হাদিসটি বিখ্যাত দুইটি সহিহ হাদিস কিতাব তথা বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্নিত আছে। অপর এক হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, " সর্বোত্তম আমল হল অপরকে খাবার খাওয়ানো"। আরেকটি হাদিস শরীফে আছে, " সালামের প্রচলন ও প্রসার হল শ্রেষ্ঠ ইবাদত"। অন্য একটি হাদিস শরীফে আছে, " রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাজ পড়া সর্বোত্তম ইবাদত"। আরেকটি হাদিসে আছে, " কারো হাত ও মুখের দ্বারা অন্য কারো কষ্ট না পাওয়াটা সবচেয়ে মূল্যবান আমল"। এক হাদিসে আছে, " জিহাদ হল সবচেয়ে মূল্যবান আমল"। অপর এক হাদিসে আছে, " সবচেয়ে মূল্যবান আমল হল মাবরুর হজ্জ"। অর্থাৎ বান্দার হক ও কাজ্বা নামাজ না থাকা অবস্থায় যে হজ্জ আদায় করা হয়। 'আল্লাহ্‌র জিকির করা' এবং 'নিয়মিত পালন করা আমলসমূহ' সর্বোত্তম বর্ননাকারী হাদিসও রয়েছে। এর কারন হল বিভিন্ন প্রশ্নকারীর অবস্থা সাপেক্ষে তাদের উপযোগী বিভিন্ন জবাব দেয়া হয়েছে। অথবা সময়োপযোগী জবাব প্রদান করা হয়েছে। যেমন ইসলামিয়্যাতের শুরুর দিকে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে মূল্যবান আমল ছিল জিহাদ। (আমাদের এই সময়ে সর্বোত্তম আমল হল লেখনীর মাধ্যমে, প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে কাফিরদের, মাজহাব বিরোধীদের মোকাবিলা করা, আহলি

সুন্নাতের ই'তিকাদকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়া। এরূপ জিহাদে লিপ্ত ব্যাক্তিদেরকে যারা অর্থ দিয়ে, সম্পদ দিয়ে, শ্রম দিয়ে সাহায্য করবে তারা এদের দ্বারা অর্জিত সওয়াবের ভাগীদার হবে। পবিত্র আয়াত ও হাদিস সমূহের দ্বারা বুঝা যায় যে, যাকাত ও সদকার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল হল নামাজ। তথাপি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জারত কোন ব্যাক্তিকে খাবার-পানীয় ইত্যাদি দান করে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা নামাজ আদায়ের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হবে। অর্থাৎ স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আমল অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করে।)

৬- জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন : রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালাম বলেছেন: **(মানুষ এবং অবিশ্বাসের মধ্যে সীমানা হচ্ছে নামাজ পরিত্যাগ করা করা।)** নামাজ মানুষকে অবিশ্বাসী হতে দেয় না। যদি এটি পরিত্যাগ করা হয়, মানুষ অবিশ্বাসীতে পরিনত হতে শুরু করে। হাদিস শারিফটি **মুসলিম** শরিফে লিখা আছে। এই হাদিসটি প্রমান করে নামাজ পরিত্যাগ করে ভুল কাজ। অনেক সাহাবী বলেছেন যারা বিনা কারনে নামাজ পরিত্যাগ করে তারা অবিশ্বাসীতে পরিনত হয়। শাফি এবং মালিকী মাঝহাব অনুসারে, তিনি অবিশ্বাসী হয়ে যায় না, যাইহউক তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। মাহাফি মাঝহাবের মতে তাকে প্রহার করতে হবে এবং জেলে বন্দি করতে হবে যতদিন না নামাজ আদায় শুরু করে।

৭. উবাদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, " মহান আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। যে ব্যাক্তি সুন্দরভাবে অজু করে ওয়াক্ত মত এই নামাজগুলি পড়বে, এর রুকু ও সেজদা সমূহ যথাযথভাবে আদায় করবে তাকে ক্ষমা করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা কথা দিয়েছেন। যে ব্যাক্তি নামাজ আদায় করল না তার ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি চাইলে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন আবার আজাবও দিতে পারেন"। এই হাদিস শরীফটি ইমাম আহমদ, আবু দাউদ এবং নাসাঈ নিজ নিজ হাদিস কিতাবে বর্ননা করেছেন। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নামাজের অন্যান্য শর্তসমূহসহ রুকু ও সেজদার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত। মহান আল্লাহ তায়ালা কখনই ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। অতএব, সহীহ-শুদ্ধভাবে নামাজ আদায়কারী ব্যাক্তিকে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করবেন।

৮- হযরত আবু ইমামি বাহিলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: রাসুলুল্লাহ বলেছেন: **পাচ ওয়াক্ত নামাজ পড়, রোজা রাখ এক মাস, তমার সম্পদের যাকাত দাও, নির্দেশ সমূহ মানো, তমার রবের জান্নাতে প্রবেশ কর।** অর্থাৎ যারা নামাজ আদায় করে, রোজা রাখে, তাদের সম্পদের যাকাত দেয় এবং তাদের উপর আল্লাহ্ তালা এবং তার খালিফাদের নির্দেশ মেনে চলে পৃথিবীতে, তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন।এই হাদিস শারিফটি উল্লেখ করেছেন ইমাম আহমেদ এবং তিরমুযি।

৯. আসহাবে কিরামদের মধ্যে বিখ্যাত বুরাইদা-ই আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, " **তোমাদের সাথে আমার সম্পর্কের মূল ভিত্তি হল নামাজ। নামাজ ত্যাগকারী ব্যাক্তি কাফিরে পরিণত হয়**"। এই হাদিস থেকে নামাজ আদায়কারী ব্যাক্তির মুসলমান হওয়ার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। আরো বোঝা যায়, যে ব্যাক্তি নামাজকে গুরুত্ব দেয় না, অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের তালিকায় প্রথমে স্থান দেয় না, নামাজকে ফরজ হিসেবে গ্রহন করে না এবং এ কারণে আদায় করে না সে কাফির হয়ে যায়। ইমাম আহমদ, তিরমিজি, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ উপরোক্ত হাদিস শরীফটি নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১০– আবুজেরি গাফফারি বলেছেন: "শরতের দিনে, রাসুলুল্লাহর সাথে ঘুরছিলাম" পাতা ঝরে পড়ছিল। তিনি দুটি ডাল ভাংলেন আকস্মিক। তিনি বললেন, **ও আবু জার, যখন কোন বাক্তি আল্লাহ তালার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদাত করে, তখন তার পাপ সমূহ এভাবে পাতা ঝরার মত করে ঝরে পড়ে।** ইমাম আহমেদ এই হাদিসটি উল্লেখ করেন।

১১. যাইদ বিন খালিদ জুহানি থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "**কোন মুসলমান ব্যাক্তি যদি সহীহ-শুদ্ধভাবে খুশু' সহকারে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে তবে তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ করে দেয়া হয়**"। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তায়ালা তার সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ করে দেন। এই হাদিস শরীফটি ইমাম আহমদের কিতাবে বর্নিত আছে।

১২. আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনে আস্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, " **কোন ব্যাক্তি নামাজ আদায় করলে ঐ নামাজ কিয়ামতের দিনে নূর (আলো) ও বুরহান(দলিল)এ পরিণত হবে এবং তার জাহান্নাম থেকে মুক্তির উছিলা হবে। আর নামাজকে মুহাফাজা (সংরক্ষণ) না করলে তা নূর ও বুরহানে পরিণত হবে না এবং সে নাজাত পাবে না। কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবেই বিন খালাফ এর সাথে জাহান্নামে অবস্থান করবে**"।

দেখা যাচ্ছে যে, কোন ব্যাক্তি যদি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব সহ যথাযথভাবে নামাজ আদায় করে তবে এই নামাজ কিয়ামতের সময়ে তার জন্য নূর হয়ে সঙ্গ দিবে। আর যথাযথভাবে নামাজ আদায় না করলে, নামাজকে মুহাফাজা না করলে কিয়ামতের দিবসে কাফিরদের সাথে একত্রে থাকতে হবে। অর্থাৎ তাদের সাথে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। উবেই বিন খালাফ মক্কার কুখ্যাত কাফিরদের অন্যতম ছিল। উহুদের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মুবারক হাত দ্বারা তাকে জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন। উপরোক্ত হাদিস শরীফটি ইমাম আহমদ ও দারিমী নিজ নিজ কিতাবে বর্ননা করেছেন। আর ইমাম বায়হাকী তার শুয়াবুল ঈমান নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিরমিজি শরীফে বর্নিত আছে যে, প্রসিদ্ধ

তাবেয়ীদের অন্যতম আবদুল্লাহ বিন শাকিক বলেছেন, “ সম্মানিত সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম, ইবাদতসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র নামাজ ত্যাগ করাকে কুফর হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন”। আবদুল্লাহ বিন শাকিক হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত উসমান এবং হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে হাদিস শরীফ বর্ননা করেছেন। তিনি হিজরী একশত আট সালে ইন্তিকাল করেছেন।

১৩–আব্দুল্লাহ বিন শাফিক , তাবেঈনদের মধ্যে অন্যতম বলেছেন: “**আশাবে কারিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ইবাদাতের মধ্যে শুধু নামাজ বাদ দিলেই অবিশ্বাসী হয়ে যায়**।” তিরমুজি এমনটি উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন শাফিক হাদিসটি সংগ্রহ করেছেন উমড়, আলী, উসমান এবং আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে। তিনি ১০৮ হিজরি সনে মারা যান।

১৪. হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘**তোমাকে যদি টুকরো টুকরো করে কেটেও ফেলা হয় কিংবা আগুন দিয়ে পোড়ানোও হয় তবুও মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরীক করিও না। ফরজ নামাজ কখনো ত্যাগ করিও না। যে ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামাজ ত্যাগ করে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। মদ পান করিও না। কেননা মদ সকল অনিষ্টের চাবি**’। এই হাদিস শরীফটি ইবনি মাযাহ এর গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, কেউ যদি ফরজ নামাজসমূহ অবজ্ঞাভরে ত্যাগ করে তবে সে কাফির হয়ে যায়। যদি আলসেমির কারণে ত্যাগ করে থাকে তবে সে কাফির না হলেও বড় গুনাহ সম্পন্নকারী হয়। তবে শরীয়তে যে পাঁচটি অবস্থাতে ফরজ নামাজ আদায়ের দায়ভার থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে সে অবস্থার কারণে আদায় না করলে গুনাহ হবে না। মদ ও অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় মানুষকে মাতাল করে, তার বিচারবুদ্ধি লোপ করে। আর বিচার বুদ্ধিহীন ব্যাক্তি সবধরনের পাপকাজ করতে সক্ষম।

১৫– আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বুল্লেখ করেছেন, রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালাম বলেছেন: **(হে আলী! তিনটি কাজে কখনো দেরি করো না, যখন নামাজের সময় আসে সাথে সাথে তা আদায় করো। যখন ম্রিতের কবরের প্রস্তুতি শেষ হয় সাথে সাথে জানাজার নামাজ আদায় করো। যখন কোন মেয়ে কে কুওফের সাথে পাও, সাথে সাথে তাকে তার সাথে বিবাহ দিয়ে দাও।)** ইমাম তিরমিজি রাহিমাল্লাহু তালা হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

[যেহেতু কোন একজন মেয়ে কে বিয়ে করা প্রয়োজন, একজন নারীকে তার কওফ বা তার জন্য নির্ধারিত বাক্তির সাথে। কুওফের অর্থ ধনি নয়, বা অনেক সম্পদের মালিক নয়। এর অর্থ একজন সাহিহ মুসলিম, যে কিনা আহলে সুন্নাহর অনুসারী, নামাজ আদায় করে, নেশা করে না, আল্লাহ তালার

নির্দেশ মেনে চলে এবং জীবনধারণের জন্য অর্থ উপার্জন করে। যারা তাদের জামাইয়ের কাছে সম্পদের আশা করে, তারা তাদের মেয়েদেরকে সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দেয়। তারা তাদের মেয়েদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করে। একইভাবে মেয়েদের জন্যও নামাজ আদায় করতে হবে, অবশ্যই খোলা মাথা, হাতে এবং একা বাইরে যাবে না, এমনকি কোন না মাহরাম পুরুষের সাথেও না।]

১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্নিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, '**নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে যারা নামাজ আদায় করে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। আর যারা ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বে আদায় করে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন**'। এই হাদিসটি তিরমিযী শরীফে বর্নিত আছে।

১৭. উম্মু ফারওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ননা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদা কোন আমলটি সর্বোত্তম বলে জিজ্ঞাসা করা হল। উত্তরে আল্লাহ্‌র রাসূল বললেন, ' **সর্বোত্তম ইবাদত হল ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে আদায় করা নামাজ**'। এই হাদিসটি ইমাম আহমদ, তিরমিযী এবং আবু দাউদ (র:) নিজ নিজ হাদিসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। নামাজ এমনিতেই সর্বোত্তম ইবাদত। ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে যদি তা আদায় করা হয় তবে তা আরো উত্তম হয়। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত, তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জীবনে একাধিকবার ওয়াক্তের শেষে নামাজ আদায় করতে দেখিনি'। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জীবনে একবার শুধু নামাজকে ওয়াক্তের শেষে আদায় করেছিলেন।

১৮- আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি দ্বিতীয়বার কোনদিন রাসুলুল্লাহকে নির্ধারিত সময়ের পড়ে নামাজ আদায় করতে দেখি নি।

১৯- হযরত উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্লেখ করেছেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন,**"যে সকল আল্লহ তালার মুসলিম বান্দারা তাতাও নামাজ বার রাকাত আদায় করে ফরজ নামাজের পরে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতএ একটি ঘর নির্মাণ করেন। " মুসলিম শারিফে** এই হাদিসটির উল্লেখ রয়েছে। রাসুলুল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পড়ে যে নামাজ আদায় করতেন সুন্নাত হিসেবে সেগুলোই তাতাও নামাজ, অন্যভাবে নফল নামাজ।

২০- আব্দুল্লহ বিন শাকিক তাবেঈনদের মধ্যে অন্যতম বলেছেন, আমি তাতাও সম্পর্কে জানতে ছেয়েছি আয়শা রাদিয়াল্লাহু তালা আনহুর কাছে, যা রাসুলুল্লাহর নফল নামাজ। তিনি বলেছেন দুপুরের ফরজ নামাজের আগে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত, বিকেলের এবং রাতের ফরজ নামাজের পূর্বে

দুই রাকাত নামাজ, প্রত্তেকদিন সকালের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। মুসলিম ,আবু দাউদ রাদিয়াল্লাহু তালা এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

২১. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নফল ইবাদতসমূহের মধ্যে ফজরের দুই রাকাত সুন্নতকে সবচেয়ে বেশি নিয়মিতভাবে পালন করেছেন। এই হাদিস শরীফটি **বুখারী** শারীফেও আছে, **মুসলিম** শরীফেও আছে। এই হাদিস শরীফ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফরজগুলির সাথে আদায়কৃত সুন্নত নামাজসমূহকে নফল নামাজ হিসেবে গণ্য করেছেন।

ইসলামের মহান আলেম, আল্লাহভক্তদের নেতা, দালালাতপন্থী বিদায়াতপন্থী ও মাজহাব বিরোধীদের বিপক্ষে আহলি সুন্নাতের শক্তিমান রক্ষক, সত্য দ্বীনকে প্রচারের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত, বিদায়াতকে নির্মূলকারী বিখ্যাত মুজাহিদ, ইমাম-ই রব্বানী মুজাদ্দিদ-ই আলফে সানী আহমদ বিন আবদুল আহাদ ফারুকী শেরহিন্দী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক রচিত ইসলামের ইতিহাসে নজিরবিহীন, 'মাকতুবাত' নামক গ্রন্থের উনত্রিশতম **মাকতুবে** (পত্রে) বলেছেন যে:

আল্লাহ তালা যা কিছু অনুমোদন করেছেন তা ফরজ এবং নফল। ফরজ ইবাদাতের সাথে নফলের তুলনায় নফলের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ নামাজ আদায় করা এক হাজার বছর নফল আদায়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। সকল প্রকার নফল যেমন নামাজ রোজা যাকাত ফিকর সব একি রকম। অধিকিন্তু ফরজ নামাজের সময় এর সুন্নাত এবং আদাব সমূহ পালন করা নফলের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সকালের নামাজ জামাতে আদায়ের পর হযরত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু জামাতের দিকে তাকালেন, দেখলেন একজন সদস্য অনুপস্থিত, তিনি জিজ্ঞেস করলেন সে কোথায়। তার সাথীরা বললেন, "তিনি প্রত্যেক রাতে নফল ইবাদাত করেন। ধারণা করা যায় ঘুমের কারনে তিনি জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।" আমিরুল মুমিনিন বললেন, "যদি সে সারা রাত ঘুমিয়ে সকালে জামাতে নামাজ আদায় করে তবে তা অধিক উত্তম।" মাকরুহ এবং নফল ইবাদাত সমূহ ধিকর তাফাক্কুর মুরাকাবা বাদ দিয়ে ফরজ আদায় করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। হাঁ যদি এগুলো একসাথে পালন করা যায় মাকরুহ না করে তবে তা অবশ্যই ফযিলতপূর্ণ। ফরজ ছাড়া এসবের কোনই মূল্য নেই। এই কারনে, জাকাতের জন্য একটি স্বর্ণ মুদ্রা দেয়া, নফল ইবাদাতের জন্য হাজার স্বর্ণ মুদ্রা খরচের চেয়ে উত্তম। যাকাতের মুদ্রা দেয়ার সময় এর আদবের দিকে লক্ষ রাখতে হবে, যেমন যাকাত নিকট আত্মীয়দের মধ্যে দেয়া নফল আদায়ের জন্য দানের চেয়ে উত্তম। এছাড়া, যারা মাঝরাতের পড়ে নফল নামাজ আদায় করতে চান, তারা অবশ্যই পূর্বের ক্বাযা নামাজ

আদায় করবেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ সমূহকে বলা হয় **ফরজ**, তার নিষেধ সমূহকে বলা হয় **হারাম।** আমাদের রাসুলের নির্দেশ সমূহ **সুন্নাত** এবং তার নিষেধ সমূহ **মাকরুহ**। এই সব গুলোকেই একসাথে বলা হয় **আহকামে ইসলামিয়্যা**। ভালো চরিত্রের অধীকারি হওয়া এবং মানুষেকে সাহায্য করা ফরজ। যারা আহকামে ইসলামিয়্যার কোন একটি নিয়ম অমান্য করে বা বিশ্বাস না করে তবে সে **কাফির, মুরতাদে** পরিনত হবে।

যারা এসবগুলোতেই বিশ্বাস করে তারা **মুসলিম**। যে সকল মুসলিম অলসতার কারনে ইসলাম মেনে চলে না তারা **ফাসিক।** যেসকল ফাসিক ফরজ আদায় করে না এবং হারাম কাজ করে তারা জাহান্নামে যাবে। সেই ব্যাক্তির কোন কাজ এবং সুন্নাত কবুল হবে না। সেগুলোর জন্য কোন সওয়াব দেয়া হবে না। যদি কোন ব্যাক্তি যাকাত দেয়, একটি মাত্র মুদ্রা খরচ করে , তার মিলিয়ন মুদ্রা খরচে ভালো কাজে কোন ফায়দা নেই। কোন সওয়াব দেয়া হবে না মসজিদ, বিদ্যালয় কিংবা হাসপাতাল এবং চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে । তারাওিহ নামাজের যে কোন একটি আদায় না করা হলে তার রাতের ইবাদাত কবুল করা হবে না। ফরজ এবং ওয়াজিব ছাড়া যে সকল ইবাদাত করা হয় সেগুলো সুন্নাত নয়তো **নফল।** সুন্নাত হচ্ছে নফল ইবাদাত। এই বর্ণনা অনুযায়ী যারা ক্বাযা নামাজ আদ্য করেন তারা এইসব সুন্নাতের ক্বাযা নামাজও আদায় করবেন একই সময়ে। ফরজ আদায় করা এবং হারাম থেকে দূরে থাকা, মিলিয়ন নফল আদায়ের চেয়ে উত্তম। যারা ফরজ আদায় করে না এবং হারাম কাজ করে তারা জাহান্নামে যাবে। তার নফল ইবাদাত তাকে রক্ষা করতে পারবে না। ইবাদাতে পরিবর্তন আনা **বিদাত**। ইবাদাতের সময় বিদাত করা হারাম এবং তা ইবাদাতকে বাতিল করে দেয়। ফাসিক ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করা যাবে না, যেমন যাদের স্ত্রী কন্যারা পর্দা করে না, যারা বিদাত করে যেমন লাউড স্পীকার ব্যাবহার করে। তার প্রচারণা এবং মনগড়া ধর্মীয় কথা শোনা উচিত না। তার কিতাবসমূহ পড়া উচিত নয়। তার সাথে হাসিমুখে এবং ভদ্র ভাবে কথা বলা উচিত তিনি বন্ধু হউন অথবা শত্রু। কার সাথে তর্ক করা উচিত নয়। একটি হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছেঃ **(একজন মূর্খের সাথে তর্ক করো না)**।

ইবাদাত হৃদয়ের বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি করে। পাপ হৃদয়কে দূষিত করে ফেলে, তার হৃদয় পুলকিত [ফেয়য] হয় না। প্রত্যেকটি মুসলিমের ইমান, ফরজ, হারাম সম্পর্কে জানা উচিত। সেগুলো না জানা তার জন্য কোন ওজর হতে পারে না। এটি ঠিক এরকম, জানার পরেও বিশ্বাস না করা।

মাকতুবাত কিতাবটি ফার্সি ভাষায় লিখিত। হযরত ইমাম রাব্বানি ভারতের সেরহেন্দ শহরে ১০৩৪ হিজরি, ১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। তার সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত তুরকিশ কিতাব **হাক সযুন ভেসিকালারি, সায়েদেত এবেদিয়্যা এবং এশাবে কারিম** এবং ফার্সি কিতাব **বেরেকাতে**র মধ্যে লেখা রয়েছে।

নামাজের হাক্বীকত

ইসলামের প্রসিদ্ধ আলেম হযরত আবদুল্লাহ দেহলেভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার '**মাকাতিব-ই শরীফা**' নামক কিতাবের ৮৫তম মাকতুবে বলেছেন যে:

আমাদেরকে নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা, রুকুর পরে **কাওমা** করা (**সোজা হয়ে দাঁড়ানো**) এবং দুই সেজদার মাঝে **জালসা** করা(**সোজা হয়ে বসা**) আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়েছেন। রুকুর পরে দাঁড়ানো ও দুই সেজদার মাঝে বসা অনেক আলেমের মতে ফরজ। হানাফী মাজহাবের মুফতী কাজী খান এ ব্যাপারে বলেছেন যে, এই দুটি নামাজের ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত। এগুলির কোন একটি ভুলে আদায় না করলে সাহু সেজদা করা ওয়াজিব হয়, আর ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করলে নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে। যারা এই দুইটিকে সুন্নত-ই মুয়াক্কাদা হিসেবে বিবেচনা করেছেন তারাও একে ওয়াজিবের কাছাকাছি সুন্নত বলেছেন। সুন্নতকে গুরুত্বহীন ভেবে, অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলে কুফুরী হবে।

নামাজের কিয়ামে, রুকুতে, কাওমা করাতে, জালসাতে, সেজদাতে ও বসার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রকাশ পায় যার সবগুলিই আলাদা আলাদাভাবে গুরুত্ব বহন করে। আসলে এর মধ্যমে সমস্ত ইবাদতকে নামাজের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ তথা সুবহানাল্লাহ বলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ ও সালাওয়াত পাঠ করা, কৃত গুনাহসমূহের জন্য ইস্তিগফার(ক্ষমা প্রার্থনা) করা এবং যাবতীয় চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে পেশ করে তার সাহায্য কামনা করে দোয়া করা এগুলির সবই নামাজের মাঝে নিহিত রয়েছে। বৃক্ষরাজি নামাজের **কিয়ামে**র মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পশুরা রুকুর মত আর জড় পদার্থরা নামাজের শেষ বৈঠকে বসার মত করে জমিনে অবস্থান করছে। নামাজ আদায়কারী ব্যাক্তি সমস্ত সৃষ্টির ইবাদতের ন্যায় ইবাদত করতে সক্ষম হয়।

নামাজ, মিরাজ রজনীতে ফরজ করা হয়েছে। ঐ রাতে মিরাজ তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদা অর্জনকারী আল্লাহ্র প্রিয় পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার কথা ভেবে যে মুসলমান ব্যাক্তি নামাজ আদায় করবে, সে ঐ মহান পয়গম্বরের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের পথে ধাপে ধাপে মর্যাদার স্তর পার হয়ে সম্মানিত হতে থাকবে। যারা মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে তার প্রিয় রাসুলের অনুসরণ করে আদবের সাথে নম্র ও বিনয়ী হয়ে হুজুর তথা একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করতে পারবে তারা কতটা সম্মানিত মাকামে (স্তরে) পৌঁছেছে তা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারবে। মহান আল্লাহ তায়ালা ও তার পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি দয়ার বশবর্তী হয়ে এই উম্মতকে বড় ধরনের অনুগ্রহ করেছেন, নামাজকে ফরজ করেছেন।

এজন্য আমাদের মহান প্রভুকে অসংখ্য ধন্যবাদ, হামদ ও শুকরিয়া জানাই। তার প্রিয় পয়গম্বরের উপর দুরুদ ও সালাওয়াত পাঠ করি, তাহিয়্যাত জানাই এবং দোয়া করি।

নামাজ আদায়ের সময় যে আধ্যাত্মিক শান্তি ও তৃপ্তি অর্জিত হয় তা বর্ননাতীত। আমার ওস্তাদ মাজহার-ই জান-ই জানান বলেছেন যে, 'নামাজ আদায়ের সময় আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব না হলেও যেন উনাকে দেখছি এমন একটি হাল বা অবস্থা অর্জিত হয়'। তাসাউফের সকল মহান ব্যাক্তিত্বই এই হালের অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন।

ইসলামের শুরুর দিকে কুদুসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করা হত। যখন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায়ের আদেশ এল তখন মদিনার ইহুদিরা অসন্তুষ্ট হল। তারা মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করল, এতদিন যে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছ তার কি হবে? তাদের এই প্রশ্নের জবাব হিসেবে মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ১৪৩তম আয়াতে এরশাদ করেছেন যে, '**আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঈমানকে নষ্ট হতে দিবেন না**'। অর্থাৎ তোমাদের আদায়কৃত নামাজসমূহ বিনিময়হীন থাকবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। এখানে নামাজের জায়গায় ঈমান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকেই বুঝা যায় যে, নামাজকে সুন্নত (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পন্থা) অনুযায়ী আদায় না করা হলে ঈমানকে নষ্ট করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, '**আমার চোখের নূর ও স্বাদ, নামাজের মাঝে রয়েছে**'। এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা হল, নামাজের সময় মহান আল্লাহ তায়ালা দেখা দেন আর তার দর্শন পেয়ে আমার চোখ তৃপ্তি পায়। এক হাদিস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন '**হে বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে প্রশান্তি দাও'।** এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, হে বিলাল! আযান দিয়ে, নামাজের ইকামত দিয়ে আমাকে প্রশান্তি লাভ করাও। নামাজ ছাড়া অন্য কিছুর মাঝে পরিতৃপ্তির অন্বেষণ গ্রহণযোগ্য নয়। যে নামাজকেই সঠিকভাবে আদায় করতে পারে না, একে পরিত্যাগ করে সে দ্বীনের অন্যান্য দ্বায়িত্বসমূহ আরো বেশি পরিমাণে ত্যাগ করে।

নামাজের ফজিলত

মুজাদ্দিদ-ই আলফে সানী ইমাম রব্বানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার '**মাকতুবাত**' নামক কিতাবের প্রথম খন্ডের দুইশ একষট্টিতম পত্রে বলেছেন যে:

এই বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই জানা দরকার যে, নামাজ ইসলামের পাঁচটি শর্তের দ্বিতীয়টি। সকল ধরনের ইবাদতকে নিজের মাঝে শামিল করেছে। ইসলামের এক পঞ্চমাংশ, কিন্তু সবধরনের ইবাদতকে নিজের মাঝে একত্রিত

করার মাধ্যমে, নামাজ একাই মুসলমানিত্বের ধারক, বাহক ও পরিচায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের যতগুলি মাধ্যম রয়েছে, নামাজ তার মধ্যে প্রধানতম। সমস্ত নবী রাসূলের সর্দার প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মিরাজ রজনীতে মহান আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তার এই দর্শন পার্থিব জীবনে ফিরে আসার পরে, দুনিয়ার উপযোগী করে শুধুমাত্র নামাজের মাঝে সীমিত করে দেয়া হয়েছে। আর এজন্যই হাদিসে বর্নিত আছে যে, '**নামাজ, মুমিনের মিরাজস্বরূপ**'। অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, '**নামাজের সময়ই মানুষ মহান আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয়**'। যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসারী আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা, রাসূলের মহান মিরাজ থেকে এই দুনিয়াতেই আংশিকভাবে ভাগীদার হয়। আর তা শুধুমাত্র নামাজের দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব। এটা সত্য যে, এই দুনিয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালার পবিত্র দর্শন অর্জন করা সম্ভব নয়। দুনিয়ার প্রেক্ষাপট এর জন্য উপযোগী নয়। তথাপি যারা নিষ্ঠার সাথে পরিপূর্নভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হল, সেইসব বুজুর্গ ব্যাক্তিরা শুধুমাত্র নামাজ আদায়ের সময় নবীজীর মিরাজ থেকে কিছুটা বরকত অর্জন করে থাকে। যদি নামাজ আদায়ের জন্য আদেশ না দেয়া হত তবে চূড়ান্ত মাকসাদ্‌-এর সুন্দর রূপ থেকে পর্দা কে সরাত? কি করে আশিকরা তার মাশুককে খুজে পেত?

নামাজ, দুঃখ ভারাক্রান্ত রূহকে স্বাদের যোগান দেয়। অসুস্থ হৃদয়ে প্রশান্তির শীতল বাতাস বৈয়ে দেয়। নামাজ হল রূহের খাবার, ক্বালবের শিফা বা আরোগ্যের মাধ্যম। নামাজের জন্য আযানের আদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে '**হে বিলাল! আমাকে প্রশান্তি দাও**!' এইভাবে বলার মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই বুঝিয়েছেন, আর '**নামাজ, আমার ক্বালবের আনন্দ ও চোখের মনি**' এই হাদিস শরীফের দ্বারাও এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। স্বাদসমূহ, প্রাপ্তিসমূহ, জ্ঞান ও মারিফাত, মাকামসমূহ, নূর ও আলোসমূহ, রংসমূহ, ক্বালবের প্রশান্তি ও তৃপ্তি, বুঝা না বুঝা তাজাল্লীসমূহ, সিফাতসহ কিংবা সিফাতহীণ প্রকাশের যে কোনটি নামাজের বাইরে অর্জিত হলে এবং নামাজের হ্বাকীকত থেকে কিছুই বুঝতে না পারলে, যা কিছু অর্জিত হয়েছে তা কেবলি ছায়া, প্রতিফলন ও প্রতিচ্ছবি হিসেবে অর্জিত হয়েছে। যা মূলত অবাস্তব ধারনা ও কল্পনা বৈ আর কিছু নয়। নামাজের হ্বাকীকতকে প্রকৃত অর্থেই বুঝতে পেরেছে এমন কামিল ব্যাক্তি যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন সে যেন এই দুনিয়া থেকে বের হয়ে আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করে এবং আখিরাতের জন্য খাঁচ এমন কিছু নিয়ামত থেকে কিছুটা অর্জন করতে সফল হয়। মাঝে কোন ধরনের প্রতিফলন, কল্পনার মিশ্রণ ব্যাতীত সরাসরি মূল থেকে আধ্যাত্মিক স্বাদ অর্জন করে। কেননা, দুনিয়ার যাবতীয় নিয়ামত ও পূর্নতা মূলত রূপকভাবে ও আসলের দৃশ্যমান ছায়া হিসেবে অর্জিত হয়। মাঝে কোন ধরণের পর্দা কিংবা কৃত্রিমতার অবকাশ না দিয়ে সরাসরি মূল থেকে স্বাদ আস্বাদন করা

আখিরাতের সাথে সম্পর্কিত। তাই দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় মূলের থেকে স্বাদ পেতে হলে মিরাজ তথা উর্ধগমন (নাফসের পরিশোধন ও উন্নয়ন) করা আবশ্যক হয়। মুমিনের জন্য নামাজই মিরাজ। এই নিয়ামত শুধুমাত্র এই উম্মতের জন্যই বরাদ্ধ করা হয়েছে। এই উম্মত স্বীয় পয়গম্বরের অনুসরণের মাধ্যমে এই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। কেননা তাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রজনীতে দুনিয়ার জগতকে পিছনে ফেলে আখিরাতের জগতে ভ্রমণ করেছিলেন। জান্নাতে প্রবেশ করেছেন এবং মহান আল্লাহ্‌র দর্শনপ্রাপ্ত হয়ে সৌভাগ্যবান হয়েছিলেন। হে মহান প্রতিপালক! আমার রব! অনুগ্রহ করে তুমি ঐ মহান পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের পক্ষ থেকে তার মহানত্বের যথোপযুক্ত প্রতিদান ও পুণ্য ইহসান কর। একইসাথে সমস্ত নবী-রাসূল 'আলাইহিমুস সালাম ওয়াস সালাওয়াত'কে অসংখ্য সওয়াব ও পুণ্য দান কর, যুগে যুগে যারা মানবজাতিকে তোমার পরিচয় বাতলে দিয়েছেন, তোমার সন্‌তুষ্টি অর্জনের জন্য আহবান করেছেন এবং তোমার পছন্দনীয় পথ প্রদর্শন করেছেন।

তাসাউফের পথে গমনকারীদের মধ্য থেকে অনেকেই, নিজেদেরকে নামাজের হাক্বীকত সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত না করার কারণে, নামাজের সাথে সম্পর্কিত সৌন্দর্য, পূর্নতা ও স্বাদের সাথে পরিচয় না করিয়ে দেয়ার কারণে, নিজেদের সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য বিভিন্ন উপায়ের সন্ধান করেছে। নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন মাধ্যমকে আঁকড়ে ধরেছে। এমনকি এদের কেউ কেউ, নামাজকে এই পথের বাইরের কিছু ভেবেছে, মাকসাদের(মূল লক্ষ্যের) সাথে সম্পর্কহীন মনে করেছে। রোজাকে নামাজের চেয়ে উত্তম ধারণা করেছে। যারা নামাজের হাক্বীকতকে বুঝতে সক্ষম হয়নি তাদের মধ্য থেকে অনেকেই মনোযাতনাকে লাঘব করার জন্য, রূহকে তৃপ্ত করার জন্য সিমা'(তাসাউফী গান) ও সুরে অর্থাৎ সংগীতের মাঝে, আত্মহারা হওয়ার মাঝে সমাধান খুঁজে বেরিয়েছে। নিজেদের মাকসাদকে, মাশুককে সংগীতের পর্দার অন্তরালে মনে করেছে। একারণে গানবাজনায় লিপ্ত হয়েছে। অথচ তারা "**আল্লাহ্ তায়ালা হারামের মাঝে শিফা তথা আরোগ্যদানকারী কোন প্রভাব সৃষ্টি করেননি**" হাদিসটি সম্ভবত শ্রবণ করেছে। আসলে, আনাড়ি সাঁতারু ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে হাতের কাছে যা কিছু পায়, তা শুঁকনো খড় হলেও ধরে বাঁচতে চায়। ইশক্ তথা প্রেম, আশিককে বধির ও অন্ধ করে দেয়। তাদেরকে যদি নামাজের সৌন্দর্য থেকে একটা কিছু আস্বাদন করানো যায়, তবে তারা সিমা' ও সুরের কথা মুখেও আনত না! আত্মহারা হওয়ার (তাসাউফী বিশেষ পদ্ধতিতে নিজেকে সম্পূর্নরূপে ভুলে যাওয়ার) কথা কল্পনাতেও আনত না।

হে আমার ভাই! নামাজে প্রাপ্ত আত্ম তৃপ্তি এবং গান শোনার তৃপ্তির মধ্যে পার্থক্য ঠিক ততোটা, যতটা নামাজ এবং গানের মধ্যে দুরুত্ত। জ্ঞানী বাক্তিরা সিদ্ধান্ত নেবেন কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বা লাভজনক।

ইবাদাতের আনান্দ নেয়া এবং এটি পালনের সময় একঘেয়েমিতে না ভোগা আল্লাহ তালার সবচেয়ে বড় রহমত। বিশেষ করে নামাজের আনন্দ উপভোগ করতে পারে না যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত যায়। ফরজ নামাজের স্বাদ আস্বাদনের আনন্দ তাদের যারা পরিপূর্ণ ভাবে নামাজ আদায় করে শেষ পর্যন্ত। যারা কাছাকাছি পর্যন্ত আসে তারা নফল নামাজের স্বাদ পায়। যাইহউক শেষ পর্যন্ত, শুধু মাত্র ফরজ নামাজের স্বাদ পাওয়া যায়। নাফল নামাজের স্বাদ পাওয়া যায় না, ফরজ নামাজের রয়েছে অশেষ রহমত।

[নফল নামাজ সেগুলো, যেগুলো ফরজ বা ওয়াজিব নয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে এবং পরের নামাজ সুন্নাত, অন্যান্য ওয়াজিব নয় জেসব নামাজ সেগুলো নফল। সকল সুন্নাত নামাজ, মুয়াক্কাদা অথবা মুয়াক্কাদা নয় সব গুলোই নফল].

নামাজের আনন্দ নাফস বুঝতে পারে না। যখন মানুষ নামাজের আনন্দ পেতে শুরু করে তখন তার নাফস বিলাপ এবং কান্না শুরু করে। হে আমাদের আল্লাহ! এটি কি ধরনের উত্তাপ! যেসকল মানুষের আমাদের মত দুর্বল আত্মা রয়েছে, এটি একটি রহমত এবং এই শোনাও সুখের।খুব ভালো করে জেনে রাখতে হবে, দুনিয়াতে নামাজ আদায় করা আল্লাহ তালাকে দর্শনের মতই। এই পৃথিবীতে, মানুষ নামাজ আদায়ের সময় আল্লাহ তালার সবচেয়ে কাছের মানুষ। অতঃপর এটি হচ্ছে সেই সময় যখন সে আল্লআঃ তালাকে দর্শন করে। পৃথিবীতে সকল ইবাদাত মানুষকে অন্য একটি মর্যাদায় উন্নীত করে যা নামাজ আদায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। আসল কারনটি হচ্ছে নামাজ আদায় করা। নামাজ আদায়ের মাধ্যমে একজন অশেষ রহমত এবং চিরায়িত কল্যাণ লাভ করতে পারে।

নামাজ সমস্ত ইবাদতের থেকে অধিক মূল্যবান। নামাজ এমন হয় যে, ভগ্ন ক্বালবকে আনন্দের দ্বারা পূর্ণ করে। নামাজ এমন হয় যে, গুনাহসমূহকে বিলুপ্ত করে। মানুষকে পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে, '**নামাজ হল ক্বালবের আনন্দ ও উৎফুল্লতার উৎস**'। নামাজ দুঃখ ভারাক্রান্ত রূহসমূহকে প্রশান্তি দেয়। **নামাজ** হল রূহের খোরাক, ক্বালবের জন্য শিফা। প্রকৃত নামাজে এমন মুহুর্ত আসে যখন, আরিফের ভাষা মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে কথা বলা গাছের মত হয়।

ইমাম রাব্বানি রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি তার মাকতুবাত কিতাবের প্রথম খণ্ডের তিন শত ছেষট্টি নম্বর মাকতুবাতের মধ্যে লিখেছেন:

ইমান এবং ইতিকাদের [যে মতবাদগুলো বিশ্বাস করতে হবে] সংশোধনের পর ফিকাহ [যে কাজ গুলোর নির্দেশ এবং নিষেধ করা হয়েছে আমাদের ধর্মে] শাস্ত্রের নিয়ম কানুন জানতে হবে। কোন ব্যাক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী ফরজ,ওয়াজিব, হালাল এবং হারাম,সুন্নাত, মাকরুহ এবং সন্দিহান কাজ সমূহ সম্পর্কে জানতে হবে এবং এই সে অনুযায়ী ইবাদাত করতে হবে। ফিকাহ কিতাব সমূহ পড়ে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটা মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। এগুলো জানা ছাড়া কেউ মুসলিম হতে পারে না। প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ তালার নির্দেশ মেনে চলা এবং সে পথে চলা যে পথে তিনি খুশি হউন। আল্লাহ তালা সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন সঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। নামাজ ধর্মের খুঁটি, আমরা নামাজের গুরুত্ব এবং কিভাবে নামাজ আদায় করতে হবে তা বর্ণনা করবো। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনুন, প্রথমেই সুন্নাত অনুযায়ী ওজু করতে হবে, যেমনটা ফিকাহ কিতাবে লেখা রয়েছে। ওজুর সময় অবশ্যই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো তিনবার ভালভাবে সম্পূর্ণরূপে ধুতে হবে। এভাবে, সুন্নাতের মত করে ওজু সম্পন্ন করতে হবে। হাতে মাসেহ করার সময় সম্পূর্ণ হাত হাত পরিষ্কার করতে হবে বা ধুতে হবে। কান এবং ঘাড় খুব ভালো করে মাসেহ করতে হবে। পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে তাখিল করার সময়, বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে ফাকা স্থানগুলো পরিষ্কার করতে হবে ভালভাবে। এটিতে অবশ্যই গুরুত্ব দেয়া দরকার, এটিকে মুস্তাহাব বলে বাদ দেয়া উচিত নয়। মুস্তাহাব পরিত্যাগ করা যাবে না। এগুলো আল্লাহ তালা পছন্দ করেন।

এটি জানা উচিত, তিনি যা ভালবাসেন তা করার জন্য পুরো পৃথিবী দিয়ে দেয়া যেতে পারে, যারা এটি পালন করে তারা অনেক সওয়াব পায়, এটি ঠিক এরকম সামান্য পাত্রের ভাঙ্গা টুকরোর জন্য হিরের টুকরো লাভ করা কিংবা কিছু নুড়ি পাথরের বদলে মৃত প্রিয় মানুষের জীবন ফেরত পাওয়া। নামাজ মুমিনদের জন্য মিরাজ স্বরূপ। এটি একটি রহমত যা শুধুমাত্র রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালামের উম্মতদের দেয়া হয়েছে মেরাজের রজনীতে। ফরজ নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতে হবে এমনকি ইমামের সাথে প্রথম তাকবির ছাড়া যাবে না। নারী পুরুষ একসাথে জামাতে মসজিদে নামাজ আদায়ের করা, বা কুরআনে কারিম শোনা বা জুম্মার নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া সওয়াব হাসিলের জন্য পাপের।

নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ আদায় করা প্রয়োজন এবং জানা প্রয়োজন এটি নির্ধারিত সময়ে আদায় করা হয়েছে। যখন মানুষ একাকী থাকে তখন নামাজের সময় হলে সাথে সাথে নামাজ আদায় করবেন, বিকেল এবং সন্ধ্যার নামাজ

ইমাম ই ইজমা অনুযায়ী আদায় করতে হবে। নামাজ যত দেরিতে আদায় করা হয় তার সওয়াব ততো কমতে থাকে। নামাজ আদায়ের জন্য মুস্তাহাব সময় জামাতের জন্য এবং মসজিদে জাওয়ার জন্য। যদি কোন নামাজের সময় পার হয়ে যায় তবে একজন মানুষকে খুনের পাপের সমান পাপী হবেন। এটির ক্বাযা আদায়ের পরেও এই পাপ ক্ষমা করা হয় না, তাকে তওবা ই নাসুহ অথবে হাজ্জ ই মাব্‌রুর করতে হবে. **(ইবনে আবেদিন)**।

নামাজের মধ্যে ঠিক ততটুকু কুরআনে কারিম থেকে পাঠ করতে হবে, ঠিক যতটা সুন্নাত। সকল শর্তের অধীনে রুকু এবং সিজদায় নড়া চড়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা এটি ফরজ অথবা ওয়াজিব। রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় এমন ভাবে দাঁড়াতে হবে যাতে শরীরের সকল হাড় স্বাভাবিক অবস্থায় আসে। এরপরে কিছুক্ষণ এভাবে থাকা ফরজ অথবা ওয়াজিব অথবা সুন্নাত।

একইভাবে দুই সিজদার মাঝখানে বসতে হবে। এই বিষয়গুলোতে অত্যন্ত মনোযোগ দেয়া উচিত। রুকু এবং সিজদায় কমপক্ষে তিনবার তাসবিহ পাঠ করতে হবে। সবচেয়ে বেশি সাত অথবা এগারো বার পাঠ করতে হবে। ইমামের জন্য, এটি নির্ভর করে জামাতের উপর। কোন মানুষের জন্য একাকী নামাজ আদায়ের সময়, সে শক্তিশালী এবং কঠিন সময় না হওয়া সত্ত্বেও তিনবারের কম তাসবিহ পাঠ করা লজ্জা জনক। অন্তত পাঁচ বার এটি বলা উচিত। সিজদায় সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে পায়ের কাছের অঙ্গ মাটিতে রাখতে হবে, এরপর প্রথমে হাঁটু তারপরে হাত, অতপর নাক এবং সবশেষে কপাল জমিনে রাখতে হবে। হাঁটু থেকে হাতে প্রথমে ডানদিকটি টি রাখতে হবে। সিজদা থেকে ওঠার সময় শরীরের উপরের অংশ প্রথমে তুলতে হবে । প্রথমে কপাল তুলতে হবে অতঃপর হাত এরপর হাঁটু উঠাতে হবে। দাঁড়ানো থাকা অবস্থায় সিজদার স্থানে তাকাতে হবে, রুকুতে থাকা অবস্থায় পায়ের দিকে তাকাতে হবে, সিজদায় থাকা অবস্থায় নাকের উপরে তাকাতে হবে না, বসা অবস্থায় হাত অথবা পেটের দিকে তাকাতে হবে।

যদি কেউ উল্লেখিত জায়গা গুলোতে এবং যদি চোখে আফছা দেখা যায় না, তবে জামাতে নামাজ আদায় করা যেতে পারে। এতে করে হৃদয় দুনিয়াবি চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। গভীর মনোযোগ এবং নম্র ভাবে নামাজ আদায় করতে হবে। রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালাম ও এমনটি বলেছেন। রুকুর সময় আঙ্গুল সমূহ খোলা রাখা এবং সিজদার সময় একসাথে রাখা সুন্নাত। এই বিষয়গুলোতেও মনোযোগ রাখতে হবে। আঙ্গুল সমূহ খলা রাখা বা বন্ধ রাখা এমনিতেই নয়, এর জুন কারন রয়েছে। রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালাম এমনটি করেছেন। আমাদের জন্য রাসুল সাল্লাহিয়ালাইহিস সালামকে অনুসরনের চেয়ে আমলের আর কিছু হতে পারে না। আপানাদের এই কথা গুলো বলার কারন আপনাদের এই কাজ গুলো করতে উৎসাহিত করা যা ফিকাহ কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের রাসুলের দেখানো কাজ গুলো করার তৌফিক দান করুন। আমীন। আল্লাহ্‌র নামে এবং

রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালামের নিমিত্তে, আলাহি ওয়া আলা আলি কুল্লিন মিনাসসালাওাতি এফদালুহা ওয়ে মিনেত্তেস্লিমাতি একমেলুহা, আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করুন। আমীন।

ইমাম রাব্বানি রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি তার মাকতুবাত কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণের ঊনসত্তর তম চিঠিতে লিখেছেন:

"আমার সমস্ত হামদ আল্লাহ তালার জন্য এবং সালাম তার বান্দাদেরকে যাদেরকে আল্লাহ তালা মনোনীত করেছেন এবং ভালবেসেছেন। আপনার চিঠি পৌঁছেছে। এটি বোঝা যায় যে আমাদের বন্ধু সঠিক পথ পরিহার করেন নি এবং আমরা খুশি। আল্লাহ তালা আপনাকে সঠিক পথে সফল করুন এবং সঠিক পথেই রাখুন।

"আমরা এবং আমাদের বন্ধুরা আপনার আরোপিত কাজ অব্যাহত রেখেছি। আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করছি, পঞ্চাশ অথবা ষাট জনের জামাতে।," আপনি বলেন। এই জন্য আল্লাহ তালার হামদ জ্ঞাপন করছি। এটি কত বড় রহমত, যখন হৃদয় আল্লাহ তালার হয়ে যায়, এবং শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার নির্দেশ শারিয়াত পালন করে। এই সময়ে, অধিকাংশ মানুষ নামাজ আদায় করতে চায় না। সেই কারনে আমার প্রিয়,আপনাকে সতর্ক করতে চাই এই বিষয়ে। ভালো করে শোনেন আমাদের প্রিয় রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালাম বলেছেন:**"সবচেয়ে বড় চোর সে যে নিজের নামাজে চুরি করে।"** তারা জিজ্ঞেস করলেন, " হে রাসুলুল্লাহ! একজন মানুষ কিভাবে তার নিজের নামাজ থেকে চুরি করে? " তিনি বললেন, **" রুকু এবং সিজদা সঠিকভাবে না করে।"** অন্য একটি সময়ে তিনি বলেছেন: **" আল্লাহ তালা ওই বাক্তির নামাজ কবুল করেন না, যে সঠিক ভাবে কোমর রাখে না রুকু এবং সেজদার সময়।"** একবার এক ব্যাক্তিকে সঠিকভাবে রুকু এবং সিজদা না করতে দেখে তিনি বললেন, **"তুমি কি মুহাম্মাদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের হয়ে মৃত্যুর ভয় করো না কেননা তুমি এভাবে তোমার নামাজ আদায় করো ?"** তিনি আবার বলেন, **"নামাজ আদায়ের সময়, রুকুর পড়ে যদি তুমি পুরোপুরি সোজা হয়ে না দাড়াও, যদি তোমার দাঁড়ানোর ফলে সমস্ত অঙ্গপ্রতঙ্গ স্বাভাবিক না হয়, তমার নামাজ সম্পন্ন হব না।"** তিনি আবার একদিন একজনকে সঠিকভাবে নামাজ আদায় না করতে দেখে বলেন, **"যদি তুমি সঠিকভাবে দুই সিজদার মাঝখানে সঠিকভাবে না বস তবে নামাজ সম্পন্ন হবে না।"** তিনি পুনরায় একজনকে নামাজের নিয়ম ফরজ এবং রুকুন সমূহ সম্পূর্ণ রুপে আদায় না করতে দেখে, সঠিক ভাবে রুকুর পরে না দাঁড়াতে দেখে এবং দুই সিজদার মাঝ খানে সঠিক ভাবে বসতে না দেখে বললেন,**"তুমি যদি এই ভাবে নামাজ আদায় করতে থাকো, কেয়ামাতের দিন তমাকে আমার উম্মাত বলা হবে**

না।" অন্য একটি সময়ে তিনি বলেছেন, **"যদি তুমি এটি অব্যাহত রাখ এবং মারা যাও, তুমি মুহাম্মাদের ধর্ম অনুযায়ী মারা যাবে না।"** আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যে বাক্তি ষাট বছর নামাজ আদায় করেছে কিন্তু তার নামাজ কবুল হয় নি কেননা সে রুকু এবং সিজদা সঠিক ভাবে করে নি।" যাইদ ইবনে ওয়াহাব রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি একজন ব্যাক্তিকে নামাজ আদায় করতে দেখলেন যে কিনা রুকু সিজদা সঠিকভাবে করছে না। তিনি তাকে ডাকলেন, "কতদিন যাবত তুমি এইভাবে নামাজ আদায় করছো?" যখন বাক্তিটি উত্তর দিল, চল্লিশ বছর, তখন তিনি বললেন, "তুমি চল্লিশ বছর ধরে নামাজ আদায় করো নি। তুমি যদি এখন মারা যাও তবে রাসুলের সুন্নাতে মারা যাবে না।"."

তাবারানির **আওসাত** কিতাবের মধ্যে লিখা রয়েছে, বিশ্বাসীরা যারা সঠিকভাবে নামাজ আদায় করে, রুকু এবং সিজদা করে, তাদের নামাজ খুশি হয় এবং দিপ্তিমান হয়। ফেরেশতারা তার নামাজ জান্নাতে নিয়ে যায়। এই নামাজ ঐ নামাজী বাক্তির জন্য দোয়া করবে এবং বলবে, "যেহেতু তুমি আমাকে নষ্টের হাত থেকে রক্ষা করেছ, আল্লহ তালা তোমাকে রক্ষা করবেন।" যদি নামাজ সঠিকভাবে আদায় না করা হয়, এটি কাল হয়ে যাবে। ফেরেশতারা এটি ঘ্রিনা করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে না। ঐ নামাজ আদায় কারি বাক্তিকে নামাজ অভিশাপ দেবে এবং বলবে, " যেহেতু তুমি আমাকে ধ্বংস করেছ এবং খারাপ ভাবে আদায় করেছ, আল্লাহ তালা তমাকে ধ্বংস করবেন।." আমরা অবশ্যই **তাদিল ই আরকান** অনুযায়ী নামাজ আদায়ের চেষ্টা করবো, **রুকু , সেজদা, কিয়াম, জালসা** সঠিক ভাবে আদায় করবো। এছাড়াও আমারা অন্যান্যদের সতর্ক করবো যদি তাদেরকে ভুলভাবে আদায় করতে দেখি। আমরা আমাদের ইসলামের ভাইদেরকে সঠিকভাবে নামাজ আদেয়ে সাহায্য করবো। আমরা তাদিল ই আরকান [সুবহানাল্লাহ বলার সময় নিশ্চল থাকা] এবং তুমানিনাতের[সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিশ্চল রাখা]. উদাহরণ হব। বেশিরভাগ মুসলিম এই কাজটির সম্মান থেকে বঞ্চিত। এই রহমতটি ইতিমধ্যে হারিয়ে গাছে। এই ভালো কাজটি পুনরায় সক্রিয় করা প্রয়োজন। আমাদের রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালাম বলেছেন: **"কেউ যদি আমার হারিয়ে যাওয়া কোন সুন্নাত সক্রিয় করতে পারে তাকে একশত শহিদের মর্যাদা দেয়া হবে।"** আমরা অবশ্যই সতর্ক হব সারি করার বিষয়ে, জামাতে নামাজ আদায়ের সময়। আমরা যে সারির অংশ তার থেকে সামনে বা পেছনে দাঁড়াবো না। সবাইকে সোজা সারিতে দাঁড়াতে হবে। আমাদের রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালাম প্রথমে সারি সোজা করতেন তারপর নামাজ শুরু করতেন। তিনি বলেতেন **"সারি সোজা করা নামাজের অংশ"**। হে আল্লাহ ! তমার অফুরন্ত করুনা থেকে আমাদের করুনা করুন। আমাদের কাউকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেন নে!

যদি কোন ব্যাক্তি পৃথিবীতে সমৃদ্ধি এবং আখিরাতে সুখি হতে চায়, তাকে এই তিনটি গুন গুণান্বিত হতে হবে,

কোন জীবের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ না করা, কোন মুসলিমের দুর্নাম না করা [অবিশ্বাসীদের জিম্মি না করা, যদিও তারা মৃত হয়]। অন্নের অধিকারের কিছু ভোগদখল না করা।

নামাজের আস্‌রার

মুজাদ্দিদে আলফে সানী, ইমামে রব্বানী কুদ্দিসা সিররুহু তার মাকতুবাত নামক কিতাবের প্রথম খণ্ডের তিনশ চারতম **মাকতুবে** বলেছেন যে:

আল্লাহ্‌ তায়ালার প্রতি হামদ ও শুকরিয়া জ্ঞাপনের পর ও রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ ও সালাওয়াত প্রেরণের পর তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জনের দোয়া করছি। আল্লাহ্‌ তায়ালা পবিত্র কুরআন মজিদের বহু আয়াতে করীমায়, সালিহ আমল (নেক কাজ) সম্পাদনকারী মুমিনগণের জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। এই সালিহ আমল কি? কল্যাণকর কাজের সবগুলিই, নাকি তার কয়েকটি? যদি এর দ্বারা কল্যাণকর কাজের সবগুলিই উদ্দেশ্য হয় তবে কেউই তা পালন করতে সক্ষম হবে না। যদি কয়েকটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে সেগুলি কি যা আমাদের থেকে চাওয়া হচ্ছে?

অবশেষে আল্লাহ্‌ তায়ালা করুণা করে আমাদেরকে তা এভাবে অবহিত করেছেন যে, সালিহ আমল হল, ইসলামের পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভ। ইসলামের এই পাঁচটি ভিত্তিকে কেউ যদি যথাযথ উপায়ে নিখুঁতভাবে পালন করে তবে জাহান্নাম থেকে তার মুক্তির ব্যাপারে আশা করা যায়। কেননা এগুলি মূলত সালিহ আমলের অন্তর্ভুক্ত যা মানুষকে পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে। এর স্বপক্ষে কুরআন করীমের সূরা আনকাবুতের পঁয়তাল্লিশতম আয়াতে বলা হয়েছে যে, "**যথাযথভাবে আদায়কৃত নামাজ মানুষকে অনিষ্ট ও অশ্লীল কর্ম করা থেকে বিরত রাখে**"। কোন মানুষের যখন ইসলামের পাঁচটি শর্ত যথাযথভাবে পূরণ করার নসীব হয়, তখন তার দ্বারা নিয়ামতের শুকরিয়াও আদায় হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ্‌ তায়ালা সূরা নিসা'র একশ ছিচল্লিশতম আয়াতে বলেছেন যে, "**তোমরা ঈমান এনে শুকরিয়া আদায় করলে তোমাদের শাস্তি দিব না**"। এমতাবস্থায়, ইসলামের পাঁচটি শর্তকে যথাযথভাবে পূরণ করার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করা উচিত।

এই পাঁচটি শর্তের মধ্যে ঈমানের পরে নামাজ হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, দ্বীনের মূল স্তম্ভ। নামাজের আদবগুলি থেকে যেন কোনটি বাদ পরে না যায় সেজন্য সচেষ্ট থাকা উচিত। নামাজ যদি যথাযথভাবে আদায় করা যায়, তবে

ইসলামের মূল ও বৃহৎ স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী মজবুত রশিকে আঁকড়ে ধরা হয়। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সকলকে সঠিকভাবে নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করুক।

নামাজে দাঁড়ানোর সময় **আল্লাহু আকবর** বলার অর্থ হল, মহান আল্লাহ্ তায়ালা কোন সৃষ্টির ইবাদতের প্রতি মুখাপেক্ষী নন, কোন দিক দিয়েই কোন কিছুর প্রতিই তাঁর কোন প্রয়োজন নাই, তাঁর জন্য মানুষের আদায় করা নামাজের কোন ফায়দা নাই ইত্যাদির ঘোষণা দেয়া। নামাজের মাঝে যে তাকবীর বলা হয় তা, আল্লাহ্ তায়ালার যথোপযুক্ত ইবাদতের যোগ্যতা ও সক্ষমতা যে আমাদের নাই তা প্রকাশ করে। রুকু'র তাসবীহের মাঝেও এই অর্থ নিহিত থাকায়, রুকুর পরে তাকবীরের আদেশ দেয়া হয়নি। অথচ সিজদার তাসবীহের পরে তাকবীরের আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা সিজদা বিনয়, নম্রতা ও ভক্তি প্রকাশের সর্বোচ্চ পর্যায় এবং নিজের তুচ্ছতা ও হীনতা স্বীকারের চূড়ান্ত পর্যায় হওয়ায়, সিজদা আদায়কারী ব্যক্তির মাঝে পরিপূর্ণ ইবাদত আদায়ের তৃপ্তি আসতে পারে। এই ধরণের চিন্তা থেকে, অতি আত্মবিশ্বাসী হওয়া থেকে রক্ষার জন্য, সিজদায় যাওয়ার ও তা থেকে উঠার সময় তাকবীর বলাকে সুন্নাত করা হয়েছে। এমনকি সিজদার তাসবীহের মাঝে '**আ'লা**' বলার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। নামাজ মুমিনের মিরাজ হওয়ায়, নামাজের শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মিরাজে যে অভিবাদনের দ্বারা মহিমান্বিত হয়েছিলেন সেই 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠের আদেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণেই নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির উচিত তার নামাজকে মিরাজের পর্যায়ে উন্নীত করা। আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের চূড়ান্ত পর্যায়, নামাজের মাঝেই অন্বেষণ করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "**মানুষ তার রবের সর্বাধিক নৈকট্য, নামাজের মাঝেই অর্জন করতে পারে**"। নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি, নামাজের মধ্যে তার রবের সাথে কথা বলে, তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাঁর বড়ত্ব ও মহানত্বকে উপলব্ধি করে। একারণে নামাজে মনের মধ্যে ভয়, শঙ্কা ও আতঙ্কের উদ্রেক হয়, আর এর থেকে স্বস্থি ও প্রশান্তি অর্জনের জন্য নামাজের শেষে দুইবার সালাম প্রদানের জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদিস শরীফে, ফরজ নামাজের পরে **তেত্রিশ বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ্), তেত্রিশবার তাহমীদ (আলহামদুলিল্লাহ্), তেত্রিশ বার তাকবীর (আল্লাহু আকবর) ও একবার তাহলীল** পাঠের জন্য বলেছেন। এর কারণ হল, নামাজের মাঝের ভুলত্রুটি তাসবীহের দ্বারা মুছে দেয়া হয়।

এটি প্রমানিত হয় যে ,এভাবে উত্তম বা সঠিক ইবাদাত করা সম্ভব নয়। এটি জানা, নামাজের মাধ্যমে তার রহমত প্রাপ্ত হয় তার সাহায্যে এবং তিনি এটি সম্ভব করেন, **তাহমিদের** মাধ্যমে তার এই রহমতের শুকরিয়া আদায় করা হয়। **তাকবির** বলার মাধ্যমে, এটি প্রমান দেয়া হয় তিনি ছাড়া আর কেউ এই ইবাদাতের যোগ্য নয়। যখন কেউ শর্ত সমূহ মেনে এবং আদবের সাথে নামাজ আদায় করে, তখন তার ভুল সমূহ ঢেকে দেয়া হয়, যখন কেউ নামাজ কবুলের জন্য আল্লাহ তালার শুকরিয়া আদায় করে, যখন কেউ হৃদয় থেকে কালেমা তাওহিদ পাঠ করে যে আল্লাহ ব্যাতিত কোন ইলাহ নেই ইবাদতের জন্য, তখন নামাজটি কবুল হতে পারে।

নামাজ আদায়কারি ব্যাক্তি তাদের একজন হয় যাদের নামাজ কবুল হয় এবং যারা মুক্তি পায়। হে রাব্ব, প্রিয় নবীজির দরুন, আমাদেরকে আপনার সুখি বান্দায় পরিনত করুন, যারা নামাজ আদায় করে এবং মুক্তি পায়। আমীন।

হযরত ইমাম ই মুহাম্মাদ মাসুম মাকতুবাত কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করনের এগারো নম্বর চিঠিতে লিখেছেন:

আল্লাহ তালা মানুষকে অসভভের মত বসবাসের জন্য ছেড়ে দেন নি। তিনি তাদের যা ইচ্ছা তাই করার অনুমতি দেন নি। তিনি তাদেরকে নাফসের কিংবা প্রকৃতিক কারনে পশু বৃত্তিক অত্যাধিক অসভ্য আচরনের বা আমোদের জন্য ইচ্ছে করেন নি। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, তাদের ইচ্ছার ব্যাবহার করে সমৃদ্ধি এবং সুখী হওয়ার, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন ভালো কাজের যাতে করে তারা দুনিয়া এবং আখিরাতে রহমত লাভ করতে পারে। তিনি তাদেরকে হারাম কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তার নিরদেশনা এবং নিষেধ সমূহ কে বলা হয় **আহকামে ইসলামিয়্যা।** যিনি পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করতে চান এবং আখিরাতে রহমত পেতে চান ইসলাম মেনে চলা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। তাকে অবশ্যই তার নাফসের ইচ্ছা পুরন থেকে বিরত থাকতে হবে, এবং একজনের স্বভাব যা ইসলামের বিপরীত তা পরিত্যাগ করতে হবে। যদি সে ইসলাম না মানে, তবে তাকে চরম মূল্য দিতে হবে এবং তার সৃষ্টিকর্তার জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ তালার যে বান্দা ইসলাম মেনে চলে, মুসলিম অথবা অবিশ্বাসী সে সুখি হবে এবং সমৃদ্ধি লাভ করবে। তার সৃষ্টিকর্তা তাকে সাহায্য করবেন। পৃথিবী শস্য ক্ষেত্র। যে মাঠে কাজ করবে না, যে পৃথিবীতে বীজ খেয়ে আমোদের মধ্যে থাকবে, সে শস্য থেকে বঞ্চিত হবে। যেমনটা, যারা পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য পুর জীবন ব্যয় করেন, নিজের নাফসের তৃপ্তির জন্য, সে চিরায়ত রহমত এবং অশেষ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে। একজন বিবেকবান মানুষের কাছে এই অবস্থা গ্রহণ যোগ্য নয়। তিনি খারাপ কাজের মাধ্যমে দুনিয়াবি সুখ শান্তির জন্য অশেষ রহমত থেকে বঞ্চিত হতে চাইবেন না। [আল্লাহ তালা দুনিয়াবি কোন আনন্দ কে নিষিদ্ধ করেন

নি, নাফসের যা কিছু ভালো লাগে, তিনি সেগুলো করার অনুমতি দিয়েছেন যদি তা ক্ষতিকর এবং ইসলামের বিপরীত না হয়] ইসলাম পরিপুরনভাবে মানার জন্য, একজনের অবশ্যই **আকিদা**র উপর বিশ্বাস থাকতে হবে, যা **আহলে সুন্নার** আলেমরা আসহাবে কারিমরা, কুরআনে কারিম এবং হাদিস শারিফ থেকে শিখেছেন, এরপর একজনকে জানতে হবে হারাম কি, কোন কাজ গুলো করা নিষেধ এবং সেগুলো থেকে দেউরে থাকতে হবে, এরপর ফরজ সম্পর্কে জানতে হবে যা অবশ্যই পালন করতে হবে। করাকে বলা হয় **ইবাদাত**। হারাম থেকে সংযত হওয়াকে বলা হয় **তাকওয়া**। এসব পালনের মাদ্দমে ইসলাম মেনে চলার নাম হচ্ছে **ইবাদাত।** আল্লহ তালার নির্দেশ এবং নিষেধ সমুহকে বলা হয়, **আহকাম ই ইসলামিয়্যা এবং আহকাম ই ইলাহিয়্যা**। যেগুলো নির্দেশ করা হয়েছে সেগুলো ফরজ, যেগুলো নিষেধ করা হয়েছে সেসব হারাম। ইবাদাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ভিত্তি হচ্ছে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। [নামাজ পরার অর্থ কিবলা মুখি হয়ে ফাতিহা পড়া, কিবলার দিকে নত হওয়া, কিবলার দিকে হয়ে জমিনে মাথা রাখা, যদি কেউ কিবলার দিকে না হয়ে এই কাজ গুলো করে, তবে নামাজ আদায় হবে না ।] যে নামাজ আদায় করে সে মুসলিম, যে নামাজ আদায় করে না সে মুসলিম নয়তো অবিশ্বাসী। জান্নাতের কাছা কাছি যাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে নামাজ। দুনিয়াবি চিন্তা বাদ দিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করা প্রয়োজন তাদিল ই কারিমের সাথে তাদের নির্ধারিত সময়ে এবং ওজুর সাথে। নামাজ আদায়ের সময় আল্লাহ তালা এবং বান্দার মধ্যে দূরত্ব থাকে না। যে ব্যাক্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে তার সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেলা হয় যেমনটি কোন বায়াক্তি পাঁচবার নিজেকে পরিষ্কার করেন। যে ব্যাক্তি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে তাকে একশত শহীদের সমান সওয়াব দেয়া হয়।

অবশ্যই ইচ্ছাক্রিতভাবে সম্পদের, পশু যা মাঠে চরে বেড়ায় তার যাকাত দিতে হব তাদেরকে যারা যাকাতের হকদার।

যে বাক্তি যাকাত আদায় করেনি তার সম্পদ জাহান্নামের আগুনে পরিনতহবে। মহান দয়ালু আল্লাহ তালা, বছর শেষের অতিরিক্ত সম্পদের যাকাত দিতে নির্দেশ দিয়েছেন, যদি তা নিসাব পরিমান হয়। যে বাক্তি আত্মা দান করে এবং সম্পদ হচ্ছেন তিনি। তিনি যদি সমস্ত সম্পদ এবং আত্মা দিয়ে দিতে বলতেন, যারা তাকে ভালবাসেন তারা সাথে সাথেই তা দিয়ে দিতেন।

নিজের ইচ্ছায় রামজানে রোজা রাখতে হবে, যেহেতু আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের জানা উচিত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা রহমত।

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি: প্রথমে বলা **(আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহু অয়া আশ হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অয়া রাসুলুহু)**, এরমানে জানা এবং বিশ্বাস করা। এইটি **কালেমায়ে শাহাদাত**। অন্য চারটি হচ্ছে, নামাজ, যাকাত, রোজা,হজ্জ। এই পাঁচটির যেকোনো একটির সমস্যা থাকলে তার

ইসলামে সমস্যা রয়েছে। ধর্মমত সঠিক করা এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার পরে সফিয়্যা ই আলিয়্যার পথে যাওয়া উচিত। এই পথে মারিফুল্লাহ অর্জন করতে পারে এবং নাফসের ইচ্ছা থেকে মুক্ত রাখা যায় নিজেকে। যে ব্যক্তি তার সৃষ্টি কর্তাকে জানে না, সে কিভাবে বাচতে পারে, সে কিভাবে মুক্তি পেতে পারে। এই পথে মারিফুল্লাহ অর্জনের জন্য, **ফেনা বিল মারুফ** প্রয়োজন। এত আল্লাহ তালাকে ছাড়া বাকি সব কিছু ভুলে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন। যে নিজেকে জিবিত ভাবে সে কখনো মারিফাত লাভ করতে পারে না। **ফেনা** এবং **বেকা** সচেতনভাবে কার হৃদয়ে ঘটে। এটি শুনে বোঝা যায় না। যারা মারিফাতের রহমত পেয়েছে তারা এটির খোঁজ করতে থাকে সব সময়। কারো কোন কিছু পরিবর্তন করার চেষ্টা করা উচিত নয় যা নির্দেশ করা হয়েছে আইন এবং অস্থায়ী ভাবে।

নামাজের পরের দোয়া

আলহামদুলিল্লাহ্ হিরাব্বিল আলামিন। আসসালতু ওয়েসসেলামু আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহিবিহি আজমাইন। হে রাব্ব, আমাদের ইবাদাত কবুল করুন যা মারা আদায় করেছি। আমাদের শেষ নিঃশ্বাসের সময় **কালেমায়ে শাহাদাত** নাসিব করুন এবং ঈমানের সহিত মরার তৌফিক দান করুন। আমাদের মৃত আত্মীয় স্বজনদের ক্ষমা করুন। আল্লাহুমাগফিরলি ওয়ারহাম্নি ওয়া আন্তা খায়রুররাহিমিন। ত্বেফফিনি মুস্লেমিন ওয়া এইহিকনি বিসসালিহিন। আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়া লি ওয়ালিদায়্যে ওয়া লি উস্ততাজিয়্যা ওয়া আলহিকনি বিসসালিহিন।আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়া লি ওয়ালিদায়নি ওয়া লি স্তাক্সিয়্যা ওয়া লিল্মুমিনিনে ওয়েল মুমিনাত ইয়েওমে ইয়েকুমুল হিসাব। হে রাব্ব , আমাকে শয়তানের কাছ থেকে রক্ষা করুন, শত্রুর শয়তান এবং নাফসের শায়তানের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমদের বাড়িতে ধার্মিকতা, হালাল এবং মঙ্গলজনক খাবার প্রদান করুন। মুসলিমদেরকে রক্ষা করুন। ইসলামের শত্রুদের বিচ্ছিন্ন এবং তুচ্ছ করুন। আপনার স্বর্গীয় সাহায্যে, সাহায্য করুন অবিশ্বাসীদের বিরুধে জীহাদকারিদের। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুও্বুন কেরিমুন তুহিব্বুল আফ্বা ফাফু আন্নি। হে রাব্ব , আমদের মধ্যে অসুস্থদের সুস্থতা দান করুন, যারা সমস্যার মধ্যে আছে তাদের সমস্যার সমাধান করুন। আল্লাহুম্মা ইন্নি এসেলুকেসসিহহাতে ওয়েল আফিয়েতে ওয়আল আমান্তা ওয়া হুস্নুলহুলকি ওয়াঋদাঈ বিলকাদেরি বিরাহ মাতিকা ইয়া রাহ মানার রাহিমিন। হে রাব্ব আমাদের একটি উপকারি জীবন দাআন করুন, ভালো চরিত্র, ভালো মন, ভালো স্বাস্থ্য এবং ইস্তিকামাত দান করুন ।

(সঠিক এবং সত্য পথে থেকে যা আল্লাহ তালা পছন্দ করেন), আমার পিতামাতা, সন্তান, আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং আমার সকল ধর্মীয় ভাইকে। আমীন। ওয়ালহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি

ওয়ালা আল্লাহুম্মা বারিক আলা আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ওয়াল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহিল আযিম আল্কেরিম আল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুব আল হায়্যাউল কায়্যুম ওয়া এতুবু ইলায়হ।

দোয়া কবুলের শর্ত:

১–মুসলিম হওয়া।

২– আহলে সুন্নাতের অনুসারী হতে হবে। এই জন্য চার মাঝাহবের যেকোনো একটি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

৩–ফরজ পালন করা। ক্বাযা নামাজ আদায় করতে হবে এমনকি রাতের সুন্নাত এবং অন্যান্য ইবাদাতের বদলে।

সুন্নাত নফল এবং অন্যান্য ইবাদাত জার ফরজ নামাজের কাজ আছে তার ক্ষেত্রে কবুল হবে না। অর্থাৎ যদি সেগুলো থাকে তবে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না। শয়তান মুসলিমদের পথ ভ্রষ্ট করার জন্য, ফরজ নামাজের গুরুত্ব কমিয়ে দেয় এবং সুন্নাত এবং নফল বেশী আদায়ে উৎসাহিত করে। নামাজের জন্য নির্ধারিত সময়ের শুরুতেই নামাজ আদায় করতে হবে।

৪–হারাম পরিত্যাগ করতে হবে। যারা হালা খাবার খায় তাদের দোয়া কবুল হয়।

৫– আল্লাহ তালার প্রিয় কোন আওলীয়ার মাধ্যমে দোয়া করতে হবে।

ভারতের অন্যতম আলেম মুহাম্মাদ আহমেদ বিন যাহিদ, **তেরঘিব উস সালাত** কতাবের চুয়ান্ন তম অধ্যায়ে ফার্সি ভাষায় বলেছেন: "হাদিস শারিফের মধ্যে বলা হয়েছে: **(দোয়া কবুলের জন্য অবশ্যই দুটি কাজ করতে হবে। প্রথম, ইখলাসের সাথে দোয়া করতে হবে। দ্বিতীয়, খাবার এবং পোশাক হালাল হতে হবে। যদি বিশ্বাসীদের ঘরে হারামের ভয় থাকে, ঐ ঘরে দোয়া কবুল হবে না।)**.

ইখলাসের অর্থ আল্লহ তালা ছাড়া আর কোন কিছুর কল্পনা না করা এবং আল্লাহ তালা ছাড়া আর কারও মুখাপেক্ষী না হওয়া। এই জন্য, আহলে সুন্নার আলেমদের কোথায় বিশ্বাস রাখতে হবে ইসলামের নিয়ম মেনে চলার জন্য, বিশেষ করে কোন প্রানির হাক নষ্ট না করা এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রতিদিন।

তাজদিদ ই ইমান দোয়া

হে রাব্ব, আমি অনুতপ্ত, আমি সকল ভুলের জন্য দুঃখিত, ইসলামের শত্রুদের এবং মত বিরোধীদের প্ররোচনায় ত্রুটি পূর্ণ বিশ্বাসের জন্য, সকল মত বিরোধী কথা যা আমি বলেছি, পাপের যে কথাগুলো বলেছি, শুনেছি,

দেখেছি, এবং যেসকল পাপ কর্ম করেছি বালেগ হওয়ার পর থেকে। । আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, আত্ম প্রত্যয়ী আমি এই সকল ভুল কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকব। প্রথম নাবি হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং শেষ নবী রাসুল সাল্লাহি আলাইহিস সালআম, আমি তাদেরকে এবং তাদের দুজনের মাঝে আসা সকল নবী রাসুলে বিশ্বাস করি। তাদের সকলেই সত্য এবং সত্যবাদি ছিলেন আমান্তু বিল্লাহি ওয়া বি মা জাএ মিন ইন্দিল্লাহ, আলা মুরাদিল্লাহ, ওয়া আমান্তু বি রাসুলিল্লাহ, আমান্তু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়ালিয়াওমিল আখিরি ওয়া বিলকাদেরি খায়রিহি ওয়া শেঋহি মিনাল্লাহি তালা ওয়াল বসু বাদাল মাওতি হাককুন এশহেদু আন লা ইলাহা ইল্লাহি ওয়া আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু। ।

নামাজ ও স্বাস্থ্য

মুসলমানগণ, আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ হওয়ার কারণেই নামাজ আদায় করে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালার প্রত্যেকটি আদেশের মধ্যেই অসংখ্য হিকমত ও ফায়দা রয়েছে। তিনি যা কিছু নিষেধ করেছেন সেগুলোর মধ্যে ক্ষতি রয়েছে।

মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা কিছু ক্ষতি এবং লাভ সনাক্ত করতে পেরেছেন। ইসলামের সাথে স্বাস্থ্য যেভাবে মিল রয়েছে তা অন্য কোন ধর্মে বা দর্শনে নেই। আমাদের ধর্ম আমাদের নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে, যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত জীবনের শেষ পর্যন্ত। যারা নামাজ আদায় করে তারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। নামাজের কিছু উপকার নিচে তুলে ধরা হল:

১– নামাজের কাজ গুলো ধিরে ধিরে করা হয় তাতে হৃদয় ক্লান্ত হয়ে যায় না। নামাজ যেহেতু দিনের বিভিন্ন সময় আদায় করা হয়, তা মানুষকে কর্মক্ষম রাখে।

২– যারা তাদের মাথা আটবার তাদের মাথা জমিনে রাখে তাদের শরীরে রক্ত প্রবাহ ভালভাবে ঘটে। তাদের মস্তিষ্কের কোষ গুলো ভালভাবে কাজ করে, কম বুদ্ধিমত্তা এবং ব্যাক্তিতহীন মানুষ নামাজিদের মধ্যে কম দেখা যায়। তারা বেশী স্বাস্থ্যবান হয়ে থাকে। তাদের উন্মত্তার অসুস্থতা নেই, যাকে দেমেতিয়া সেনিলিস বলা হয় আধুনিক মেডিক্যাল শাস্ত্রে।

৩– নামাজের কারনে নামাজিদের চোখে রক্তের প্রবাহ ভালোভাবে হয়। যে কারনে চোখের ভেতরের অংশে চাপের সৃষ্টি হয় এবং বাইরের অংশের লিদুইডে পরিপূর্ণ হয়। ছানি পড়া থেকে এটি রক্ষা করে।

৪–ইবাদাতের সময় সমান ভাবে নড়াচড়া পাকস্থলির কাজে সাহায্য করে, পিত্তরস খুব সহজে কাজ করে এবং পিত্তকোষে কোন ক্ষতি করে না। তারা এনজাইম সমূহ কে নষ্ট করে দেয়। তারা কিডনি এবং ইউরনারির সংযোগ

স্থাপন করে। তারা কিদনির পাথর হওয়া থেকে রক্ষা করে। মুত্র থলির ভারমুক্ত হতে সাহায্য করে।

৫– পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের সময় শরীরের সকল মাংসপেশি এবং সংযোগ সমূহ ভালোভাবে কাজ করে , যেগুলো সাধারনত প্রতিদিনের কাজের সময় ব্যাবহার হয় না, বিশেষ করে বাতের রোগ নির্মূল করে, মাসল তৈরি হতে শুরু করে।

৬– পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সুসাস্থের জন্য আবশ্যক। ওজু এবং গোসলের মাধ্যমে শরীরের এবং আত্মার পবিত্রতা অর্জন হয়। নামাজ পরিষ্কার পরিচ্ছনতার অপর অপর নাম। নামাজ শারীরিক এবং মানুসিক পবিত্রতা ছাড়া আদায় করা যায় না। গোসল এবং ওজু শরীরকে পরিচ্ছন্ন করে। যারা নামাজ আদায় করে তারা শারীরিক এবং আত্মিক ভাবে পরিষ্কার।

৭–প্রতিষেধক ঔষধে, নিয়মিত শরীর চর্চা করা প্রয়োজন। নামাজের সময় গুলো নতুনভাবে রক্ত সঞ্চালন এবং নিঃশ্বাসের জন্য উপযুক্ত সময়।

৮–নামাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিহিত রয়েছে। সিজদা করার মাধ্যমে, শরীরে সঞ্চিত বিদ্যুৎ জমিনে চলে যায়। এয়াভাবে সরিরি পুনরায় জীবনী শক্তি পায়।

নামাজের এই সুফলগুলো পাওয়ার জন্য, নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, বেশী খাবার না খাওয়া এবং হালাল খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

দুনিয়ার সম্পদ, সোনা অথবা সিলভার, কার সাথে সারাজিবন থাকবে না। শঠতা ভাঙ্গা হৃদয় জোড়া লাগায়, অন্য কিছু না।

সপ্তম অধ্যায়

ইস্‌কাত-ই সালাত

মৃত ব্যাক্তির জন্য ইসকাত

'**নূরুল ইজাহ**' ও '**তাহতাভী**' নামক গ্রন্থের হাশিয়া (টিকা)তে, '**হালেবী**' ও '**দুররুল মুহতার**' নামক গ্রন্থে ক্বাজা নামাজ সম্পর্কিত অধ্যায়ের শেষভাগে, '**মুলতিকা', 'দুররুল মুন্তিকা', 'য়ীকায়ে', 'দুরার' ও 'জাওহারা'** নামক গ্রন্থসহ আরো অনেক মূল্যবান কিতাবে রোজা সম্পর্কিত আলোচনার শেষে মৃত ব্যক্তির অসিয়ত অনুযায়ী ইস্‌কাত করার আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে বর্ননা করা হয়েছে। যেমন, 'তাহাভী' নামক গ্রন্থের হাশিয়াতে বর্নিত আছে যে, ফরজ রোজা আদায় করা সম্ভব না হলে ফিদিয়া দিয়ে ইসকাতের (দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার) ব্যাপারে নাস্ (সরাসরি কোরআন বা হাদিসের দলিল) রয়েছে। নামাজ রোজার চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায়, শরীয়তসম্মত কোন উজরের কারণে যদি কেউ সময়মত তা আদায় করতে না পারে এবং পরবর্তীতে ক্বাজা আদায়ের ইচ্ছা থাকা স্বত্বেও মরনব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে অপারগ হলে, রোজার মত তার ক্বাজা নামাজগুলির জন্যও ইসকাত করা উচিত। এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। যারা বলেন নামাজের ইসকাত নাই তারা আসলে এ ব্যাপারে জাহিল। কেননা তা মাজহাবসমূহের ঐক্যমতের বিরোধীতা করার শামিল। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে, " **কোন ব্যক্তিই অন্য ব্যক্তির বদলে রোজা রাখতে পারে না, অন্যের নামাজ আদায় করতে পারে না। তবে তার রোজা ও নামাজের জন্য ফকিরকে খাওয়াতে পারে"।**

আহলি সুন্নাতের অনুসারী আলিমগণের ফযিলত সম্পর্কে যাদের ধারণা নাই এবং যারা মনে করে যে মাজহাব ইমামগণ তাদের মত মনগড়া কথা বলেন, তাদের নিকট থেকে 'ইসলামে ইস্‌কাত ও দাওর এর স্থান নাই, ইস্‌কাত খৃষ্টানদের পাপমোচনের অনুরূপ' জাতীয় বক্তব্য শুনতে পাওয়া যায়। এই ধরণের বক্তব্য তদেরকে বিপজ্জনক অবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "**আমার উম্মত, দালালাত তথা পথভ্রষ্টতার উপর ঐক্যমত পোষণ করবে না**"। এই হাদিস শরীফটি, মুজতাহিদগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন এমন বিষয়ের সঠিক হওয়ার ব্যাপারে দলিল হিসেবে ভূমিকা রাখে। অতএব, মুজতাহিদগণের ঐক্যমতের বিরোধিতাকারীরা মূলত এই হাদিসের অস্বীকারকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।

হযরত **ইবনে আবিদীন** বিতরের নামাজের আলোচনার সময় বলেছেন যে, "দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ তথা সাধারণের দ্বারাও জ্ঞাত ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন বিষয়সমূহকে অবিশ্বাসকারী ব্যক্তি কাফিরে পরিণত

হয়”। কোন বিষয়ে আলিমগণের ঐক্যমত পোষণ করার প্রক্রিয়াকে **ইজমা** বলা হয়। ইসকাতের বিষয়কে কি করে খৃষ্টানদের পাপমোচনের সাথে তুলনা করা যায়? তাদের ধর্মযাজকগণ, পাপমোচনের নামে মানুষের সাথে প্রতারণা করে, তাদের অর্থ-সম্পদ লুটে নেয়। অথচ, ইসলামে ইমাম কিংবা আলেমগণ ইস্‌কাত করে না বরং মৃতের উত্তরাধিকারীগণ করতে পারে। আর অর্থ কড়ি ইমাম বা আলেমকে নয় বরং ফকিরদেরকে প্রদান করা হয়।

আজকাল প্রায় সব যায়গায়, ইস্‌কাত ও দাওর প্রক্রিয়া ইসলাম অনুযায়ী করা হয় না। ইসলামে ইস্‌কাত নাই, যারা বলে তারা তা না বলে যদি বলত, বর্তমানে যেভাবে ইস্‌কাত করা হয় তা ইসলাম সম্মত নয়, তবে ভাল হত। সেক্ষেত্রে আমরাও তাদের সমর্থন করতাম। এরূপ বলার মাধ্যমে তারা খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারত, একইসাথে ইসলামের খেদমতও করতে পারত। নিম্নে, ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী ইস্‌কাত ও দাওর প্রক্রিয়া কিভাবে করতে হয় তা বর্ননা করা হল:

হযরত ইবনে আবিদীন, ক্বাজা নামাজের আলোচনার শেষে বলেছেন যে, যে ব্যক্তির ফায়িতা (অর্থাৎ, শরয়ী উজরের কারণে আদায় করতে না পারায় নামাজ ক্বাজা হয়েছে এমন) নামাজ রয়েছে এবং সে ঐ নামাজগুলি ইশারার মাধ্যমে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আদায় না করে থাকলে, মৃত্যুর সময় এর কাফফারা পরিশোধের জন্য উত্তরাধিকারীদেরকে অসিয়ত করে যাবে, এটা তার উপর ওয়াজিব। আর যদি কোনোভাবেই ঐ ক্বাজা আদায়ের সামর্থ্য না থাকে, তবে তার জন্য অসিয়ত করা আবশ্যক হবে না। একইভাবে মুসাফির কিংবা অসুস্থ হওয়ার কারণে পবিত্র রমজান মাসের রোজা ভঙ্গ করলে এবং পরবর্তীতে সেই রোজাগুলির ক্বাজা আদায়ের সময় কিংবা সুযোগ না পেয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হলে, তার জন্যও অসিয়ত করা জরুরী হবে না। মহান আল্লাহ তায়ালা ইনশাল্লাহ তাদের উজরকে কবুল করবেন। অসুস্থ ব্যক্তির কাফফারাসমূহের ইস্‌কাত, মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ করবেন। মৃত্যুর পূর্বে কারো জন্য ইসকাত করা যায় না। জীবিত ব্যক্তিরও নিজের জন্য ইসকাত করা জায়েজ নয়। ‘**জিলাউ-ল কুলুব**’ নামক গ্রন্থে বর্নিত আছে যে, ‘যার উপর মহান আল্লাহ তায়ালার হক্ব কিংবা বান্দার হক্ব রয়েছে তার উপর ওয়াজিব হল, দুইজন সাক্ষীর সামনে তা পরিশোধের জন্য অসিয়ত করা অথবা লিখে তাদের সামনে পাঠ করা। যার উপর কারো হক্ব নাই, তার জন্য অসিয়ত করা মুস্তাহাব’।

কাফফারার ইসকাতের জন্য অসিয়ত করে যাওয়া মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী অথবা অসিয়ত পূরণের জন্য যাকে দ্বায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ তথা মিরাছের তিনভাগের একভাগ সম্পদ থেকে, ক্বাজা হওয়া বিতরসহ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের জন্য এবং রমজানের প্রতিদিনের রোজার জন্য এক ফিতরা তথা অর্ধ সা’ (এক কেজি সাতশ পঞ্চাশ গ্রাম) পরিমাণ আটা বা চাল ফকিরদের মাঝে ফিদিয়া হিসেবে দান করবে।

কাফফারার ইসকাতের জন্য অসিয়ত করে না গেলে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের উপর তার জন্য ইসকাত করা, হানাফী মাজহাব অনুযায়ী জরুরী নয়। তবে শাফিঈ মাজহাব অনুযায়ী অসিয়ত না করে গেলেও ওয়ারিশদের উপর তার জন্য ইসকাত করা আবশ্যক। বান্দার হক্বের ক্ষেত্রে, অসিয়ত না করে গেলেও মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে পরিশোধ করা তার ওয়ারিশদের উপর, হানাফী মাজহাব অনুযায়ীও আবশ্যক। এমনকি পাওনাদারগণ, মিরাছ থেকে নিজেদের পাওনা পরিমাণ সম্পদ হস্তগত হলে, আদালতে না যেয়েও তা গ্রহণ করতে পারে।

মৃত ব্যক্তি তার ক্বাজা রোজার ফিদিয়া দেয়ার জন্য অসিয়ত করে গেলে, তার ওয়ারিশদের উপর তা তার সম্পদ থেকে পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়। কেননা ইসলামিয়াত তা পরিশোধের জন্য আদেশ করে। আর যদি অসিয়ত না করেই মৃত্যুবরণ করে তবে তা পরিশোধ করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু করলে জায়েজ হবে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, এই ফিদিয়া নামাজ বা রোজার কাফফারা হিসেবে কবুল না হলেও এর দ্বারা সদকার সওয়াব ইনশাল্লাহ হাসিল হবে, যা ঐ ব্যক্তির গুনাহ মাফের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র:) এর বক্তব্য।

এব্যাপারে '**মাজমাউল-আনহুর**' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, 'নাফস্ ও শয়তানের অনুসরণ করে নামাজ ত্যাগকারী ব্যক্তি, জীবন ছায়াহ্নে এসে এর জন্য অনুতপ্ত হয়ে (ক্বাজা নামাজগুলি আদায় করতে শুরু করে এবং) যত ওয়াক্ত ক্বাজা আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না তার জন্য ইসকাতের অসিয়ত করে, তা জায়েজ হবে না'। তবে ইমাম শাফিঈ (র:) এর '**মুসতাস্ফা**' নামক কিতাবে, এব্যাপারে জায়েজ বলা হয়েছে।

'**জিলাউ-ল কুলুব**' নামক কিতাবে বলা হয়েছে যে, বান্দার হক্বের মধ্যে ঋণ, আমানত, চুরি-ডাকাতি করে অর্জিত সম্পদ, কর্মচারীর বেতন, ক্রয়কৃত মালের কিংবা ভোগকৃত সেবার মূল্য ইত্যাদি আর্থিক হক্ব। কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করা, প্রহার করা, ক্ষতবিক্ষত করা ইত্যাদি শারীরিক হক্ব আর কাউকে গালি দেয়া, অপমান করা কিংবা কারো সম্বন্ধে গীবত করা, অপবাদ দেয়া ইত্যাদি হল ক্বালবী হক্ব।

অসিয়ত করে যাওয়া মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের একতৃতীয়াংশ দ্বারা যদি ইসকাত করা সম্ভব হয় তবে ঐ পরিমাণ মাল অসিয়ত পূরণের জন্য পরিশোধ করা, তার ওয়ারিশদের উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি তা অসিয়ত পূরণের জন্য যথেষ্ঠ না হয় তবে একতৃতীয়াংশের অধিক সম্পদ থেকে পরিশোধ করা ওয়ারিশগণের উপর ওয়াজিব হবে না। তবে জায়েজ হবে। '**ফাতহুল কাদির**' কিতাবে এরূপ উল্লেখ আছে। একইভাবে হজ্জ ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তি, হজ্জ করার জন্য কাউকে অসিয়্যত করলে এবং তার ওয়ারিশ কিংবা অন্য কেউ হজ্জের খরচ দান করলে তা জায়েজ হবে না। তবে মৃত্যুর পূর্বে অসিয়্যত না করে গেলে, ওয়ারিশ যদি নিজের সম্পদ দিয়ে তার জন্য ইসকাত

করায় ও হজ্জে যায় তবে মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধিত হবে। ওয়ারিশ ব্যতীত অন্য কারো সম্পদ দিয়ে তা জায়েজ নয় বলা হলেও, **‘দুররুল মুখতার’**, **‘মারাকিল ফালাহ’ ও ‘জিলাউল কুলুব’** নামক কিতাবগুলিতে জায়েজ হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কাফফারার ক্ষেত্রে আটার বদলে ময়দা কিংবা খেজুর, আঙ্গুর ইত্যাদিও দেয়া যায়। (কেননা এগুলি আটার চেয়ে অধিক মূল্যবান।) এগুলির পরিবর্তে স্বর্ন বা রূপাও প্রদান করা যায়। (কাগজের টাকা দিয়ে ইসকাত জায়েজ নয়।) সিজদা-ই তিলাওয়াতের জন্য ফিদিয়া দিতে হয় না।

ইসকাত ও দাওর করার পদ্ধতি

যদি ফিদিয়ার অর্থ একতৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি হয় তবে ওয়ালি উত্তরাধিকারিদের অনুমোদন ছাড়া একতৃতীয়াংশের বেশি খরচ করতে পারবে না। **কুনিয়া** কিতাবের মধ্যে লেখা হয়েছে, মৃতের যদি ঋণ নিয়ে সন্দেহ থেকে থাকে, তবে তার উত্তরাধিকারীর উইল সম্পন্ন করতে পারবেন। ইসলামে নির্দেশ আছে প্রথমে ঋণ আদায় পরিশোধ করতে হবে। ঋণদাতাদের সম্মতিতে এটি অপরিশোধিত রাখা যাবে না।

যদি মৃতের বয়স না জানা যায় বা ঠিক কি পরিমান নামাযের ইশাকাত আদায় করতে হবে, তার উইল গ্রহণযোগ্য হবে যদিও তার সম্পদের পরিমানের একতৃতীয়াংশ ইসাকাত আদায়ের জন্য অপর্যাপ্ত হয়,যত সংখ্যক নামাযের জন্য ইসাকাত আদায় করতে হবে তা ওই এক তৃতীয়াংশ দিয়ে আদায় করতে হবে এবং এতে করে ওই নামাজগুলোর ইসাকাত সহি হবে, তার উইলে উল্লেখিত অন্যান্য নামায লাঘব হবে। যখন একতৃতীয়াংশ অতিরিক্ত হবে, তার পুরো বয়স এবং নামাযের সংখ্যা অজানা থাকবে তখন উইল কার্যকর হবে না।

যদি উক্ত বাক্তির কোন সম্পদ না থাকে, অথবা তার সম্পদের একতৃতীয়াংশ সম্পদ ইসাকাতের জন্য অপ্রতুল হয় এবং কোন উইল করে না যান কিন্তু তার উত্তরাধিকারি তার ইস্কাত আদায় করতে চান তবে তিনি দার করবেন। কিন্তু উত্তরাধিকারিকে দার আদায় করতে হবে না। দার আদায়ের জন্য তিনি এক বছর অথবা এক মাসের ইসাকাতের জন্য প্রয়োজনীয় স্বর্ণ সিলভার কয়েন, ব্রেস্লেট অথবা আংটি জোগাড় করবেন। যদি মৃত বাক্তি হয় তবে ১২ বছরের জন্য, যদি মৃত নারী হয় তবে ৯ বছর হিসেবে ঋণের মোট হিসেব করতে হবে। দশ কেজি গম আকদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য এবং তিন হাজার ছয়শত গ্রাম প্রতি সৌর বছরের জন্য। উদাহরণস্বরূপ, যখন এক কেজি গম ১,৮৫ টাকা, একবছরের ইসাকাত নামাযের জন্য ছয় হাজার ছয়শত অষ্টাশি টাকার প্রয়োজন। ধরা যাক প্রত্যেকটি সোনার কয়েনের মূল্য একশত

বিশ টাকা, ইসাকাত আদায়কারী ব্যক্তি এক বছরের ইসাকাতের জন্য পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করবেন যেগুলোর ওজন সাত গ্রাম এবং বিশ সেন্টিমিটার, চারজন মানুষ যারা দুনিয়াবি আশা রাখেন না এবং যারা জানে এবং ধর্ম ভালবাসে। [এই মানুষগুলো এমন হবে, যাদেরকে ফিতরা এবং জাকাত দেয়া যায়, যদি তারা এমন গরিব না হয় সেই ইসাকাত গ্রহণযোগ্য হবে না।] মৃত ব্যক্তির অভিভাবক, ওই ব্যক্তিকে প্রথম পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা দিবেন আমলের নিয়তে এবং বলবেন, আমি তোমাকে এই স্বর্ণ অমুক মৃত ব্যক্তির সালাতের ইসাকাতের নিয়তে ডান করছি।

অতপর গরিব মানুষটি স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ পূর্বক বলবেন, আমি গ্রহণ করছি এবং নিচ্ছি এবং আপনাকে প্রদান করছি। অতঃপর ইসাকাত প্রদানকারী পুনরায় গরিব মানুষটিকে ফেরত দিবেন। এভাবে দ্বিতীয় এবং পরবর্তী মানুষকে দেবেন।

তাই, একটি দার তখনই পূর্ণ হবে যখন একই ব্যক্তিকে চারবার দিতে হবে অথবা, চার ব্যক্তিকে একই সাথে দিতে হবে এবং ফেরত নিতে হবে।

বিশটি স্বর্ণ মুদ্রার মাধ্যমে সালাতের কাফফারা আদায় হবে। যদি মৃত ব্যক্তি ৬০ বছর বয়স্ক হয়, ৪৮ x৬০= ২৮৮০ টি স্বর্ণ মুদ্রা ৪৮ বছরের সালাতের জন্য দিতে হবে। তাহলে মোট ২৮৮০/২০= ১৪৪ বার দার আদ্য করতে হবে। যদি স্বর্ণ মুদ্রার সংখ্যা দশ হয়, ৭২ টি দার প্রদান করতে হবে, যদি স্বর্ণ মুদ্রার সংখ্যা বিশ হয়, ৬৩ টি দার সম্পন্ন করতে হবে, যদি গরিব মানুষের সংখ্যা দশ হয় এবং স্বর্ণ মুদ্রাও দশ হয়, ৪৮ বছরের সালাতের জন্য ইসাকাতের কাফফারাত আদায় হবে। কারণ **যে বছরগুলোতে নামায আদায় করা হয়নি x এক বছরের জন্য স্বর্ণ মুদ্রা =গরিব মানুষের সংখ্যা x স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা x দারের সংখ্যা ।**

আমরা যে উদাহরণ দিয়েছি তার জন্য প্রযোজ্য এই হিসেব। ৪৮x৬০=৪x৫x১৪৪=৪x১০x৭২=৪x২০x৩৬=১০x১০x২৯

এটি যেভাবে করা হয়েছে,ইসাকাতের দারের মোট সংখ্যা জানার জন্য, এক বছরের স্বর্ণ মুদ্রা কে মৃতের সালাতের বয়সকে গুণ করতে হবে।

এরপরে স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যাকে গরিব মানুষের সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে। প্রথম ফল কে এবার দ্বিতীয় ফল দিয়ে ভাগ করতে হবে। এই ফলাফল দারের সংখ্যা নির্দেশ করে। গম এবং স্বর্ণ কাগজের টাকায় সমপরিমান প্রায় সময়ের ভেদে। অন্য কথায়, এই দুতির মূল্যস্ফীতি ঘটতে পারে। এই কারনে, এক বছরের গমের পরিমানের ইসাকাত পরিবর্তন হয় না, তাই এক বছরের

স্বর্ণের মুদ্রার সংখ্যা ইসাকাত ষাট স্বর্ণ মুদ্রা, যা আমারা উপরে হিসেব করেছি, তা একই পরিমান থাকে। তাছাড়া, ইসাকাতের হিসেবে গ্রহণযোগ্য হিসেব হল, বাতিক্রমি কিছু সমাধান রয়েছে, **এক মাসের সালাতের জন্য পাঁচটি স্বর্ণ মুদ্রা। রমজান মাসের রোজার জন্য ১ টি স্বর্ণ মুদ্রা।** এভাবে স্বর্ণ মুদ্রার সংখ্যা গননা করা হয়, এই উনুপাতেই হিসেব করা হয়। নামাযের ইসাকাত আদায়ের পর ৪৮ বছরের রজার ইসাকাত আদায় করতে হবে, যেগুলোর ক্বাযা অবশ্য আদায় করতে হবে, তিনি ৫ টি দার ৫ টি স্বর্ণ মুদ্রা এবং ৪ জন গরিব মানুষের মাধ্যমে আদায় করবেন। বছরের ৩০ রোজার ইসাকাতের কাফফারাতের জন্য সাড়ে বায়ান্ন কেজি গম, সোয়া পাঁচ গ্রাম সোনা। এছাড়া, হানাফি মাজহাবের মতে, **একটি স্বর্ণ মুদ্রা এক বছরের রোজার কাফফারাতের জন্য যথেষ্ট,** এবং ৪৮ বছরের জন্য ৪৮টি স্বর্ণ মুদ্রা দিতে হবে, পাঁচটি স্বর্ণ মুদ্রায় একটি দার এবং চারজন গরিব মানুষের মাধ্যমে দার পূর্ণ করার অর্থ ২০ টি স্বর্ণ মুদ্রা দান করা। ক্বাযা রোজার ইসাকাতের পর আর কিছু ইসাকাত আদায় করতে হবে, যাকাতের জন্য এরপর কুরবানির জন্য।

শপথের কাফফারা আদায়ের জন্য একদিনে দশ জন গরিব মানুষের প্রয়োজন, এবং কোন কারন ছাড়ায় একটি রোজা ভঙ্গের কাফফারার জন্য ষাট জন গরিব মানুষের প্রয়োজন একদিনে, একজন মানুষকে এক শা এর অর্ধেকের বেশী গম দেয়া যাবে না। কোন ভিন্ন ভিন্ন শপথের কাফফারায় একই দিনে দশ জন মানুষকে দেয়া যাবে না। রোজা এবং শপথের কাফফারার দাওর একদিনে করা যাবে না। যদি মৃত বাক্তি তার নির্দিষ্ট কোন শপথ উল্লেখ করে থাকেন, তবে তার জন্য দুই কেজি গম অথবা আটা, অথবা তার সমপরিমান মুল্যের স্বর্ণ অথবা সিল্ভার একদিনে দশ জন গরিব বাক্তিকে দিতে হবে। অথবা, আপনি একই বাক্তিকে পরপর দশ দিন একই পরিমানে দিতে পারেন, অথবা এই পরিমান অর্থ কোন গরিব মানুষকে দেয়ার সময় বলতে হবে, "আমি আপনাকে আমার সহকারি নিজুক্ত করলাম। এই অর্থের সাহায্যে আপনি খাবার কিনতে পারবেন, দশ দিনের খাবার কিনবেন সকাল এবং রাতের জন্য।।" যদি সে অন্য কিছু কেনে যেমন কফি অথবা পত্রিকা, তবে তা গ্রহণ যোগ্য হবে না। এটি সবচেয়ে ভালো হবে যদি কোন খাবার দকানে এই মূল্য পরিশোধ করা হয় এবং সেখানে ঐ বাক্তিকে দশ দিন সকাল সন্ধ্যা খাবার দিতে বলা হয়। এই বিষয়টি রোজা ভঙ্গের এবং জিহারের কাফফারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এই দুই ক্ষেত্রে হাফ শা গম অথবা এর সমপরিমান সম্পদ ষাট জন গরিব মানুষের মধ্যে অথবা পরপর ষাট দিন ব্যাপী একজন মানুষকে দুবেলা খাওয়াতে হবে।

নির্দিষ্ট করে না বলা কোন যাকাতের ইসাকাত আদায়ের প্রয়োজন নেই। উত্তরাধিকারীর ইচ্ছে অনুযায়ী যাকাতের ইসাকাত আদায়ের অনুমতি দেয় ফতওয়া। দাওর আদায়ের সময়, প্রত্যেকবার গরিব মানুষকে স্বর্ণ দেয়ার সম্য ওয়ালি রোজা এবং নামাজের ইসাকাতের নিয়াত করবেন।

এবং মানুষটিও বলবেন, "আমি এটি উপহার সরূপ দিলাম," জখ সরনতি ফেরত দিবেন এবং ওয়ালি বলবেন, "আমি এটি গ্রহণ করলাম" যদি ওয়ালি ইসাকাত আদায় করতে না পারেন, তবে তিনি একজন সাহায্যকারী নিজুক্ত করবেন যিনি মৃত বাক্তির ইসাকাত আদায় করবেন।

ইমাম বিরগিভীর **ওয়াসিয়াতনামা** কিতাবের শেষ অংশে এবং কাদিযাদে আহমেদ এফেন্দি রাহ্মাতুল্লাহি তালার এই কিতাবের ব্যাখ্যায় লেখা আছে :এটি একটি শর্ত, গরিব মানুষটির নিসাব পরিমান সম্পদ থাকবে না। তারা মৃত বাক্তির আত্মীয় হতে পারেন। স্বর্ণ গরিব মানুষকে দেয়ার সময়, ওয়ালি অবশ্যই বলবেন, "আমি অমুকের এত সংখ্যক সালাতের ইসাকাত আদায়ের জন্য আপনাকে দিচ্ছি।" এবং মানুষটিও অবশ্যই বলবেন, আমি এটি গ্রহণ করলাম। তিনি অবশ্যই জানবেন ঐ স্বর্ণ গুলো তার যখন সেগুলো তার অধীনে যায়। যদি তিনি না জেনে থাকেন, তাকে অবশ্যই তা জানাতে হবে। এই গরিব মানুশ্তি দয়ালু হবেন এবং অপর একজন গরীব মানুষকে দান করবেন,এবং বলবেন, "আমি অমুক বাক্তির নামাজের ইসাকাত আদায়ের জন্য দিলাম।" এবং যিনি গ্রহণ করলেন তিনিও বলবেন, আমি গ্রহণ করলাম। যখন তিনি এগুলো গ্রহণ করবেন তখন থেকে এই সম্পদগুল তার বিবেচিত হবে। যদি তিনি এগুলো আমানত বা উপহার হিসেবে গ্রহণ করেন তবে তা গ্রহণ যোগ্য হবে না। এই দ্বিতীয় বাক্তি গ্রহণ করার পর তৃতীয় আরেক জনকে দেবেন এবং বলবেন, আমি একই ভাবে তোমাকে দিলাম। এভাবে নামাজ, রোজা, যাকাত, কুরবানি, সাদাকা ফিত, আদাক, মানুষ এবং অন্যান্য প্রানির হকের দাওর সম্পন্ন করতে হবে।

ফাসিদ এবং বাতিল ক্রয় বিক্রয়ে মানুষের হক নষ্ট হয়। শপথ এবং রোজার কাফফারায় দাওর করা অনুমোদিত নয়। দাওর সম্পন্ন হউয়ার পরে, শেষ বাক্তি যিনি স্বর্ণ গুলো পেয়েছেন তিনি দয়ালু হবেন এবং পুনরায় নিজের ইচ্ছাই ওয়ালির কাছে হস্তান্তর করবেন। অভিভাবক সেটি গ্রহণ করবেন এবং বলবেন, আমি এগুলো গ্রহন করলাম। যদি বাক্তিটি সম্পদ সমূহ ফেরত না দেন তবে তা বল প্রয়োগ করে গ্রহণ করা যাবে না, কেননা সেগুলো তার সম্পদ।

অবিভাবকটি এই সকল গরীব মানুষকে কিছু স্বর্ণমুদ্রা অথবা নগদ টাকা বা মৃতের কিছু সম্পদ দান করবেন এবং সওয়াব মৃত বাক্তির আত্মার শান্তির জন্য দুয়া করবেন। যদি কোন বাক্তির সন্দেহ থাকে, অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় তবে তার দাওরে অংশগ্রহণ উচিত নয়। এই জন্য, যখন তিনি এই স্বর্ণের মালিক হবেন সাথে সাথে এই দাওর আদায় করবেন। তিনি নিজে আদায় না করে, অন্য কারো কাছে মৃত বাক্তির হয়ে কাফফারা আদায়ের দায়িত্ব প্রদান অনুমোদনযোগ্য নয়।

দাওর আদায় হবে কিন্তু, তিনি পাপী হয়ে যাবেন। যদি মৃত বাক্তির কোন সম্পদ না থাকে এবং তিনি ওয়ালি কে নির্দেশ দিয়ে যান, তবে সেই দাওর আদায় করা ওয়াজিব নয়। মৃতের পূর্বে বাক্তির উচিত এমন ভাবে ইসিকাতের জন্য ওসিয়াত করা যেন তার পরিমান তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশী না হয়। এভাবে দাওর ছাড়ায় ইসিকাত আদায় করা যাবে। তিনি পাপী হবেন যদি তিনি নির্দেশ করে যান তার ইসিকাত এক তৃতীয়াংশের কম সম্পদ দ্বারা সম্পন্ন করার জন্য, অথচ তার যথেষ্ট সম্পদ রয়েছে। পঞ্চম সংস্করণ ইবনে আবিদিন কিতাবের ২৭৩ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে, "যদি কোন অসুস্থ বাক্তির যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু থাকে, যে কিনা বয়ঃসন্ধি পার করেছে এবং চারিত্রিক ভাবে ভালো, তার কাছেই সম্পদ রেখে যাওয়া উচিত হবে তার মৃত্যু পরবর্তী কাজ সমূহ সম্পাদনের জন্য।" এই বিষয়ে **বেযযাযিয়্যা** কিতাবের মধ্যে লেখা রয়েছে, "সম্পদ পাপী এবং চরিত্রহিন সন্তানের কাছে রেখে যাওয়ার চেয়ে, ধর্মীয় কাজে ব্যয় করা উত্তম। কেননা সেটি পাপের কাজে ব্যাবহার হতে পারে। এজন্য, সম্পদ এরকম সন্তানের জন্য রেখে যাওয়া উচিত নয়, তবে তার জিবিকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন রাখতে হবে।"

বহু সংখ্যক নামাজ, রোজা, যাকাত, কুরবানী ও কসমের ক্বাযা ও কাফফারা রয়েছে এমন ব্যক্তি একতৃতীয়াংশের কম সম্পদ থেকে তা দাওরের মাধ্যমে ইসকাতের জন্য, আর বাকী সম্পদ থেকে কুরআন খতম, মিলাদ ইত্যাদি করার জন্য অসিয়্যত করলে জায়েজ হবে না। কুরআন করীম তিলাওয়াতের জন্য অর্থ নেয়া বা দেয়া উভয়টিই গুনাহের কাজ। কুরআন করীম শিখানোর জন্য অর্থ নেয়া জায়েজ কিন্তু তিলাওয়াতের জন্য জায়েজ নয়।

মৃত ব্যক্তির ক্বাযা নামাজ, রোজা ইত্যাদি ওয়ারিশ বা অন্য কারো জন্য আদায় করা জায়েজ নয়। তবে নফল নামাজ বা রোজা রেখে এর সওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহের প্রতি হাদিয়া করা জায়েজ ও উত্তম।

হজ্জ ফরজ হয়েছে এমন মৃত ব্যক্তি যদি তা আদায়ের জন্য কাউকে অসিয়্যত করে যায়, তবে ঐ ব্যক্তির জন্য তা আদায় করা জায়েজ। কেননা

হজ্জ একইসাথে শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত। অন্যের নামে নফল হজ্জ সবসময়ই করা যায়। ফরজ হজ্জের ক্ষেত্রে, ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার পরে তার ক্বাযা উকিলের পক্ষ থেকে আদায় করা জায়েজ।

'মাজমাউল আনহার' ও **'দুররুল মুনতিকা'** নামক কিতাবে বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির জন্য ইসকাত দাফনের পূর্বেই করা উচিত। **'কুহিস্তানী'** এর মধ্যে দাফনের পরেও জায়েজ বলে উল্লেখ আছে।

মৃত ব্যক্তির নামাজ, রোজা, যাকাতের ইসকাতের জন্য এক ফকীরকেই নিসাবের চেয়ে অধিক পরিমাণ সম্পদ দান করা জায়েজ। এমনকি ইসকাতের সব স্বর্ন এক ফকীরকেও দেয়া সম্ভব।

মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির ক্বাযা নামাজের ফিদিয়া প্রদান করা জায়েজ নয়। তবে এরূপ ব্যক্তির ক্বাযা রোজার ফিদিয়া দেয়া জায়েজ। ঐ ব্যক্তির জন্য মাথা দিয়ে ইশারার মাধ্যমে নামাজ আদায় করতে হবে। এরূপ ইশারার মাধ্যমে যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামাজ আদায় না করা হয় তবে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে। এর ক্বাযা করতে হবে না। পরে সুস্থ হলে না রাখা রোজার ক্বাযা আদায় করতে হবে। সুস্থ না হয়েই মারা গেলে আদায় না করা রোজাগুলিও ক্ষমা করে দেয়া হয়।

অষ্টম অধ্যায়

বত্রিশ ও চুয়ান্ন ফরজ

শিশু যখন বালিগ হয় এবং কোন কাফির যখন কালিমা-ই তাওহীদ বলে, অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে এবং এর অর্থ বুঝে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তখন সে মুসলমান হয়ে যায়। মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে কাফির ব্যাক্তির পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। কিন্তু অন্য মুসলমানদের মত তাদেরও সামর্থ্য অনুযায়ী সুযোগ পাওয়ার সাথেসাথে ঈমানের ছয়টি শর্ত তথা 'আমানতু' মুখস্ত করা এবং এর অর্থ শিখে পূর্নাঙ্গরূপে বিশ্বাস করা আবশ্যক। তাদের বলা উচিত: আমরা বিশ্বাস করলাম যে, ইসলামের সবকিছুই অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক যা কিছু করতে আদেশ দেয়া হয়েছে আর যা কিছু করতে নিষেধ করা হয়েছে তার সবই মহান আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকেই তার হাবীবের মাধ্যমে মানুষদের জানানো হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে সময় সুযোগ অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনের ফরজ তথা যা করতে আদেশ দেয়া হয়েছে এবং হারাম তথা যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা জানতে হবে, শিখতে হবে এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে সম্মূখীন হতে হয় এমন ফরজ ও হারাম সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা সবার উপরে ফরজ। এগুলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা, ফরজসমূহ পালন করা এবং হারামসমূহ থেকে বিরত থাকা যে ফরজ তা অস্বীকার করলে অর্থাৎ অবিশ্বাস করলে ঈমান চলে যায়। এই ফরজ ও হারামসমূহ থেকে কোন একটিকেও যদি অপছন্দ করে, গ্রহণ না করে তবে সে **মুরতাদ্** হয়ে যায়। মুরতাদ ব্যাক্তি '**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ**' বলার মাধ্যমে এবং ইসলামের কিছু আদেশ পালনের মাধ্যমে যেমন নামাজ আদায় করে, রোজা রেখে, হজ্জে যেয়ে, দান-সদকা করার মাধ্যমে মুসলমান হতে পারে না। এইসব সতকর্মগুলি আখিরাতে তার কোন উপকারে আসবে না। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে শরীয়তের যে ফরজ কিংবা হারামকে অস্বীকার করেছে তার জন্য অনুশোচিত হতে হবে, তওবা করে পুনরায় বিশ্বাস করে পালন করতে হবে।

মুসলিম আলেমগণ, প্রত্যেক মুসলমানের শিখে, বিশ্বাস করে পালন করা আবশ্যক এমন বত্রিশটি ফরজ নির্ধারন করে দিয়েছেন। এছাড়া আলাদাভাবে আরো চুয়ান্নটি ফরজের ব্যাপারেও উল্লেখ করেছেন।

বত্রিশ ফরজ

ঈমানের শর্ত: ছয়টি

ইসলামের শর্ত: পাঁচটি

নামাজের ফরজ: বারটি

অজুর ফরজ: চারটি

গোসলের ফরজ: তিনটি

তায়াম্মুমের ফরজ: দুইটি

কেউ কেউ বলেছেন, তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি। এই হিসাব অনুযায়ী সর্বমোট তেত্রিশটি ফরজ হয়।

ঈমানের শর্তসমূহ:

১. আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্ব ও একত্ববাদে বিশ্বাস করা।

২. ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস করা।

৩. মহান আল্লাহ্ তায়ালা যে সব আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন সেগুলির উপর বিশ্বাস করা।

৪. সকল নবী ও রাসূলের উপর বিশ্বাস করা।

৫. পরকালে বিশ্বাস করা।

৬. কদরে, অর্থাৎ ভাল মন্দ যা কিছুই হয় তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তা বিশ্বাস করা।

ইসলামের শর্তসমূহ:

৭. কালিমা-ই শাহাদাত বলা ও স্বীকার করা।

৮. প্রতিদিনের জন্য নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ নিজ নিজ সময় অনুযায়ী আদায় করা।

৯. সম্পদের যাকাত আদায় করা।

১০. রমজান মাসের প্রত্যেকদিনে রোজা রাখা।

১১. সামর্থ্য থাকলে জীবনে একবার হজ্জ পালন করা।

নামাজের ফরজসমূহ:

নামাজের বাইরের ফরজ সাতটি। এগুলোকে নামাজের শর্ত বলা হয়।

১২. অপবিত্র অবস্থা থেকে অজু কিংবা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা।

১৩. নাপাকী থেকে শরীর, পোশাক ও নামাজের স্থানকে পবিত্র করা।

১৪. সতর তথা লজ্জাস্থান আবৃত করা।

১৫. কিবলামুখী হওয়া।

১৬. নামাজের ওয়াক্ত হওয়া।

১৭. নিয়্যাত করা।

১৮. ইফতিতাহ্ তথা তাক্বীরে তাহরিমা দেয়া।

নামাজের ভিতরের ফরজ পাঁচটি। এগুলোকে নামাজের রুকন বলা হয়।

১৯. কিয়াম করা, অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা।

২০. কিরাত অর্থাৎ পবিত্র কুরআন থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করা।

২১. রুকু করা।

২২. সেজদা করা।

২৩. শেষ বৈঠকে বসা।

অজুর ফরজসমূহ:

২৪. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা।

২৫. কনুইসহ দুই হাত ধৌত করা।

২৬. মাথার একচতুর্থাংশ মাসেহ করা।

২৭. গোড়ালিসহ দুই পা ধৌত করা।

গোসলের ফরজসমূহ:

২৮. কুলি করা।

২৯. পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা।

৩০. সমস্ত শরীর ভালভাবে ধৌত করা।

তায়াম্মুমের ফরজসমূহ:

৩১. অজু কিংবা গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিয়্যাত করা।

৩২. দুই হাত পবিত্র মাটিতে ঘসে মুখমণ্ডল মাসেহ করে পুনরায় দুই হাত মাটিতে ঘসে দুই হাতের কনুই থেকে শুরু করে হাতের তালু পর্যন্ত ভালভাবে মাসেহ করতে হবে।

চুয়ান্ন ফরজ

১. আল্লাহর একত্ববাদের উপর ঈমান আনা।

২. হালাল খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা।

৩. অজু করা।

৪. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা।

৫. গোসল ফরজ হলে গোসল করা।

৬. সকল ধরণের রিযিক একমাত্র আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে তা বিশ্বাস করা।

৭. পবিত্র ও হালাল পোষাক পরিধান করা।

৮. মহান আল্লাহ্ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করা।

৯. তুষ্ট হওয়া।

১০.প্রাপ্ত নিয়ামতের বিনিময়ে মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা।

১১.ভাল হোক কিংবা মন্দ হোক সর্বাবস্থায় ক্বদরের উপর সন্তুষ্ট থাকা।

১২.বালা-মুসীবতের সম্মুখীন হলে সবর তথা ধৈর্য ধারণ করা।

১৩.গুনাহ মাফের জন্য তওবা করা।

১৪.ইবাদতসমূহ শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা।

১৫.শয়তানকে দুশমন হিসেবে গ্রহণ করা।

১৬.পবিত্র কুরআন শরীফের যাবতীয় হুকুমকে মেনে নেয়া।

১৭.মৃত্যুকে হক্ক হিসেবে মেনে নেয়া।

১৮.মহান আল্লাহ্ তায়ালার বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব এবং শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা।

১৯.মা-বাবার সাথে উত্তম আচরণ করা।

২০.সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।

২১.আত্মীয় স্বজনদের জিয়ারত করা।

২২.আমানতের খিয়ানত না করা।

২৩.সর্বদা মহান আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে ভীত হয়ে, বিলাসিতা ও বাড়াবাড়ি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

২৪.মহান আল্লাহ্ তায়ালা ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করা।

২৫.নিজেকে পাপ থেকে বিরত রেখে ইবাদতে মগ্ন করা।

২৬.মুসলমান আমীরদের আনুগত্য করা।

২৭.শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে জগতের প্রতি নজর দেয়া।

২৮.আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্ব, একত্ববাদ ও সৃষ্টি সম্পর্কে তাফাক্কুর তথা গবেষণা করা।

২৯.অশ্লীল কথাবার্তা থেকে জবানকে রক্ষা করা।

৩০.ক্বলবকে পবিত্র রাখা।

৩১.কাউকে নিয়া ঠাট্টাতামাসা না করা, বিদ্রুপ না করা।

৩২.হারামের দিকে দৃষ্টিপাত না করা।

৩৩.মুমিন হিসেবে সর্বাবস্থায় নিজের কথার প্রতি সৎ থাকা।

৩৪.অশ্লীল ও অপছন্দনীয় কোনকিছু শ্রবণ করা থেকে বিরত থাকা।

৩৫.এলেম অর্জন করা।

৩৬.বাটখাড়া, দাঁড়িপাল্লা ও পরিমাপকের যন্ত্রসমূহকে ন্যায় ও সততার সাথে ব্যবহার করা।

৩৭.আল্লাহ তায়ালার আজাব থেকে পরিত্রাণের ব্যাপারে কখনোই নিশ্চিত না হয়ে সর্বদা ভীতসন্ত্রস্ত থাকা।

৩৮.মুসলমান ফকিরদেরকে সাহায্য করা, তাদেরকে যাকাত প্রদান করা।

৩৯.মহান আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কোন অবস্থাতেই নিরাশ না হওয়া।

৪০.নাফসের খায়েশের অনুগত না হওয়া।

৪১.আল্লাহ তায়ালার সন্‌তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষকে খাওয়ানো।

৪২.যথেষ্ঠ পরিমাণ রিযিক অর্জনের জন্য পরিশ্রম করা।

৪৩.সম্পদের যাকাত ও শস্যের উশুর প্রদান করা।

৪৪.হায়েজ ও নিফাসের সময় স্ত্রী-সহবাস না করা।

৪৫.ক্বলবকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখা।

৪৬.অহংকার থেকে দূরে থাকা।

৪৭.বালিগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি এমন ইয়াতিমের সম্পদ সংরক্ষণ করা।

৪৮.বালকদের দিকে কুদৃষ্টি না দেয়া।

৪৯.দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ সময়মত আদায় করা।

৫০.অন্যায়ভাবে পরের সম্পদ ভোগ না করা।

৫১.মহান আল্লাহ্‌ তায়ালার সাথে কাউকে শরিক না করা।

৫২.সকল ধরণের যিনা থেকে বিরত থাকা।

৫৩.মদ ও অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পান না করা।

৫৪.অপ্রয়োজনে কসম না খাওয়া।

কুফরের আলোচনা:

মন্দ কাজের মধ্যে সর্বাধিক খারাপ হল আল্লাহ্‌ তায়ালাকে অবিশ্বাস করা তথা নাস্তিক হওয়া। ধর্মীয়ভাবে যেসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা আবশ্যক, সেগুলোকে অবিশ্বাস করলে কুফরী হয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলেও কুফরী হবে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, মহান আল্লাহ্‌ তায়ালার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসে অবহিত করেছেন তার সবকিছুকেই ক্বালবের দ্বারা বিশ্বাস করে, মৌখিকভাবে স্বীকার করা ও ঘোষণা দেয়াকে ঈমান বলে। মৌখিকভাবে বলার ক্ষেত্রে চরম বাঁধার সম্মুখীন হলে এবং এ কারণে মুখে স্বীকার করতে না পারলে

গুনাহগার হবে না। ঈমান অর্জনের জন্য, কুফরের আলামত হিসেবে ইসলামিয়্যাত যেসব বিষয়কে চিহ্নিত করেছে তা বলা, করা কিংবা ব্যবহার করা থেকেও বিরত থাকতে হবে। ইসলামিয়্যাতের বিধানসমূহ তথা ইসলামের আদেশ ও নিষেধসমূহের কোন একটিকে অবজ্ঞা করা অথবা পবিত্র কুরআন শরীফ, ফেরেশতা ও পয়গম্বর আলাইহিস-সালাতু ওয়াস- সালামদের থেকে কোন একজনকে তাচ্ছিল্য করা কুফরের আলামতের অন্তর্ভুক্ত। ইনকার তথা অস্বীকার করার অর্থ হল শ্রবণ করার পর তা অবিশ্বাস করা, সত্য হিসেবে মেনে না নেয়া। সন্দেহ পোষণ করাও ইনকারের অন্তর্ভুক্ত।

কুফরের প্রকারসমূহ:

কুফর তিন প্রকার। এগুলো হল জাহলী, জুহুদী ও হুকমী।

১. **জাহলী;** শুনতে পায়নি, চিন্তা করার সুযোগ পায়নি এবং একারণে ঈমান গ্রহণ করেনি এমন কাফিরদের কুফুরীকে 'কুফর-ই জাহলী' বলা হয়। জাহল্ তথা অজ্ঞতা দুই ধরণের। প্রথমটি হল, সাধারণ অজ্ঞতা। যার অজ্ঞতা সম্পর্কে অন্যদের ধারণা আছে। এদের মাঝে ভ্রান্ত আক্বীদা নাই। অনেকটা পশুর মত। কেননা মানুষ ও পশুর মাঝের পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য হল ইলম ও ইদরাক (বুঝার ক্ষমতা)। আসলে তারা পশুর চেয়েও অধম। কেননা পশুরা তাদেরকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে বিষয়ে অনেক অগ্রগামী। দ্বিতীয়টি হল, 'জাহলী মুরাক্কাব'। ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট আক্বীদায় পূর্ণ। ইসলামী ইতিকাদের স্পষ্ট নাস্ রয়েছে এমন মৌলিক বিষয় সম্পর্কে গ্রিক দার্শনিকদের মত, মনগড়া ইতিকাদের অনুসারী বাহাত্তরটি বিদয়াত ফিরকা এর অন্তর্ভুক্ত। এই জাহালত প্রথমটির চেয়ে অধিক ভয়াবহ। চিকিৎসা নাই এমন এক মহারোগের মত।

২. **কুফর-ই জুহদী**, একে কুফর-ই ইনাদীও বলা হয়। জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে জেদের বশবর্তী হয়ে কুফুরী করা। অহংকারের কারণে, ক্ষমতার মোহে ও লোভে কিংবা প্রতিপত্তি হ্রাসের আশঙ্কায় তারা ঈমান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। ফিরাউন ও তার অনুসারীদের, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কুফর এই ধরণের।

৩. তৃতীয় প্রকারের কুফর হল, **কুফর-ই হুকমী।** ইসলামিয়্যাতের মতে ঈমানহীনতার আলামত হিসেবে বিবেচিত কথা, কর্ম কিংবা আচরণ করলে ব্যক্তি কাফির হিসেবে পরিগণিত হয়, যদিও সে ক্বালবের দ্বারা ঈমানকে সমর্থন করে ও মৌখিকভাবে তা স্বীকার করে। **ইসলামিয়্যাত যা কিছুকে তাচ্ছিল্য করে সেগুলোকে সম্মান প্রদর্শন করলে আর যা কিছুকে সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দেয় সেগুলোকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করলে কুফুরী হয়।**

কুফর হিসেবে বিবেচিত কথা, কর্ম ও আচরণ:

১. আল্লাহ্ তায়ালা, আরশ থেকে কিংবা আসমান থেকে আমাদের দেখছেন বললে কুফর হবে।

২. তুমি আমাকে যেভাবে জুলুম করছ, আল্লাহ্ তায়ালাও তোমার সাথে একইভাবে জুলুম করছে বললে কুফুরী হবে।

৩. অমুক মুসলমান আমার চোখে ইয়াহুদীর মত, বললে কুফুরী হবে।

৪. কোন মিথ্যা কথার ব্যাপারে, আল্লাহ্ তায়ালা জানে যে এটি সত্য বললে কুফুরী হবে।

৫. ফেরেশতাদের ব্যপারে অপমানজনক কিছু বললে কুফুরী হবে।

৬. পবিত্র কুরআন মজীদ সম্পর্কে এমনকি এর একটি হরফকেও যদি তাচ্ছিল্য করা হয় কিংবা অস্বীকার করা হয় তবে তা কুফুরী হবে।

৭. বাজনা বাজিয়ে তার তালে তালে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করা কুফুরী।

৮. প্রকৃত তাওরাত এবং ইনজিল কিতাবকে অস্বীকার করা, তা সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা কুফুরী। (বর্তমানে অবিকৃত কোন তাওরাত ও ইনজিল মওজুদ নাই)

৯. পবিত্র কুরআনের অবিখ্যাত যে সকল ক্বিরাত রয়েছে শুধুমাত্র সেগুলোকে কুরআন হিসেবে গ্রহণ করলে কুফর হবে।

১০. পয়গম্বরদের মধ্য থেকে কোন একজনকেও যদি উপহাস করা হয় তা কুফুরী হবে।

১১. পবিত্র কুরআন শরীফে যে পঁচিশজন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের কাউকে পয়গম্বর হিসেবে অস্বীকার করলে কুফর হবে।

১২. অতি সৎকর্ম সম্পাদনকারী কাউকে পয়গম্বরদের থেকেও উত্তম বললে কুফর হবে।

১৩. পয়গম্বরগণ অভাবী ছিল বললে কুফুরী হবে। কেননা তারা নিজেরাই তাদের দরিদ্রতা গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন।

১৪. কেউ নিজেকে পয়গম্বর বলে দাবী করলে সেতো কাফির হবেই, তাকে যারা বিশ্বাস করবে তারাও কাফির হবে।

১৫. আখিরাতে সংঘটিত হবে এমন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করলে কুফুরী হবে।

১৬. কবরের আযাব ও পরকালীন শাস্তিকে অবিশ্বাস করলে কুফুরী হবে।

১৭. জান্নাতে মহান আল্লাহ্ তায়ালার দর্শন লাভের বিষয়কে অস্বীকার করলে কুফর হবে। আমি জান্নাত চাই না, বললে কুফর হবে।

১৮. বিজ্ঞানের যে সব তথ্য ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলোকে গ্রহণ করলে কিংবা ইসলামের চেয়ে অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করলে কুফর হবে।

১৯. নামাজ আদায় করা আর না আদায় করা একই কথা, বললে কুফুরী হবে।

২০. যাকাত আদায় করব না, বললে কুফর হবে।

২১. সূদ খাওয়া যদি হালাল হইত কতই না ভাল হইত! বললে কুফরী হবে।

২২. ইশ জুলুম করা যদি হালাল হইত, বললে কুফুরী হবে।

২৩. হারামভাবে অর্জিত সম্পদ থেকে ফকিরকে দান করে সওয়াব অর্জনের আশা করলে কুফরী হবে। একইভাবে ফকির যদি তাকে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদের হারাম হওয়ার বিষয়টি জেনেশুনে দানকারীর কল্যানের জন্য দোয়া করে, তাও কুফুরী হবে।

২৪. ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর কিয়াস্ হক্ব নয়, বললে কুফুরী হবে। ওহাবীদের এ ব্যপারে সতর্ক হওয়া উচিত।

২৫. মশহুর (বিখ্যাত) সুন্নাতের কোনটিকে অপছন্দ করলে, কুফুরী হবে।

২৬. **'আমার কবর ও মিম্বারের মাঝের অংশটুকু জান্নাতের বাগানগুলির থেকে একটি বাগান'** এই হাদীস শরীফটিকে অস্বীকার করলে, ঠাট্টা করলে কিংবা যদি বলে যে, আমি ওখানে মিম্বার, দেয়াল ও কবর ব্যতীত আর কিছু দেখছি না, বললে কুফুরী হবে।

২৭. ইসলামের আদর্শ ও জ্ঞানকে অবিশ্বাস করা, এই ধরণের ইলম ও আলেমকে অপদস্ত করলে, অসম্মান করলে কুফর হবে।

২৮. কেউ যদি কাফির হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে তবে এর নিয়্যাত করার সাথে সাথে কাফির হয়ে যাবে।

২৯. অন্য কোন ব্যক্তির জন্য, সে যেন কাফির হয়ে যায়, এই ধরণের ইচ্ছা পোষণ করলে কুফুরী হবে।

৩০. যেসব আঁচার-আচরণ, কথা-বার্তা বললে কুফুরী হয় সেগুলি জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে বললে, ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়। না জেনে বললেও, অধিকাংশ আলেমের মতে, কুফুরী হয়।

৩১. একইভাবে যে সব কাজ-কর্ম করলে কুফুরী হয় তা জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে করলে ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়। অধিকাংশ আলেমের মতে, না জেনেশুনে করলেও কুফুরী হয়।

৩২. গলায় ক্রুশ পরিধান করলে কিংবা এরূপ কুফরের সাথে সম্পর্কিত চিহ্ন বা আলামত সমৃদ্ধ কোন কিছু পরিধান করলে কুফুরী হবে। তা 'দারুল হারব' তথা অমুসলিমদের রাজ্যে অবস্থানরত অবস্থায় ব্যবহার করলেও কুফুরী হবে। এই ধরণের পোশাক বা চিহ্ন সম্বলিত কিছু কৌতুক করার জন্য, অন্যদেরকে হাসানোর জন্য কিংবা ঠাট্টা-তামাসা করার জন্য ব্যবহার করলেও কুফরের কারণ হবে।

৩৩. অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবের দিনগুলিতে, ঐ দিবসের সাথে সম্পর্কিত কোন কিছু তাদের মত করে ব্যবহার করলে, তাদেরকে উপহার দিলে কিংবা উদযাপন করলে কুফুরী হবে।

৩৪. কাউকে অবাক করার জন্য, হাসানোর জন্য, মন আকর্ষনের জন্য কিংবা উপহাস করার জন্য কিছু বললে তা কুফর-ই হুকমী থেকে মুক্ত হবে। একইভাবে ক্ষোভ, ক্রোধ কিংবা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কিছু বললে, তাও কুফর-ই হুকমী হবে না।

৩৫. কেউ কারো গীবত করার পর যদি বলে, আমি গীবত করিনি বরং তার মাঝে যা আছে তাই প্রকাশ করেছি বললে, কুফুরী করা হবে।

৩৬. শৈশবকালে অবিভাবকের পক্ষ থেকে বিয়ে দেয়া হয়েছে এমন মেয়ে আকেল ও বালেগ হওয়ার সময়, ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান বা ধারণা না রাখলে, ঐ নিকাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং সে মুরতাদ হবে। একইভাবে তা পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৩৭. কোন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যাকারী কিংবা হত্যার আদেশদানকারী ব্যক্তিকে, ভাল করেছ বললে কুফুরী হবে।

৩৮. শরিয়ত অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডতুল্য শাস্তি পায় না এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাকে হত্যা করা আবশ্যক, বললে কুফুরী হবে।

৩৯. যে কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাতকারী কিংবা হত্যাকারী জালিম ব্যক্তিকে, ভাল করেছ এটাই তার জন্য উপযুক্ত হয়েছে বললে কুফুরী হবে।

৪০. মিথ্যামিথ্যিভাবে কাউকে, আল্লাহ্ তায়ালা জানেন যে আমি তোমাকে আমার সন্তানদের চেয়েও অধিক ভালোবাসি, বললে কুফুরী হবে।

৪১. কেউ হাঁচি দেয়ার পর এর জবাবে অন্যকেউ '**ইয়ারহামুকাল্লাহু**' বলার পরে সে যদি বলে, হাঁচির জবাবে এভাবে বলা উচিত নয়, তাহলে তা কুফুরী হবে।

৪২. অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে বিশ্বাস না করে এবং গুরুত্বহীন মনে করে নামাজ না পড়লে, রোজা না রাখলে এবং যাকাত না দিলে কুফর হবে।

৪৩. মহান আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের থেকে নিরাশ হলে কুফর হবে।

৪৪. মূলত হারাম নয়, কিন্তু অন্য কোন কারণে পরবর্তীতে হারাম হিসেবে বিবেচিত কোন সম্পদ, অর্থকড়ি ইত্যাদিকে '**হারাম লি-গাইরিহি**' বলা হয়। চুরি-ডাকাতি করার মাধ্যমে কিংবা হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ এরূপ হারামের অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি এধরণের সম্পদকে হালাল বলে তবে কুফর হবে না। মৃত প্রাণী, শুকর, মদ ইত্যাদির মত মৌলিকভাবেই হারাম কিছুকে '**হারাম লি-আইনিহি**' বলা হয়। কেউ যদি এগুলোকে হালাল বলে দাবী করে তাহলে কুফর হবে।

৪৫. যে সব গুনাহের হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই সেগুলোকে যদি কেউ হালাল বলে তবে কুফর হবে।

৪৬. আযান, মসজিদ, দ্বীনি কিতাব ইত্যাদির মত ইসলাম অনুযায়ী সম্মানিত কোন কিছুকে অসম্মান করলে, উপহাস করলে কুফর হবে।

৪৭. জেনে শুনে অজু বিহীন অবস্থায় নামাজ আদায় করলে কুফর হবে।

৪৮. জেনে শুনে, ক্বিবলা ব্যতীত অন্য কোন দিকে ফিরে নামাজ আদায় করলে কুফর হবে। কেউ যদি বলে, নামাজ আদায়ের জন্য ক্বিবলামুখী হওয়া আবশ্যক নয়। তবে তাও কুফুরী কর্ম হবে।

৪৯. কোন মুসলমানকে, সে যেন কাফির হয়ে যায় এটা প্রত্যাশা করে তাকে কাফির বললে কুফর হবে।

৫০. গুনাহের কোন কাজকে গুনাহ হিসেবে বিবেচনা না করে করতে থাকলে কুফর হবে।

৫১. ইবাদত করার আবশ্যকীয়তা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার জরুরতকে অবিশ্বাস করলে কুফর হবে।

৫২. ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক আদায়কৃত করকে সুলতানের সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করলে কুফর হবে।

৫৩. কাফিরদের ধর্মীয় উপাসনা বা উৎসবকে পছন্দ করলে, জরুরী না হওয়া সত্ত্বেও তাদের পোশাক পরিধান করলে, তাদের ধর্মীয় চিহ্ন বা আলামত সম্বলিত কোন কিছু ব্যবহার করলে এবং এগুলোর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করলে কুফর হবে।

৫৪. কেউ যদি হলফ করে বলে যে, অমুক জিনিস অমুকের কাছে আছে অথবা নাই, যদি এরূপ না হয় তবে আমি কাফির হয়ে যাব, কিংবা ইহুদী হয়ে যাব। এমতাবস্থায় ঐ জিনিসটি সে যেভাবে বলছে সেভাবে অমুকের কাছে থাকুক বা না থাকুক, স্বেচ্ছায় তার দ্বারা কুফরে প্রবেশ করা হবে।

৫৫. যিনা, সমকামিতা, সূদ, মিথ্যা ইত্যাদির মত সকল ধর্মানুযায়ী হারাম হিসেবে বিবেচিত কোন পাপাচারের জন্য, ইশ! এটা যদি হালাল হত, আমিও তাহলে উপভোগ করতে পারতাম, বলে আকাঙ্ক্ষা করলে কুফর হবে।

৫৬. সকল পয়গম্বর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের উপর ঈমান এনেছি কিন্তু হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম পয়গম্বর ছিলেন কিনা তা জানি না, বললে কুফর হবে।

৫৭. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ পয়গম্বর হিসেবে বিশ্বাস না করলে অথবা এ ব্যাপারে অজ্ঞ হলে কাফির হবে।

৫৮. কিউ যদি বলে যে, পয়গম্বরগণ যা বলেছেন তা সত্য হলে আমরা বেঁচে গেছি, তাহলে তা কুফর হবে। কেননা এ ধরণের বক্তব্যের দ্বারা মূলত পয়গম্বরদের প্রচারিত দ্বীনের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হয়।

৫৯. কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, চল, নামাজ আদায় করি এবং এর উত্তরে ঐ ব্যক্তি, আমি নামাজ আদায় করব না বললে কুফর হবে।

তবে ঐ ব্যক্তি যদি এর দ্বারা এটা বুঝাতে চায় যে, তোমার কথায় নামাজ পড়ব না বরং আল্লাহ্ তায়ালার আদেশের কারণে নামাজ আদায় করব, তাহলে কুফর হবে না।

৬০. কেউ যদি কাউকে বলে যে, দাঁড়িকে এক মুঠির চেয়ে ছোট কর না অথবা এক মুঠির চেয়ে অতিরিক্ত অংশ কাট, নখ কাট কেননা এগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত আর এর প্রতি উত্তরে ঐ ব্যক্তি আমি কাটব না বললে কুফর হবে। অন্যান্য সুন্নাতের ক্ষেত্রেও এই হুকুম প্রযোজ্য। তবে যদি ব্যক্তি তার কথার দ্বারা বুঝাতে চায় যে, তুমি বলছ বলে নয় বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত হওয়ার কারণে আমি করব, তাহলে কুফর হবে না। সুন্নাতকে অস্বীকার বা অগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বলে থাকলে কুফর হবে।

৬১. কেউ যদি বলে, দাঁড়ি রাখলাম, গোঁফ ছোট করলাম কই কোন উপকারতো হল না, তবে এর দ্বারা কুফুরী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেননা, দাঁড়ি রাখা ও গোঁফ ছোট করা সুন্নাত, আর এই ধরণের আচরণ দ্বারা সুন্নাতকে উপহাস করা হয়।

৬২. কোন ব্যক্তি মাথা থেকে পা পর্যন্ত রেশমের কাপড় পরিধান করলে এবং অন্য কেউ তার এই অবস্থাকে, মুবারক হোক বললে তা ঐ ব্যক্তির জন্য কুফুরীর আচরণ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৬৩. কেউ ক্বিবলার দিকে পা প্রসারিত করে শুলে কিংবা ক্বিবলামুখী হয়ে প্রস্রাব করার মত কোন মাকরুহ কাজ করে এবং ঐ অবস্থায় কেউ তাকে এসব কাজ মাকরুহ, তুমি এগুলি করা থেকে বিরত থাক বলার পর ঐ ব্যক্তি যদি জবাবে বলে, আমার দ্বারা কৃত সকল গুনাহ যদি এমন মাকরুহ হত, তবে তা কুফর হিসেবে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা এর দ্বারা সে মাকরুহকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করেছে।

৬৪. কোন ব্যক্তির সেবক দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশের সময় তার মনিবকে সালাম প্রদান করলে এবং মনিবের নিকট অবস্থানরত কোন ব্যক্তি যদি এজন্য তাকে বলে, চুপ কর, মনিবকে কি এভাবে সালাম দিতে হয়? তাহলে যে ব্যক্তি বলল তার দ্বারা কুফর সম্পাদিত হবে। তবে ঐ ব্যক্তি যদি আদব কায়দা শিখানোর উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকে, যেমন সালাম অন্তর থেকে দেয়া উচিত তা বুঝাতে চাইলে কুফর হবে না।

৬৫. ঈমান বৃদ্ধি পায় কিংবা হ্রাস পায় বললে কুফর হয়। কিন্তু এর দ্বারা যদি ঈমানের পরিপূর্ণতা কিংবা দৃঢ়তার হ্রাস বা বৃদ্ধি বুঝানো হয় তবে তা কুফর হবে না।

৬৬. মুসলমানদের ক্বিবলা দুইটি, একটি কা’বা শরীফ অপরটি কুদুস্ বললে কুফুরী হবে। অর্থাৎ বর্তমানে ক্বিবলা দুইটি বললে কুফর হবে। কিন্তু যদি এভাবে বলে যে, পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাস ক্বিবলা ছিল পরবর্তীতে কা’বা শরীফ ক্বিবলা হয়েছে বললে কুফর হবে না।

৬৭. কেউ যদি কোন ইসলাম আলেমের সাথে বিনা কারণে রাগ করে, অপছন্দ করে তবে তার এই ব্যবহারের দ্বারা কুফরে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত।

৬৮. কোন কোন আলেমের মতে, কেউ যদি বলে যে, খাবার খাওয়ার সময় কথা না বলা মাজুসী তথা অগ্নিপূজকদের ভাল অভ্যাসগুলির একটি অথবা হায়েজ বা নিফাস অবস্থায় স্ত্রী সহবাস না করা অগ্নিপূজকদের একটি ভাল অভ্যাস, তবে এর দ্বারা কুফরের সম্ভাবনা রয়েছে।

৬৯. কোন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হল, তুমি কি মুসলমান? এমতাবস্থায় যদি সে উত্তরে বলে, ইনশাল্লাহ এবং এর দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছে তা যদি ব্যাখ্যা না করে তবে তা কুফুরী হবে।

৭০. কারো সন্তান মৃত্যুবরণ করার পর কেউ যদি তাকে বলে, আল্লাহ্ তায়ালার প্রয়োজন হয়েছে তোমার সন্তানের তাই নিয়ে গেছেন, তবে যে ব্যক্তি এরূপ বলল সে কুফুরী করল।

৭১. কোন মহিলা কোমরে কালো ফিতা বাঁধলে এবং তাকে এর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর উত্তরে সে যদি বলে এটা ‘জুন্নার’ (বিধর্মীদের আলামত হিসেবে পরিধেয় ফিতা) তবে কুফর হবে।

৭২. কেউ যদি, হারাম কোন খাবার খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বলে তবে কাফির হয়ে যাবে। এই হুকুম ‘হারাম লি-আইনিহি’ এর জন্য অর্থাৎ মৃত প্রাণী, মদ, শুকর ইত্যাদির মত মৌলিকভাবেই হারাম বস্তুর জন্য প্রযোজ্য। যে সব বস্তু মূলত হারাম নয়, অন্য কোন কারণে পরবর্তীতে হারামে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ ‘হারাম লি-গাইরিহি’ এর জন্য হুকুম এরূপ নয়। ডাকাতি করা মাল খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ বললে কুফর হবে না। কেননা এখানে মাল নিজে হারাম নয়, ডাকাতি করে অর্জন করা হারাম।

৭৩. অন্যকারো কুফুরীর জন্য সন্তোষ প্রকাশ করাও কুফুরী হবে। কেউ যদি কাউকে বদদোয়া করে বলে, আল্লাহ্ তায়ালা কাফির হিসেবে যেন তোমার জান কবজ করেন, তাহলে ঐ বদদোয়াকারী ব্যক্তির দ্বারা কুফর সংঘটিত হবে কিনা এব্যাপারে আলেমগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। কেউ কাফির হোক এটা প্রত্যাশা করা কুফুরী। তবে যদি কারো জুলুম, অত্যাচার বা পাপাচারের জন্য সে যেন চিরস্থায়ী ও কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হয় এই উদ্দেশ্যে তার কুফুরীর ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করলে কুফর হবে না।

৭৪. কেউ যদি বলে, আল্লাহ্ তায়ালা জানেন যে, আমি ঐ কাজটি করিনি, অথচ সে নিজে জানে যে সে ঐ কাজটি করেছে তবে তা কুফুরী হবে। কেননা এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি অজ্ঞতাকে সম্পৃক্ত করা হয়।

৭৫. কেউ কোন নারীকে কোন সাক্ষী উপস্থিত না করেই বিবাহ করে এবং সে ও ঐ নারী যদি বলে, আল্লাহ্ তায়ালা ও পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাক্ষী, তবে উভয়ের দ্বারাই কুফুরী হবে। কেননা হররত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত অবস্থায়ই গায়েব জানতেন না।

তিনি নিজে থেকে বা সত্তাগতভাবে গায়েব জানার ক্ষমতা রাখেন বললে কুফর হবে। কেননা গায়েব একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা জানেন এবং তিনি যাদেরকে যতটুকু জানান তারা শুধুমাত্র ততটুকু জানতে পারেন।

৭৬. কেউ যদি বলে, চুরিকৃত মাল কোথায় আছে তা আমি জানি কিংবা গায়েবী বিষয় সম্পর্কে আমি জানি তাহলে সে এবং তাকে যারা বিশ্বাস করবে সকলেই কাফির হয়ে যাবে। যদি বলে যে, আমাকে গায়েবের ব্যাপারে জ্বিন সংবাদ সংগ্রহ করে দেয় তাহলেও কাফির হবে। কেননা, জ্বিন কিংবা পয়গম্বরগণের সত্তাগতভাবে বা নিজে থেকে গায়েব জানার ক্ষমতা নাই। গায়েব শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা জানেন এবং তিনি যাকে যতটুকু জানান সে ততটুকু জানতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত কেউই নিজ ক্ষমতায় গায়েব জানতে পারে না।

৭৭. কেউ আল্লাহ্ তায়ালার নামে কসম করতে চাইলে অন্য কেউ যদি তাকে বলে, তুমি আল্লাহ্র নামে কসম কর তা আমি চাই না বরং আমি চাই তুমি তালাকের ব্যাপারে, ইজ্জত কিংবা সম্ভ্রমের ব্যাপারে কসম কর, তবে যে ব্যক্তি এরূপ বলবে তার দ্বারা কুফর সংঘটিত হবে বলে কিছু আলেম মত দিয়েছেন।

৭৮. কেউ যদি, তার অপছন্দনীয় কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তোমার দিদার বা চেহারা আমার জান কবজ করে, তাহলে কিছু আলেমের মতে তা কুফুরী হবে। কেননা, জান কবজকারীর দ্বায়িত্ব পালনকারী হলেন মহান ফেরেশতা হযরত আজরাইল আলাইহিস্ সালাম।

৭৯. কেউ যদি বলে, নামাজ আদায় না করা অতি উত্তম কাজ, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি কাউকে বলে, চল নামাজ আদায় করি, আর এর জবাবে ঐ ব্যক্তি যদি বলে, আমার পক্ষে নামাজ আদায় করা অনেক কষ্টকর কাজ, তাহলে কতিপয় আলেমের মতে তা কুফুরী হবে।

৮০. কেউ যদি বলে, আল্লাহ্ তায়ালা আসমান থেকে আমার সাক্ষী, তবে তা কুফর হবে। কেননা সে এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি স্থান সম্পৃক্ত করল। অথচ আল্লাহ্ তায়ালা স্থান, কাল ও পাত্র থেকে পবিত্র।

৮১. আল্লাহ্ তায়ালাকে কেউ বাবা বলে সম্বোধন করলে কাফির হয়ে যাবে।

৮২. কেউ যদি বলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবার খাওয়ার পর তার মুবারক হাতের আঙ্গুল চেটে খেতেন, এটা শোনার পর অন্য কেউ যদি বলে, এটা অসভ্যতা, তাহলে যে এরূপ বলল তার দ্বারা কুফর সম্পাদিত হল।

৮৩. কেউ যদি বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন, তবে তা কুফর হবে।

৮৪. রিজিক আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে আসে কিন্তু এর জন্য বান্দার পরিশ্রম করা দরকার, বললে শিরক হবে। কেননা বান্দার পরিশ্রম করার ক্ষমতাও আল্লাহ্ তায়ালাই প্রদান করেন।

৮৫. কেউ যদি বলে, ইহুদী হওয়ার চেয়ে খৃস্টান হওয়া কিংবা কম্যুনিস্ট হওয়ার চেয়ে অ্যামেরিকান খৃস্টান হওয়া উত্তম, তবে তা কুফরের কারণ হবে। কেননা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের ব্যাপারে উত্তম বলা যায় না। উপরোক্ত কথাটি এভাবে বলা উচিত যে, ইহুদী খৃস্টানদের থেকে এবং কম্যুনিস্ট অ্যামেরিকান খৃস্টানদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর।

৮৬. কাফির হওয়া খেয়ানত করার চেয়ে উত্তম, বললে কুফর হবে।

৮৭. ইলিমের আসরে আমার কি কাজ? অথবা আলেমগণ যা বলেন তা কার পক্ষে মানা সম্ভব? বললে কিংবা আলেমদের দেয়া ফতোয়াকে গ্রহণ না করে ছুড়ে ফেললে এবং আলেমদের সম্পর্কে কটূক্তি করলে কুফর হবে।

৮৮. কেউ এমন কোন কথা বলল যা কুফরের শামিল, তা শুনে যদি কেউ হাঁসে তবে তাও কুফর হবে। তবে হাঁসতে বাধ্য হলে কুফর হবে না।

৮৯. কেউ যদি বলে, অলী-আওলিয়ার রূহসমূহ সর্বদা হাজির তথা বর্তমান এবং তারা সবকিছু জানেন, তাহলে কুফর হবে। তবে যদি বলে মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়, তাহলে কুফর হবে না। (আওলিয়ার রূহসমূহ কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ তায়ালার মত হাজির ও নাজির হতে পারে না। তবে আল্লাহ্ চাইলে তাদেরকে স্মরণ করা হলে উপস্থিত হতে পারেন। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় হাজির হন না।)

৯০. ইসলামিয়্যাত সম্পর্কে আমার ধারণা নাই কিংবা আমি তা জানতেও চাই না, বললে কুফর হবে।

৯১. কেউ যদি বলে, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম যব না খেলে আমরা মদখোর হতাম না, তাহলে কুফর হবে। আর যদি এরূপ বলে, আমরা দুনিয়াতে থাকতাম না, সেক্ষেত্রে আলেমগণ কুফরের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

৯২. কেউ বলল, হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম কাপড় বুনত, আর তা শুনে অপর কেউ যদি বলে, তার মানে আমরা সবাই তাঁতির সন্তান, তাহলে কুফর হবে।

৯৩. কোন ব্যক্তি সগীরা গুনাহ করার পর অন্য কেউ তাকে এর জন্য তওবা করতে বলার পর উত্তরে ঐ ব্যক্তি যদি বলে, কী এমন গুনাহ করেছি যে তওবা করতে হবে? তাহলে তা কুফর হবে।

৯৪. কেউ অপর কাউকে বলল, চল মুসলমান আলেমের কাছে যাই কিংবা ফিকাহ্ এর কিতাব পরে কিছু শিখি, এর উত্তরে অপর ব্যক্তি যদি বলে, আমি এই ইলিম দিয়ে কি করব? তাহলে তা কুফর হবে। কেননা এর দ্বারা সে ইলিমকে অমর্যাদা করেছে।

৯৫. তাফসীর ও ফিকাহ্-এর কিতাবসমূহকে গালি দিলে, অপছন্দ করলে কিংবা এগুলির ব্যাপারে বাজে মন্তব্য করলে কুফর হবে।

৯৬. কেউ যদি কাউকে জিগ্যেস করে যে, তুমি কোন পরিবারের? কার মিল্লাতের **[আবু মানসুরি মাতুরিদি, আবুল হাসান আলী আসারি]** অন্তর্ভুক্ত? ইতিক্বাদের ক্ষেত্রে তোমার মাজহাবের ইমাম **[ইমাম আজাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক বিন আনাস, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস শাফি এবং ইমাম আহমেদ বিন হানবাল]** কে? আমলের ক্ষেত্রে মাজহাবের ইমাম কে? আর এর উত্তর দিতে ব্যক্তি যদি অপারগ হয়, তাহলে কুফর হবে।

৯৭. শরিয়ত অনুযায়ী যা নিশ্চিতভাবে হারাম এমন কিছুকে কেউ হালাল বললে সে কাফির হয়ে যাবে। (সিগারেটের ব্যাপারে হারাম বলাটা বিপদজনক।)

৯৮. সকল ধর্ম অনুযায়ীই হারাম এবং যাকে হালাল বিবেচনা করাটা হিকমত তথা বিবেক বিরোধী এমন কিছু যেন হালাল হয়, এই প্রত্যাশা করা কুফরের শামিল। জিনা-ব্যভিচার, সমকামিতা, উদরপূর্তির পরও খাবার গ্রহণ, সূদের আদান-প্রদান ইত্যাদির মত বিষয় সকল ধর্মেই হারাম। মদের হালাল হওয়ার জন্য প্রত্যাশা করলে, তা কুফর হবে না। কেননা সকল দীন অনুযায়ী মদ হারাম নয়।

৯৯. সম্মানিত পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত বা অংশ বিশেষ কোন কৌতুক বা ঠাট্টা-তামাসার জন্য ব্যবহার করা কুফরের অন্তর্ভূক্ত।

১০০. ইয়াহিয়া নামের কাউকে, **‘ইয়া ইয়াহিয়া! খুজিল কিতাবা’** বললে কুফর হবে। কেননা এর দ্বারা পবিত্র কুরআন শরীফের সাথে ঠাট্টা করা হয়। বাজনার তালে কিংবা গানের মাঝে কুরআন-ই করীম তিলাওয়াত করার হুকুমও অনুরূপ।

১০১. এখন আসলাম বিসমিল্লাহ্‌তে, বললে তা বিপদজনক কথা হবে। কোন কিছু অধিক পরিমানে দেখে **‘মা হালাকাল্লাহ্’** বললে এবং এর অর্থ না জেনে থাকলে কুফর হবে।

১০২. কেউ যদি বলে, এখন তোমাকে গালি দিব না, কেননা গালির নাম গুনাহ রাখা হয়েছে। তা আশঙ্কাজনক কথা হবে।

১০৩. কেউ যদি বলে, জিবরাঈলের বাছুরের মত সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েছ, তা বিপদজনক কথা। কেননা এর দ্বারা ফেরেশতাকে নিয়ে উপহাস করা হল।

১০৪. আমার সন্তানের মাথার জন্য কিংবা আমার মাথার জন্য বলে আল্লাহর নামে কসম করলে, তার কুফর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন কেউ বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমার সন্তানের মাথার জন্য...

১০৫. পবিত্র কুরআন শরীফ, দুরুদ শরীফ কিংবা হামদ ও নাত বাজনার তালে তালে কিংবা বাদ্য-বাজনা হচ্ছে এমন পরিবেশে পড়লে কুফর হবে।

১০৬. পবিত্র কুরআন শরীফ, দুরুদ শরীফ কিংবা হামদ ও নাত পাপাচার হচ্ছে এমন পরিবেশে সম্মানের সাথে পাঠ করা হারাম। আর আনন্দ-ফুর্তি ও মজা করার জন্য পড়লে তা কুফর হবে।

১০৭. সুন্নাত অনুযায়ী দেয়া আযান-ই মুহাম্মদী যখন কানে আসবে তখন তা মনোযোগ দিয়ে না শুনে অবজ্ঞা করলে কুফর হবে।

১০৮. পবিত্র কুরআন শরীফকে নিজের মনগড়া উপায়ে অনুবাদ করলে কুফর হবে।

১০৯. যা পবিত্র কুরআন-ই করিম ও হাদিস শরীফে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, যা মুজতাহিদ ইমামগণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে ঘোষণা করেছেন এবং সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ব্যপকভাবে প্রচার ও প্রসার পেয়েছে এমন ঈমানী বিষয়সমূহকে যথাযথভাবে বিশ্বাস না করলে, ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। এই প্রকারের কুফুরীকে **'ইলহাদ'** এবং এরূপ বিশ্বাসীকে '**মুলহিদ**' বলা হয়।

১১০. কোন কাফিরকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সালাম প্রদান করলে তা কুফর হবে।

১১১. কাফিরকে সম্মান জ্ঞাপক কোন শব্দ বা বিশেষণের দ্বারা সম্বোধন করলে কুফর হবে। যেমন, কোন কাফিরকে, উস্তাদ বললে।

১১২. অন্য কারো কুফুরীর ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলে তা কুফর হবে।

১১৩. পবিত্র কুরআন শরীফের মোড়ক, গিলাফ কিংবা পৃষ্ঠা নির্দেশক ইত্যাদিও মুসহাফ-ই শরীফের মত সম্মানিত। তাই এগুলিকে অসম্মান করলেও কুফর হবে।

১১৪. জ্বিনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী গণক, রাশিচক্রের গতিবিধির পর্যবেক্ষনের দ্বারা ভবিষ্যতের বিষয়ে খবর প্রদানকারী জ্যোতিষী, ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সর্বজান্তা বলে দাবিকারী জাদুকর ইত্যাদি ধরণের ব্যক্তিদের কাছে যেয়ে তারা যা বলে বা করে তা বিশ্বাস করলে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। যদিও তাদের কিছু কিছু কথা সত্য হয় কিংবা মিলে যায়, কেননা এর দ্বারা এই বিশ্বাস করা হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো পক্ষেও গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান রাখা সম্ভব এবং আল্লাহ্‌র কুদরত ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু করা সম্ভব। যা সম্পূর্ণরূপে কুফরের শামিল।

১১৫. সুন্নাতকে গুরুত্বহীন মনে করে ত্যাগ করলে কুফর হবে।

১১৬. জুননার্ নামক খৃস্টানদের পরিধেয় ফিতা পরিধান করা কিংবা মুর্তি, প্রতিমা, ক্রুশ, উপাসনালয়ের ছবি ইত্যাদিকে ভক্তি করা, উপাসনা করা অথবা সম্মান প্রদর্শন করা কুফুরী আচরন হিসেবে বিবেচিত। ইসলামী হুকুমসমূহকে ধারণকারী দ্বীনী কিতাবসমূহকে অবজ্ঞা করা, ইসলামী আলেমদের কাউকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করা, উপহাস করা কিংবা কাফির হওয়ার কারণ হিসেবে বিবেচিত কোন কথা বলা বা লিখাও কুফুরী হবে। এক কথায়, শরিয়ত কর্তৃক সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদেশ করা হয়েছে এমন কিছুকে অসম্মান করা, বিদ্রুপ করা আর সম্মান প্রদর্শনের জন্য নিষেধ করা হয়েছে এমন কিছুকে সম্মান দেখালে, ভক্তি করলে কুফর হবে।

১১৭. জাদুকর তার জাদুর মাধ্যমে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, প্রকৃতপক্ষেই যাদুর প্রভাব রয়েছে, এমন কথা যে বলে বা বিশ্বাস করে সে কাফির হবে।

১১৮. কোন মুসলমানকে কেউ কাফির বলে সম্বোধন করার পর ঐ ব্যক্তি তাতে সম্মতিসূচক জবাব দিলে কাফির হয়ে যাবে।

১১৯. হারাম সম্পদ কিংবা হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদের মাধ্যমে মসজিদ বানানো, সদকা দেয়া কিংবা অন্য কোন নেক আমল করা এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট থেকে সওয়াব প্রত্যাশা করা কুফুরী কাজ।

১২০. কোণ ব্যক্তি, জেনে শুনে নিশ্চিতভাবে হারাম এমন কোন সম্পদ থেকে সদকা হিসেবে দান করে সওয়াবের আশা করলে এবং যে ফকীর গ্রহণ করল সে তা জানা সত্ত্বেও দানকারীর জন্য আল্লাহ্র কাছে উত্তম দোয়া করলে উভয়ের দ্বারাই কুফর সম্পাদন করা হবে। এই বিষয়টি জানা সত্ত্বেও ঐ ফকীরের দোয়ায় কেউ আমীন বললে তার জন্যও কুফর হবে।

১২১. যাদের সাথে বিবাহ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম, তাদেরকে বিবাহ করাকে কেউ হালাল বললে সে কাফির হবে।

১২২. মদ্যশালা, পানশালা, আনন্দ ফুর্তির যায়গায় কিংবা পাপাচার করা হচ্ছে এমন কোন যায়গায় রেডিও কিংবা সাউন্ডবক্সের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন শরীফ কিংবা দুরুদ শরীফ শুনে উপভোগ করলে কুফর হবে।

১২৩. বাদ্য বাজিয়ে তার তালে তালে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করলে কুফর হবে।

১২৪. পবিত্র কুরআন শরীফের তিলাওয়াত সরাসরি হোক কিংবা রেডিও, টেলিভিশন, মাইক বা সাউন্ডবক্সের মাধ্যমে হোক সর্বাবস্থাতেই যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কোন অবস্থাতে এর অসম্মান করলে কুফর হবে।

১২৫. আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে স্রষ্টা বললে, তা যে উদ্দেশ্য নিয়েই বলা হোক না কেন কুফর হবে।

১২৬. আল্লাহ্ তায়ালার সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত যেসব নাম রয়েছে সেগুলোকে বিকৃত করে ডাকলে এবং তা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করে থাকলে কুফর হবে। যেমন, আবদুল কাদিরকে কাদিরর‍্যা, আবদুল্লাহ্কে আবদুইল্ল্যা, আবদুল আজিজকে আজিজ্যা ইত্যাদি।

একইভাবে কারো নাম যদি নবী রাসূলদের কিংবা সাহাবীদের নামে হয় এবং তা বিকৃত করে ডাকা হলেও কুফর হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যেমন, মুহাম্মদকে মেমো, হাসানকে হাস্সো, ইবরাহীমকে ইবো ইত্যাদি। এছাড়া এই ধরণের নামকে যারা জুতা, মোজা ইত্যাদিতে মার্কা হিসেবে ছাপিয়ে অসম্মান করে তাদের ঈমান চলে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

১২৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অজু বিহীন অবস্থায় নামাজ আদায় করলে এবং কোন সুন্নাতকে অপছন্দ করলে তা কুফর হবে। সুন্নাতকে গুরত্ব না দেওয়াও অনুরূপ।

১২৮. জাহিল তথা মূর্খরা, আওলিয়াদেরকে স্রষ্টার আসনে বসাতে পারে এই শঙ্কার কারণে তাদের মাজারকে ধ্বংস করে দেয়া উচিত বললে কুফর হবে।

১২৯. অন্য কারোর কাফির হওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখলেও কুফর হবে। আর তা যদি নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে হয় তা হলেতো পরিণতি আরো ভয়াবহ হবে।

১৩০. জিনা-ব্যভিচার, সমকামিতাকে বৈধ বললে কুফর হবে।

১৩১. 'নাস্' এর মাধ্যমে অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের আয়াত কিংবা হাদীস শরীফের দ্বারা যে সব বিষয়কে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলোর থেকে বিরত থাকার ব্যপারে সতর্কতা অবলম্বন না করলে কুফর হবে। 'ইজমা' অর্থাৎ মুজতাহিদগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হারামের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য।

১৩২. বারংবার কবীরা গুনাহ সম্পাদন করলে এবং তা করার জন্য সংকল্প করলে কুফর হবে। নামাজের প্রতি যথাযথ গুরত্বারোপ না করলেও কুফর হবে।

১৩৩. আয়াত কিংবা হাদীস লিখিত কাগজ, কাপড়, চাঁদর কিংবা অনুরূপ কিছু অসম্মান করার উদ্দেশ্যে মাটিতে বিছালে কিংবা ব্যবহার করলে তা কুফর হবে। এমনকি তা একটি অক্ষর হলেও আশঙ্কাজনক।

১৩৪. হযরত আবুবকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমাগণ খিলাফতের জন্য উপযুক্ত কিংবা হক্বদার ছিলেন না, বললে কুফর হবে।

১৩৫. আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সম্পর্কিত না করে, সরাসরি কোন মৃত সত্ত্বার কাছ থেকে কিছু চাইলে বা প্রত্যাশা করলে কুফর হবে।

১৩৬. আল্লাহ্‌র আওলিয়াকে বিভিন্ন বাবা বা দাদা নামে ডাকা অশোভন এবং তা কুফরের কারণ হতে পারে।

১৩৭. মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়া ফরজ হওয়ায়, এই ফরজকে গুরুত্ব না দিয়ে তার আত্মীয়স্বজন কিংবা পাড়া প্রতিবেশী কবর দেয়ার ব্যবস্থা না করে অবহেলা করে তবে কুফর হবে। কেউ যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে বলে যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা সেকেলে, এর চেয়ে বরং বৌদ্ধ, হিন্দু কিংবা কম্যুনিস্টদের মত করে আগুনে পোড়ানো উত্তম, তার ঈমান চলে যাবে। সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

১৩৮. জীবিত হোক কিংবা মৃত, আল্লাহ্ তায়ালার আওলিয়ার মাঝ থেকে কাউকে মৌখিকভাবে হোক কিংবা ক্বালবের দ্বারা হোক, অস্বীকার করা কুফর হবে।

১৩৯. আওলিয়ার এবং যে সমস্ত আলেম স্বীয় ইলম্ অনুযায়ী আমল করে তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা কুফর হবে।

১৪০. আওলিয়ার ক্ষেত্রে 'ইসমত্' (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে গুনাহ করা থেকে সংরক্ষণ করা হয়েছে এমন) বিশেষণ রয়েছে বললে কুফর হবে। ইসমত নামক গুণটি শুধুমাত্র পয়গম্বরদের জন্য প্রযোজ্য।

১৪১. যার ইলম্-ই বাতেনী সম্পর্কে কোন ধারণা নাই তার ঈমান চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর সম্পর্কে ধারণা রাখার নূন্যতম পর্যায় হল এর অস্তিত্বকে স্বীকার করা।

১৪২. পবিত্র কুরআন শরীফের যে কয় ধরণের ক্বিরাত ইসলামে স্বীকৃত সেগুলি থেকে বিকৃত কোন রূপে পাঠ করলে তা কুফর হবে, যদিও তাতে শব্দের কিংবা অর্থের ক্ষেত্রে কোন ধরণের পরবর্তন সাধিত না হয়।

১৪৩. ইহুদী কিংবা খৃস্টান ধর্মযাজকরা যেভাবে ইবাদত করে কিংবা ইবাদতের সময় যা ব্যবহার করে অর্থাৎ যা তাদের চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত এমন কিছু ব্যবহার করা কুফরের কারণ।

১৪৪. যে কোন কিছু কিংবা ঘটনা নিজে নিজেই হয়েছে, এই কথা বিশ্বাস করলে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। বিবর্তনবাদে তথা সকল প্রাণী এক কোষী থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে বহু কোষীতে, তারপর আরো উন্নত পর্যায়ে এবং সর্বশেষ মানুষে পরিণত হয়েছে, এই মতবাদকে বিশ্বাস করলে কুফর হবে।

১৪৫. ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ পরিত্যাগ করলে ও ভবিষ্যতে তা ক্বাজা করার কোন নিয়্যাতও না করলে এবং এর কারণে যে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে তাকে অবিশ্বাস করে অবহেলা করলে, হানাফী মাজহাব অনুযায়ীও ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে।

১৪৬. কাফিরদের ইবাদত হিসেবে বিবেচিত কোন কিছুকে ইবাদত হিসেবে করলে কুফর হবে। যেমন, গীর্জাতে যেভাবে ঘন্টা বাজানো হয় তা যদি কেউ মসজিদে বাজায় তা কুফর হবে। ইসলামিয়্যাত যেসব কিছুকে কুফরের আলামত হিসেবে বিবেচনা করে সেগুলিকে অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন কিংবা বাধ্য না হওয়া সত্ত্বেও ব্যবহার করলে কুফর হবে।

১৪৭. সম্মানিত সাহাবীগণকে যারা গালি দেয় তাদেরকে মুলহিদ বলা হয়। মুলহিদ হওয়ার মানে হল কাফির হওয়া।

১৪৮. কোন কাফিরের ছবিকে উঁচু কোন স্থানে ঝুলিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলে কুফর হবে।

১৪৯. কোন ছবি, প্রতিমা, মূর্তি, ক্রুশ কিংবা নক্ষত্র, সূর্য, গরু ইত্যাদির মত যে কোন কিছুর মাঝে উলুহিয়্যাতের গুণাবলী রয়েছে তা বিশ্বাস করলে এবং এ কারণে সম্মান প্রদর্শন করলে ব্যক্তি কাফির হ্যে যাবে। উলুহিয়্যাতের গুণাবলী বলতে বুঝানো হয়েছে যে, যা ইচ্ছা তা করতে পারা, রোগীর সুস্থতা দান করা ইত্যাদির ক্ষমতার অধিকারী হওয়া।

১৫০. হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মিথ্যা অপবাদ দিলে এবং তার বাবা হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাহাবী হিসেবে অস্বীকার করলে কুফর হবে।

১৫১. হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণের বিষয়টি অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। এটা বিশ্বাস না করলে কুফর হবে।

১৫২. পবিত্র কুরআন মজিদ ও হাদীস শরীফে যাদের ক্ষেত্রে জান্নাত প্রাপ্তির ব্যাপারে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তাদের কাউকে কাফির বললে কুফর হবে।

১৫৩. বিজ্ঞানের আওতার বাইরের কোন বিষয়, যার সাথে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই পবিত্র কুরআনের এমন আয়াতগুলিকে, বিজ্ঞানের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করলে এবং 'সালাফ-ই সালিহীন'এর তাফসীরকে পরিবর্তন করলে তা অনেক বড় গুনাহ হবে। যারা এরূপ তরজমা কিংবা তাফসীর করবে তারা কুফর করার সামিল হবে।

১৫৪. মুসলমান হিসেবে পরিচিত কোন শিশু, আকিল ও বালিগ তথা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে ইসলামিয়্যাত সম্পর্কে কোন ধারণা অর্জন না করলে বা মৌলিক বিষয়গুলিকে বিশ্বাস না করলে কাফির হয়ে যাবে। এটা ছেলে, মেয়ে উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য।

১৫৫. মুসলমান নারীদের জন্য সতরের অন্তর্ভুক্ত কোন অঙ্গ যেমন মাথা, হাত, পা ইত্যাদিকে অনাবৃত করে চলাফেরা করা এবং পরপুরুষকে তা প্রদর্শন করানো হারাম। তাই এরূপ করলে অনেক বড় গুনাহ হবে। এই হুকুমকে যথযথ গুরুত্ব না দিলে এবং এ ব্যাপারে সতর্ক না হলে ঈমান চলে যাবে, কুফরে পতিত হবে।

১৫৬. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক যে সকল ফরজ ও হারাম নির্ধারন করে দেয়া হয়েছে তা, পবিত্র কুরআন করীমের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে নির্ধারন করা ফরজ ও হারামের সমতূল্য এবং সমানভাবে কার্যকর। এধরণের ফরজ ও হারামকে যারা গ্রহণ করবে না তাদের ঈমান চলে যাবে। এবং তারা কাফিরে পরিণত হবে।

১৫৭. নামাজে রুকুর তাসবীহতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম' বলার সময়ে 'জোয়া'এর উচ্চারণ সঠিকভাবে করলে এর অর্থ হয়, আমার রব সুমহান। এক্ষেত্রে কেউ যদি জোয়া এর বদলে 'জাল' উচ্চারণ করে এর অর্থ দাঁড়াবে, আমার রব আমার শত্রু। এভাবে বললে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং অর্থের পরিবর্তনের কারণে তা কুফরের কারণ হবে।

১৫৮. পবিত্র কুরআন করীমকে 'তাগান্নী'র মাধ্যমে তিলাওয়াতকারী কোন হাফিজকে, কত সুন্দর তিলাওয়াত করেছ বললে তার ঈমান চলে যাবে ও কুফরে পরিণত হবে। চার মাজহাব অনুযায়ীই হারাম, এমন কিছুকে সুন্দর

বললে কুফর হবে। তবে যদি এর দ্বারা তার কন্ঠ বা আওয়াজ সুন্দর কিংবা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়টি সুন্দর এটা বুঝানো হয় তবে কুফর হবে না।

১৫৯. ফেরেশতাদের ও জ্বিনদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে কাফির হবে।

১৬০. পবিত্র কুরআন শরীফের আয়াত ও শব্দের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করার সময় স্পষ্ট ও মশহুর অর্থ প্রদান করতে হয়। এই অর্থগুলিকে পরিবর্তন করে বাতেনী তথা ইসমাইলী শিয়াদের মত করে অনুবাদ করলে কুফর হবে।

১৬১. যাদু করার সময়, কুফরের কারণ হিসেবে বিবেচিত কোন কথা বা আচরণ করলে কুফর হবে।

১৬২. কোন মুসলমানকে এই কাফির! বলে কিংবা এই মাসন! এই কম্যুনিস্ট! বলে সম্বোধন করলে এবং তাকে কাফির হিসেবে বিশ্বাস করলে, যে এরূপ করল সে নিজেই কাফির হয়ে যাবে।

১৬৩. যথাযথভাবে ইবাদত করা সত্ত্বেও কেউ যদি নিজের ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সঙ্কোচে ভোগে এবং ভাবে যে, আমার অনেক গুনাহ রয়েছে তাই কৃত ইবাদতগুলি আমার মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, তাহলে তা ঐ ব্যক্তির শক্তিশালী ঈমানের অধিকারী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আর কেউ যদি ভাবে, আমার ঈমান নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহলে তার কুফরে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১৬৪. পয়গম্বরদের সংখ্যা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বললে, পয়গম্বর না হওয়া সত্ত্বেও কাউকে পয়গম্বর হিসেবে গ্রহণ করা হতে পারে অথবা পয়গম্বর হওয়া সত্ত্বেও কাউকে সে হিসেবে গ্রহণ না করা হতে পারে। আর এরূপ করলে কুফর হবে। কেননা, পয়গম্বরদের মধ্য থেকে একজনকেও অস্বীকার করলে তা সমস্ত পয়গম্বরকে অস্বীকার করার শামিল হবে।

পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন মুসলমান, আলেমগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে কুফরের কারণ হিসেবে বিবেচিত কোন কথা কিংবা কাজ, যা সম্পাদন করলে কুফরে পতিত হতে হবে জেনে শুনে সচেতনভাবে নিজ ইচ্ছায় (অর্থাৎ কোন হুমকির সম্মুখীন হয়ে নয়) বললে অথবা করলে তার ঈমান চলে যাবে। কেউ তা অসচেতনভাবে ঠাট্টা তামাশার উদ্দেশ্যে কিংবা এর মর্মার্থ অনুধাবন না করে বললেও একই হুকুম প্রযোজ্য। ঈমানদারের ঈমান চলে গেলে সে **মুরতাদ** হিসেবে বিবেচিত হয়। এই ধরণের ঈমানহীনতাকে '**কুফর-ই ইনাদী**' বলা হয়। কুফর-ই ইনাদীর কারণে যে মুরতাদ হয় তার পূর্বেকার সমস্ত সওয়াব বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তীতে তওবা করলেও তা আর পুনর্গৃহিত হয় না। একারণে ব্যক্তি ধনী হলে এবং একবার ফরজ হিসেবে পালন করা সত্ত্বেও তওবার পর পুনরায় তার উপর হজ্জ ফরজ হবে। মুরতাদ অবস্থায় আদায় করা নামাজ, রোজা ও যাকাতসমূহের ক্বাজা করতে হবে না। তবে কুফর-ই ইনাদী সম্পাদনের পূর্বের ক্বাজা সমূহ আদায় করবে।

তওবা করার জন্য শুধুমাত্র ‘কালিমা-ই শাহাদাত’ বলা যথেষ্ঠ নয়। যে কারণে কুফরে পতিত হয়েছে তা আর কখনো সম্পাদন না করার ব্যাপারেও তওবা করতে হবে। (যেই দরজা দিয়ে ইসলাম থেকে বের হয়েছে, সেই দরজা দিয়েই পুনরায় প্রবেশ করা আবশ্যক।) কুফরের কারণ হবে তা না জেনে যদি কেউ এমন কিছু বলে কিংবা করে অথবা কুফরের কারণ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার ক্ষেত্রে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে এমন কথা বা কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে বলে, তাহলে তার ঈমান চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে তার নিকাহও বাতিল হয়ে যাবে। তাই সাবধানতার জন্য ‘তাজদীদ-ই ঈমান ও নিকাহ’ করা উত্তম হবে। কুফরের কারণ হিসেবে বিবেচিত কোন কিছু না জেনে অজ্ঞতাবশত বলা বা করাকে ‘**কুফর-ই জাহল**’ বলা হয়। এক্ষেত্রে তার অজ্ঞতা উজর হিসেবে নয়, বরং বড় গুনাহ হিসেবে বিবেচিত হয়। কেননা প্রত্যেক মুসলমানের উপর, শরীয়ত অনুযায়ী জীবন ধারণের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞানসমূহ অর্জন করা ফরজ। কুফরের কারণ হিসেবে বিবেচিত কথা বা কাজ ভুল করে অথবা পরোক্ষভাবে (যার তাওয়ীল বা ব্যখ্যার দ্বারা কুফরের কারণ নয় তা সাব্যস্ত করা সম্ভব এমনকিছু) বললে বা করলে ঈমান ও নিকাহ বাতিল হয় না। শুধুমাত্র তওবা ও ইসতিগ্ফার, অর্থাৎ ‘তাজদীদ-ই ঈমান’ করা তার জন্য কল্যানকর হবে।

একজন কাফির যেমন একটিমাত্র বাক্য তথা ‘কালিমা-ই তাওহীদ’ বলার মাধ্যমে মুমিনে পরিণত হয়, ঠিক তেমনি একজন মুমিনও ঈমানবিরোধী একটিমাত্র বক্তব্যের দ্বারা কাফিরে পরিণত হতে পারে।

একজন মুসলমানের কোন কথা বা কাজের মাঝে শত অর্থ নিহিত থাকলে অর্থাৎ শতভাবে তা বুঝার অবকাশ থাকলে এবং এগুলোর মধ্য থেকে একটিও যদি তার ঈমানদার হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে ও বাকী নিরানব্বইটি কুফরের প্রতি নির্দেশ করে তবুও তাকে মুসলমান হিসেবে বিবেচনা করা আবশ্যক হবে। অর্থাৎ, কুফরের প্রতি নির্দেশ করে এমন নিরানব্বইটি অর্থ এক্ষেত্রে গৃহীত হবে না। ঈমানের প্রতি নির্দেশকারী একটি অর্থকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এই ব্যাপারে ভুল বুঝা উচিত হবে না। এর জন্য, দুইটি বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে। প্রথমটি হল, বক্তা বা কর্তার মুসলমান হওয়া আবশ্যক। কোন বিধর্মী ব্যক্তি পবিত্র কুরআন শরীফের প্রশংসা করলে বা কোন খৃস্টান ‘আল্লাহ্ এক’ বললে, এই কথার কারণে তাদেরকে মুসলমান হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। দ্বিতীয়টি হল,কোন কথা বা কাজের শত অর্থ থাকলে বলা হয়েছে, এর মানে এই নয় যে, কোন ব্যক্তির শত কথা বা কাজের মাঝে একটি ঈমানের প্রতি আর বাকী নিরানব্বইটি কুফরের প্রতি নির্দেশ করলেও তাকে মুসলমান বিবেচনা করা হবে।

সকাল-সন্ধ্যা প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিম্নোক্ত ঈমান দোয়াটি পাঠ করা।

‘আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিন আন উশরিকা বিকা শাইয়ান্ ওয়া আনা আ’লামু ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আ’লামু ইন্নাকা আনতা আল্লামু-ল গুয়ুব’

‘আল্লাহুম্মা ইন্নি উরিদু আন উজাদ্দিদাল ঈমান ওয়ান-নিকাহা তাজদীদান বি কাওলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদু-র রাসূলুল্লাহ’। এভাবে এই দোয়া পাঠের মাধ্যমে সকলের উচিত প্রত্যেকদিন ‘তাজদীদ-ই ঈমান ও নিকাহ’ করা।

ঈমান টিকিয়ে রাখার শর্ত

১. গায়েবের প্রতি ঈমান আনতে হবে।

২. কেবলমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা ও তিনি যাদেরকে জানান তারাই গায়েব জানেন, এই বিশ্বাস করা।

৩. হারামকে হারাম হিসেবে মেনে নেয়া।

৪. হালালকে হালাল হিসেবে মেনে নেয়া।

৫. আল্লাহ্ তায়ালার আজাব থেকে মুক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে সর্বদাই ভীত থাকা।

৬. একইসাথে আল্লাহ্ তায়ালার দয়ার ব্যাপারে নিরাশ না হওয়া।

যেসব কারণে মুসলমান মুরতাদে পরিণত হয় তা অস্বীকার করাও তোবা হিসেবে বিবেচিত হয়। মুরতাদ ব্যক্তি তওবা না করে মারা গেলে, জাহান্নামের আগুনে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। এ কারণে, কুফরের ব্যাপারে অতি সাবধান হওয়া উচিত। অল্প কথা বলা উচিত। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, “**তোমরা সর্বদা কল্যাণকর ও উপকারী হয়, এমন কথা বল। নতুবা চুপ থাক**”। সতর্ক থাকা উচিত, ঠাট্টা তামাসা করা উচিত নয়। বিবেক ও মানবতার বিরোধী কোন কাজ করা উচিত নয়। আর সর্বদাই, নিজেকে কুফরের থেকে বাঁচানোর জন্য, আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে বেশি বেশি দোয়া করা প্রয়োজন।

যেসব কারণে ঈমান হারানোর আশঙ্কা আছে

১. আহলি বিদায়াত হলে। অর্থাৎ ব্যক্তির ইতিক্বাদ ভ্রষ্ট হলে। (আহলি সুন্নাতের আলেমগণ কর্তৃক অবহিত করা ইতিক্বাদ থেকে খুব অল্প পরিমাণে মতবিরোধ করলেও ভ্রান্ত অথবা কাফির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।)

২. দুর্বল ঈমানের অধিকারী হলে। আমলহীন ঈমান হল দুর্বল ঈমান।

৩. নয়টি অঙ্গকে সঠিক পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে।

৪. নিয়মিত কবীরা গুনাহ করলে।

৫. ইসলামের মত নিয়ামত লাভের পর এর জন্য শুকরিয়া আদায়ে ক্ষ্যান্ত হলে।

৬. আখেরাতে ঈমানহীন যাওয়ার ব্যাপারে ভীত না হলে।

৭. জুলুম করলে।

৮. সুন্নাত অনুযায়ী দেয়া আজান-ই মুহাম্মদীকে না শুনা।

৯. মা-বাবার বিরুদ্ধাচারণ করা।

১০. সঠিক হওয়া সত্ত্বেও খুব বেশি ইয়ামিন (কসম খাওয়া) করলে।

১১. নামাজের 'তা'দিল-ই এরকান' ত্যাগ করলে।

১২. নামাজকে গুরুত্বহীন মনে করে না শিখলে, সন্তানদেরকে শিখানোর ব্যাপারে গুরুত্ব না দিলে ও নামাজ আদায়কারীদেরকে বাঁধা দিলে।

১৩. মদ খেলে।

১৪. মুমিনদেরকে কষ্ট দিলে।

১৫. ধর্মের বিষয়ে মিথ্যা প্রচার করলে, অলীত্বের নামে ভণ্ডামি করলে।

১৬. কৃত গুনাহকে ভুলে গেলে ও অনুশোচিত না হলে।

১৭. অহংকারী হলে।

১৮. 'উজব' অর্থাৎ নিজের ইলম ও আমল দ্বারা জান্নাত প্রাপ্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হলে।

১৯. মুনাফিকের চরিত্র ধারণ করলে।

২০. হিংসা করলে, দ্বীনী ভাইয়ের ভাল সহ্য করতে না পারলে।

২১. শাসক ও শিক্ষকের ইসলাম বিরোধী নয় এমন কথা না মানলে।

২২. কারো ব্যাপারে না জেনে ভাল বললে।

২৩. মিথ্যা বলে তা প্রমাণে স্বচেষ্ট হলে।

২৪. আলেমদের থেকে পালালে।

২৫. গোঁফকে সুন্নাত পরিমাণের চেয়ে অধিক লম্বা করলে।

২৬. পুরুষ হয়ে রেশমের কাপড় পরিধান করলে।

২৭. বেশি বেশি গীবত করলে।

২৮. প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে। (এমনকি কাফির হলেও)

২৯. দুনিয়াবী কোন বিষয়ের জন্য অতিরিক্ত রাগ করলে।

৩০. সূদের আদান-প্রদান করলে।

৩১. অহংকারের প্রকাশের জন্য পোশাকের নিম্নাংশকে লম্বা করলে।

৩২. যাদু করলে।

৩৩. মুসলমান ও সালিহ নিকটাত্মীয়দের জিয়ারত না করলে।

৩৪. আল্লাহ্ তায়ালা পছন্দ করেন এমন কাউকে অপছন্দ করলে আর ইসলামের ক্ষতি সাধনে লিপ্ত কাউকে ভালবাসলে। ('**হুব্বু ফিল্লাহ, বুগুজু ফিল্লাহ** ঈমানের শর্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা আর আল্লাহ্র জন্য রাগ করা।)

৩৫. মুমিন ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি বিদ্বেষ করা।

৩৬. জিনা করলে।

৩৭. সমকামী হলে।

৩৮. ফিকহের কিতাবে যেভাবে বর্নিত আছে সেই ওয়াক্ত মত ও সুন্নাত অনুযায়ী আযান না দিলে। আর সুন্নাত অনুযায়ী দেয়া আযান শুনে অসম্মান করলে।

৩৯. কাউকে হারাম কাজ করতে দেখে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে নরম ভাষায় নিষেধ না করলে।

৪০. নিজের স্ত্রী, বোন ও যাদের উপর নসিহতের অধিকার রয়েছে সেসব নারীদের বেপর্দা হয়ে চলতে দেখে, মন্দ মানুষের সাথে সাক্ষাত করতে দেখে বারণ না করে মেনে নিলে।

কবীরা গুনাহ

নিম্নে বাহাত্তরটি কবীরা গুনাহের আলোচনা করা হল।

১. অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা।

২. জিনা করা।

৩. সমকাম করা।

৪. মদ পান করা।

৫. চুরি করা।

৬. সকল ধরণের নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা। (চিকিৎসার জন্য বাধ্য হলে ভিন্ন কথা।)

৭. অন্যায়ভাবে পরের সম্পদ হস্তগত করা।

৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

৯. বিনা উজরে রমজান মাসের দিনের বেলায় মুসলমানদের সামনে পানাহার করা।

১০. সূদের আদান-প্রদান করা।

১১. অতিরিক্ত ইয়ামিন করা (কসম খাওয়া)।

১২. মা-বাবার অবাধ্য হওয়া।

১৩. নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক ছেদ করা।

১৪. যুদ্ধের ময়দানে পক্ষ ত্যাগ করে শত্রুর সাথে আঁতাত করা।

১৫. অন্যায়ভাবে এতীমের মাল ভক্ষণ করা।

১৬. ওজনে গড়মিল করা।

১৭. ওয়াক্তের পূর্বে বা পরে নামাজ আদায় করা।

১৮. মুমিন ভাইয়ের হৃদয় ভাঙ্গা। (যা কা'বা ভাঙ্গার চেয়েও বড় গুনাহ। আল্লাহ্ তায়ালাকে অধিক পীড়া দেয়, কুফরের পরে হৃদয় ভাঙ্গার চেয়ে এমন বড় গুনাহ আর নাই।)

১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি এমন কথা তাঁর নামে বলা।

২০. ঘুষ খাওয়া।

২১. সত্য সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকা।

২২. সম্পদের যাকাত ও উশর প্রদান না করা।

২৩. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হারাম কাজে লিপ্ত কাউকে দেখে বাঁধা না দেয়া।

২৪. জীবন্ত প্রাণীকে আগুনে পোড়ানো।

২৫. কুরআন করীমের তিলাওয়াত শিখে আবার ভুলে যাওয়া।

২৬. আল্লাহ্ তায়ালার রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হওয়া।

২৭. মুসলমান হোক কিংবা কাফির, মানুষের সাথে প্রতারণা করা।

২৮. শুকরের গোশত খাওয়া।

২৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্য থেকে কোন একজনকেও অপছন্দ করা, গালি দেয়া।

৩০. পেট ভরার পরও খাবার চালিয়ে যাওয়া।

৩১. স্ত্রীর জন্য স্বামীর বিছানা ত্যাগ করা।

৩২. স্ত্রীদের জন্য স্বামীর অনুমতি না নিয়ে জিয়ারতে বের হওয়া।

৩৩. সতী নারীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো।

৩৪. চোগলখোরী করা। অর্থাৎ একের কথা অন্যকে বলা।

৩৫. অপরকে সতর তথা লজ্জাস্থান প্রদর্শন করা। (পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আর মহিলাদের জন্য হাতের তালু, পা ও মুখমণ্ডল বাদে সম্পূর্ন শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত।) অপরের সতরের দিকে দৃষ্টি দেয়াও হারাম।

৩৬. মৃত জন্তু খাওয়া বা অপরকে খাওয়ানো।

৩৭. আমানতের খিয়ানত করা।

৩৮. মুসলমানের গীবত করা।

৩৯. হিংসা করা।

৪০. আল্লাহ্ তায়ালার সাথে শিরক করা।

৪১. মিথ্যা বলা।

৪২. অহংকার করা।

৪৩. মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ থেকে সম্পদ হরণ করা।

৪৪. বখিল তথা কৃপণ হওয়া।

৪৫. দুনিয়ার প্রতি মুহব্বত করা।

৪৬. আল্লাহ্ তায়ালার আজাবের ভয়ে ভীত না হওয়া।

৪৭. শরীয়তে যা হারাম করা হয়েছে তাকে হারাম হিসেবে না মানা।

৪৮. একইভাবে হালালকে হালাল মনে না করা।

৪৯. গণকের কথা বিশ্বাস করা।

৫০. দ্বীন ত্যাগ করা অর্থাৎ মুরতাদ হওয়া।

৫১. বিনা প্রয়োজনে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া।

৫২. নারীদের জন্য পুরুষের পোশাক পরিধান করা।

৫৩. পুরুষদের জন্য নারীদের পোশাক পরিধান করা।

৫৪. হারাম শরীফের মাঝে গুনাহ সম্পাদন করা।

৫৫. ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বেই আযান দেয়া, নামাজ আদায় করা।

৫৬. রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা।

৫৭. আইন-কানুন ভঙ্গ করা।

৫৮. স্ত্রীর গোপনাঙ্গকে মায়ের গোপনাঙ্গের সাথে তুলনা করা।

৫৯. শ্বাশুরিকে গালি দেয়া।

৬০. কুকুরের ঝুটা খাওয়া।

৬১. কৃত উপকারের জন্য কাউকে হেয় করা।

৬২. পুরুষদের জন্য রেশম পরিধান করা।

৬৩. জাহালাত বা অজ্ঞতার উপর অটল থাকা। (আহলি সুন্নাতের ইতিক্বাদ, ফরজ, হালাল-হারাম ও দরকারী ইলমসমূহ না শেখা।)

৬৪. আল্লাহ্ তায়ালার নাম কিংবা ইসলাম স্বীকৃত নাম বাদে অন্য কিছু বলে কসম খাওয়া।

৬৫. ইলম অর্জন থেকে বিরত থাকা।

৬৬. অজ্ঞতাকে মুসীবত হিসেবে মেনে না নেয়া।

৬৭. সগীরা গুনাহ বারবার করা।

৬৮. অট্টহাসি হাসা, অতিরিক্ত হাসা।

৬৯. গোসল ফরজ হওয়ার পর বিনা উজরে এক নামাজের ওয়াক্ত গোসল না করেই পার করে দেয়া।

৭০. হায়েজ ও নিফাসের সময় স্ত্রী সহবাস করা।

৭১. অশ্লীল গান গাওয়া ও বাদ্য বাজানো।

৭২. আত্মহত্যা করা।

মুতা’আ নিকাহ তথা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করা হারাম। নারীদের, মেয়েদের বেপর্দা হয়ে চুল, হাত, পা অনাবৃত রেখে বাইরে চলাফেরা করা হারাম। একইভাবে পাতলা ও আঁটসাঁট পোশাক পরে পরপুরুষের সামনে যাওয়াও হারাম।

শরীরের অবয়ব বুঝা যায় এমন আঁটসাঁট পোশাক পরা নারীর দিকে কামনাহীন দৃষ্টিতে দেখাও হারাম। পরনারীর অন্তর্বাসের দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকানো হারাম। কামনার দৃষ্টিতে পরনারীর দিকে তাকানো হারাম। হারাম বা কামোত্তেজনার কারণ হয় এমন ছবি আঁকা, তোলা বা ছাপানো হারাম। (হারাম বিষয়টিকে অবজ্ঞা করলে কুফর হবে।)

অজু বা গোসলের সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচ করা ইস্‌রাফ (অপচয়), এজন্য হারাম।

পূর্ববর্তী আওলিয়াদের সম্পর্কে কটূক্তি করা, তাঁদেরকে জাহিল বলা, তাঁদের বক্তব্য থেকে ‘আহকাম-ই ইসলামিয়া’এর বিরোধী কোন অর্থ বের করা, মৃত্যুর পরও যে কেরামত প্রকাশ পেতে পারে তা অবিশ্বাস করা, তাঁদের মৃত্যুর সাথে সাথে অলীত্ব শেষ হয়ে যায় মনে করা এবং তাঁদের কবরের দ্বারা বরকত অর্জনকারীদের বাঁধা দেয়া এমন হারাম, যেমন মুসলমানদের সম্পর্কে কুধারণা করা, জুলুম করা, অন্যের সম্পদ হরণ করা, হিংসা করা, মিথ্যা বলা, অপবাদ দেয়া ও গীবত করা হারাম।

দশটি বিষয়, শেষ নিশ্বাসে ঈমানহীন মৃত্যুর কারণ

১. আল্লাহ্ তায়ালার আদেশ ও নিষেধ না শেখা।

২. আহলি সুন্নাতের ইতিক্বাদ অনুযায়ী ঈমান না আনা।

৩. দুনিয়ার সম্পদ, যশ, খ্যাতির প্রতি আসক্ত হওয়া।

৪. মানুষ ও পশুপাখিকে জুলম করা।

৫. আল্লাহ্ তায়ালার শুকরিয়া আদায় না করা।

৬. ঈমানহীন হওয়ার ব্যাপারে শঙ্কিত না হওয়া।

৭. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মত আদায় না করা।

৮. সুদ আদান-প্রদান করা।

৯. ধার্মিক মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা, তাচ্ছিল্য করা, সেকেলে ভাবা।

১০. অশ্লীল কথা বলা, লেখা বা ছবি আঁকা।

আহলি সুন্নাত ইতিক্বাদের বিশেষত্ব

১. আল্লাহ্ তায়ালার বহু সিফাত রয়েছে। যা তাঁর জাত থেকে ভিন্ন।

২. ঈমান বাড়েও না, কমেও না।

৩. কবীরা গুনাহ করলে ঈমান লোপ পায় না।

৪. গায়েবের প্রতি বিশ্বাস করা হল আসল।

৫. ঈমানের বিষয়ে কিয়াস করা অসম্ভব।

৬. জান্নাতে আল্লাহ্ তায়ালার দর্শন লাভ করা যাবে।

৭. তাওয়াক্কুল করা ঈমানের শর্ত।

৮. ইবাদত, ঈমানের অংশ নয়।

৯. কদরে বিশ্বাস করা ঈমানের শর্ত।

১০. আমলের ক্ষেত্রে চার মাজহাবের কোন একটিকে অনুসরণ করা শর্ত।

১১. আসহাবে কিরাম, আহলি বাইত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিত স্ত্রীগণের প্রত্যেককে ভালোবাসা শর্ত।

১২. চার খলীফার শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁদের খেলাফতের ক্রমধারা অনুযায়ী।

১৩. নামাজ, রোজা, সদকা ইত্যাদির মত নফল ইবাদতের সওয়াব অন্যকে হাদিয়্যা করা জায়েজ।

১৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাজ, দেহ ও রূহ উভয়েরই হয়েছিল।

১৫. আওলিয়ার কেরামত হক্ব।

১৬. শাফায়াত হক্ব।

১৭. 'মাসত্'এর উপর মাসেহ জায়েজ।

১৮. কবরের জিজ্ঞাসাবাদ সত্য।

১৯. কবরের আজাব রূহ ও দেহ উভয়ের উপরই হবে।

২০. মানুষ ও তার কাজকর্ম, উভয়ই আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি করেন। মানুষকে শুধুমাত্র 'ইরাদা-ই জুজইয়া' (আংশিক ইচ্ছাশক্তি) দান করা হয়েছে।

২১. রিজিক, হালালও হতে পারে আবার হারামও হতে পারে।

২২. আওলিয়ার রূহের সাথে 'তাওয়াচ্ছুল' সম্ভব এবং তাঁদের স্মরণে দোয়া করা হয়।

মন্দ বৈশিষ্ট্য

১. কুফর।

২. জাহালাত (অজ্ঞতা)।

৩. নিজের দোষ স্বীকারে অনীহা। (কেউ নিজের কোন দোষ দেখিয়ে দিলে তা অপছন্দ করা, মেনে নিতে না পারা।)

৪. নিজের প্রশংসা ভাল লাগা। (নিজেকে পছন্দ করা, কেউ প্রশংসা করলে তাতে আনন্দিত হওয়া।)

৫. বিদায়াত ইতিক্বাদ।

৬. 'হাওয়া-ই নাফস্'। (নাফসের চাহিদা, স্বাদ ও কামনার আনুগত্য করা।)

৭. তাকলিদের দ্বারা ঈমান। (বাতিল আকিদার অন্ধ অনুসরণ।)

৮. রিয়া। (লোক দেখানো বা কৃত্রিম, আখেরাতের আমল করে দুনিয়াবী বাসনা পূর্ন করা।)

৯. তুল-ই আমল। (স্বাদ ও ভোগ বিলাসের জন্য দীর্ঘকাল দুনিয়ায় বসবাসের ইচ্ছা পোষণ করা।)

১০. তামা'। (হারাম উপায়ে দুনিয়াবী স্বাদের অন্বেষণ করা।)

১১. কিবর্। (নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবা।)

১২. তাজাল্লুল। (অতিরিক্ত বিনয়।)

১৩. উযব্। (কৃত ইবাদত ও নেক আমলকে পছন্দ করা।)

১৪. হাসাদ্। (হিংসা করা, অন্যের ভাল সহ্য করতে না পারা। কারো থেকে আল্লাহ্র দেয়া নিয়ামতের বিলুপ্তির প্রত্যাশা। হযরত আবুল-লাইস্ সমরকন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, "**তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না। তারা হল: হারাম ভক্ষণকারী, গীবতকারী ও হাসাদ্কারী**"।)

১৫. হিকদ্। (অপরকে তুচ্ছ মনে করা।)

১৬. শামাতাত। (অপরের ক্ষতি বা বালা-মুসীবতে আনন্দিত হওয়া।)

১৭. হিজর। (বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন করা।)

১৮. জুবন্। (ভীরুতা, সাহসহীণতা।)

১৯. তাহাওউর। (মাত্রাতিরিক্ত ক্ষোভ।)

২০. গাদর্। (চুক্তি ভঙ্গ করা।)

২১. খিয়ানত। (মুনাফিকের আলামত। বিশ্বস্থতা ভঙ্গকারী কথা বা কাজ।)

২২. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। (কথা দিয়ে তা না রাখা। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, "**মুনাফিকের আলামত তিনটি: মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা ও আমানতের খেয়ানত করা**"।)

২৩. সূ-ই জান। (কারো সম্পর্কে কুধারণা করা। গুনাহসমূহের ক্ষমা পাওয়া সম্ভব নয় ভাবলে, আল্লাহ্ তায়ালার উপর 'সূ-ই জান' করা হবে। মুমিন ভাইকে হারামে লিপ্ত মনে করলে, ফাসিক মনে করলে, তা 'সূ-ই জান' হবে।

২৪. সম্পদের মুহব্বত।

২৫. তাস্ভিফ। (নেক কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিলম্ব করা।) হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, "**পাঁচটি জিনিস আসার আগে পাঁচটি জিনিসের মূল্য উপলব্ধি কর: মৃত্যু আসার আগে হায়াতের মূল্য, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে**

সুস্থতার মূল্য, দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় আখেরাত অর্জনের মূল্য, বৃদ্ধ হওয়ার আগে যৌবনের মূল্য ও ফকির হওয়ার আগে ধনী থাকার মূল্য”।

২৬. ফাসিকদের প্রতি মুহব্বত। (ফাসেকীর নিকৃষ্টতম হল জুলুম। হারামে লিপ্ত ব্যক্তিকে ফাসিক বলা হয়।)

২৭. আলেমদের দুশমনি করা। (ইসলামী ইলম্ ও আলেমদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করা কুফরের শামিল।)

২৮. ফিতনা। (মানুষের অনিষ্ঠ সাধন করা, তাদেরকে বিপদে ফেলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “ফিতনা ঘুমন্ত আছে, জাগ্রতকারীর উপর লানত হোক”।)

২৯. মুদাহানা ও মুদারা। (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হারাম কাজে বাঁধা না দেয়া এবং দুনিয়ার জন্য দ্বীনকে বিসর্জন দেয়াকে মুদাহানা বলে। আর দ্বীনের জন্য দুনিয়া বিসর্জন দেয়াকে মুদারা বলে।)

৩০. ইনাদ ও মুকাবারা। (জেদ করা, হক্ক বা সত্য শুনার পরও তা মানতে অস্বীকৃতি জানানো।)

৩১. নিফাক। (মুনাফেকী করা। ভিতরের সাথে বাইরের মিল না থাকা।)

৩২. তাফাক্কুর না করা। (নিজের গুনাহ, সৃষ্টি ও নিজের সম্পর্কে চিন্তা না করা।)

৩৩. মুসলমানকে বদদোয়া করা।

৩৪. মুসলমানকে মন্দ নাম দেয়া।

৩৫. উজর গ্রহণ না করা। (ক্ষমা না করা।)

৩৬. কুরআন করীমের ভুল তাফসীর করা।

৩৭. হারাম কাজ করতে আগ্রহী হওয়া।

৩৮. গীবত।

৩৯. তওবা না করা।

৪০. মাল, পদ ও খ্যাতি অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

(মন্দ বৈশিষ্ট্য থেকে বেঁচে থাকা উচিত। উত্তম বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, “**অল্প ইবাদত করেও কোন বান্দা, উত্তম বৈশিষ্ট্যের কারণে কিয়ামতের দিন উচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারবে”।**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর বলেছেন, “ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে সহজ ও অধিক লাভজনক হল: অল্প কথা বলা ও উত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া”।

“কেউ অভিমান করে দূরে চলে গেলে তার সাথে মেশা, কেউ জুলুম করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া ও কেউ মাহরুম (বঞ্চিত) করলে তাকে ইহসান (দান) করা হল উত্তম বৈশিষ্ট্য”।)

নবম অধ্যায়

নামাজের দোয়া ও সংক্ষিপ্ত সূরাসমূহ

ল্যাটিন বর্ণমালায় সূরা এবং দোয়া সমূহ লেখা সম্ভব কি?

সূরা এবং দোয়া সমূহ ল্যাটিন বর্ণে লেখার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। ল্যাটিন বর্ণমালার সাংকেতিক চিহ্নের কারনে সূরা এবং দুয়া সমূহ সঠিক ভাবে লেখা সম্ভব নয়। কুরআনে কারিম সঠিক উচ্চারন করে পড়ার জন্য একজন অভিজ্ঞ বাক্তির কাছে প্রশিক্ষন নেয়া প্রয়োজন। যেহেতু কুরআনে কারিম পাঠ করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, সেহেতু এটি নিশ্চিত করবে, কোন বাক্তির কুরআনে কারিমের প্রত্যেকটি অক্ষর শেখার জন্য সম্ভাবনা এবং রহমত। কুরআনে কারিম, হাদিস শারিফ এবং ফিকাহ কিতাব সমুহে এই রহমতের কথা বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। এটির প্রচুর সওয়াব লাভের কথা উল্লেখ রয়েছে।

প্রত্যেক মুসলমানের কুরআন করীমের শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখা উচিত। বাবা-মার উচিত সন্তানদের কুরআন শেখার ব্যবস্থা করে দেয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “**যারা সন্তানদেরকে নিজেরা কুরআন করীম শিক্ষা দিল অথবা মুয়াল্লিমের নিকট পাঠাল অতঃপর যতখানি কুরআন শিখাল, তার প্রত্যেক হরফের জন্য তাদেরকে দশ বার কা’বা-ই মুয়াজ্জামা যিয়ারতের সওয়াব প্রদান করা হবে এবং কিয়ামতের দিনে তাদের মাথায় মুকুট পড়ানো হবে। যা দেখে সবাই ঈর্ষা করবে**”। অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে, “**যারা সন্তানদেরকে দ্বীন শিখাল না, তারা জাহান্নামে যাবে**”।

কুরআনে কারিম পাঠ করার দশটি আদাব:

১– অবশ্যই ওজু সহকারে পাঠ করতে হবে। কিবালামুখি হয়ে এবং আদবের সাথে পাঠ করতে হবে।

২–অর্থ বুঝে আস্তে আস্তে পড়তে হবে। যিনি অর্থ বুঝেননা তিনি অবশ্যই আস্তে আস্তে পরবেন।

৩– আবেগ সহকারে পড়তে হবে। .

৪–প্রত্যেক আয়াতে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। আজাবের বর্ণনার আয়াত ভয়ের সাথে, ক্ষমার আয়াত আশা নিয়ে, তাঞ্জিহ আয়াত সমূহ

আল্লাহার প্রশংসা মূলক ভাবে পাঠ করা। আউজু এবং বিসমিল্লাহের সাথে পাঠ করতে হবে, শুরুতে এবং শেষে।

৫–যদি কাউকে প্রদর্শন মূলক হয়ে যায়, বা কার নামাজে সমস্যার সৃষ্টি হয় তবে, অবশ্যই নিঃশব্দে পাঠ করতে হবে। যারা কুরআনে কারিম মুখস্ত করেছে, তাদের কুরআনের মুশাফের দিকে তাকিয়ে পড়ার সওয়াব এটি হৃদয় দিয়ে পড়ার সওয়াবের চেয়ে বেশি। কেনেনা এক্ষেত্রে চোখেরও সওয়াব হয়।

৬–কুরআনে করিম সুন্দর সুর করে এবং তাজ্বিদের সাথে পাঠ করতে হবে, বর্ণ এবং শব্দ বাদ দিয়ে তাঘানির সাথে কুরআনে কারিম পাঠ করা হারাম, বর্ণ বিকৃত করে পড়া মাকরুহ।

৭– কুরআনে কারিম আল্লাহতালার কথা , যা তার গুন এবং চিরায়িত। মুখ থেকে বের হওয়া শব্দ কিছুতা এরকম বলা, আগুন। আগুন শব্দটি বলা খুব সহজ। কিন্তু কেউ আগুন সহ্য করতে পারে না। কুরআনের শব্দগুলো একইরকম। এই শব্দগুলো অন্যান্য শব্দের মত নয়। যদি এই শব্দ গুলো অর্থ বের হয়ে আসে তবে সাত আসমান জমিন তার ভর সহ্য করতে পারবে না। আল্লাহ লতালা মানুষের কাছে তার কথার সৌন্দর্য পৌঁছে দিয়েছেন, এই শব্দ গুলোর মাধ্যমে।

৮–কুরআনে কারিম পাঠ করার পূর্বে মানুষের চিন্তা করা উচিত এবং ভাবা উচিত কথা গুলো আল্লাহ তালার। একটি পরিষ্কার হাত যেমন প্রয়োজন কুরআনে কারিম পাঠ করার জন্য, তেমনি একটি পবিত্র হৃদয়েরও প্রয়োজন। যারা আল্লাহ তালার মহত্ত্ব বুঝতে পারেন না, তারা কুরানে কারিমের মহত্ত্ব বুঝতে পারবে না। আল্লাহ তালার গুন সমূহ এবং সৃষ্টি বোঝার প্রয়োজন রয়েছে তারা মহত্ত্ব বোঝার জন্য। এটি পড়ার পূর্বে বোঝা প্রয়োজন এটি তার কথা, যিনি সমস্ত সৃষ্টির মালিক এবং পালন কর্তা।

৯– কুরআনে কারিম পাঠ করার সময় অন্য কিছু চিন্তা করা যাবে না। যদি কোন বাক্তি বাগানে হাটার সময় তার পথের দিকে লক্ষ না রাখে, তবে তিনি বাগানে হাঁটেন নি।কুরআনে কারিম হচ্ছে এমন একটি জায়গা যেখানে বিশ্বাসীদের হৃদয় ঘোরা ফিরা করে। যিনি এটি পাঠ করবেন তাকে অবশ্যই এর অন্তর্নিহিত গুন এবং হিকমাত বুঝতে হবে।

১০–প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ বুঝে পড়তে হবে এবং যতক্ষণ না বোঝা যায় ততক্ষণ বার বার পড়তে হবে।

নামাজের দোয়ার অর্থসমূহ

সুবহানাকা

হে আল্লাহ্! সকল ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে আপনাকে পবিত্র ঘোষণা করছি। সমস্ত ভাল গুণাবলীর অধিকারী হিসেবে আপনাকে মেনে নিলাম। আপনার প্রশংসা করছি। আপনার নাম সুউচ্চ ও সুমহান। আপনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই।

আত্তাহিয়্যাতু

সমস্ত সম্মান, মর্যাদা ও কল্যাণ কেবলমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্যই। হে নবী! আল্লাহ্র সালাম, রহমত ও বরকত আপনার উপর বর্ষিত হোক। সালাম আমাদের ও সৎকর্মশীলদের উপর বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ এক এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহুম্মা সাল্লি

হে আল্লাহ্! ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর পরিবারকে যেভাবে আপনি রহমত করেছেন, ঠিক একইভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারকে রহমত প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আপনি হামিদ (অধিক প্রশংসিত) ও মাজিদ (মর্যাদাবান)।

আল্লাহুম্মা বারিক

হে আল্লাহ্! আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর পরিবারকে যেভাবে বরকত দান করেছেন, ঠিক একইভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারকে বরকত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি হামিদ (অধিক প্রশংসিত) ও মাজিদ (মর্যাদাবান)।

রব্বানা আতিনা

হে আমাদের রব! দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন। আপনিইতো দয়াবানদের মাঝে শ্রেষ্ঠ দয়াবান, আপনার দয়ার দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন।

দোয়া-ই কুনুত

হে আল্লাহ্! আমরা আপনার থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করছি। আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আপনার নিকট হিদায়াত চাচ্ছি। আপনার উপর ঈমান আনছি। আপনার নিকট তওবা করছি। আপনার উপরই তাওয়াক্কুল করছি। সমস্ত ভাল গুণাবলীর দ্বারা আপনার প্রশংসা করছি। সমস্ত নিয়ামতের জন্য

আপনার শুকরিয়া আদায় করছি। নিমোকহারামী করছি না। যার আপনার সাথে বেয়াদবি করছে, অপরাধ করছে তাদেরকে মরা ত্যাগ করছি।

হে আল্লাহ্! আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করছি। নামাজ আদায় করছি। আপনার জন্যই সিজদা করছি। আপনার দিকেই ধাবিত হচ্ছি ও প্রত্যাবর্তন করছি। আপনার রহমতের আশা করছি আর আযাব থেকে শঙ্কিত হচ্ছি। নিশ্চয়ই আপনার আযাব, সত্যকে আবৃতকারী কাফিরদের পাকড়াও করবে।

اَلتَّلْقِينُ لِلْمَيِّتَةِ

عَلَيْكِ سَلَامُ اللّٰهِ يَا اَمَةَ اللّٰهِ بِنْتَ عَبْدِ اللّٰهِ (٣ دفعه) كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فَاعْلَمِي بِاَنَّ هٰذَا آخِرُ مَنْزِلِكِ مِنْ مَنَازِلِ الدُّنْيَا وَ اَوَّلُ مَنْزِلِكِ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ. وَ اعْلَمِي بِاَنَّكِ خَرَجْتِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَ وَصَلْتِ اِلٰى دَارِ الْعُقْبٰى الْاَبَدِيَّةِ. خَرَجْتِ مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَ وَصَلْتِ اِلٰى دَارِ السُّرُورِ. خَرَجْتِ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ وَ وَصَلْتِ اِلٰى دَارِ الْبَقَاءِ. وَ اعْلَمِي بِاَنَّ الْآنَ الْآنَ قَدْ يَنْزِلُ بِكِ الْمَلَكَانِ الرَّفِيقَانِ الشَّفِيقَانِ الْاَسْوَدَانِ الْوَجْهَانِ وَ الْاَزْرَقَانِ الْعَيْنَانِ، اَحَدُهُمَا مُنْكَرٌ وَ آخَرُهُمَا نَكِيرٌ لَا تَخَافِي عَنْهُمَا وَ لَا تَحْزَنِي فَاِنَّهُمَا عَبْدَانِ مَأْمُورَانِ مِنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ، سَائِلَانِ عَنْكِ وَ قَائِلَانِ لَكِ: مَنْ رَبُّكِ وَ مَنْ نَبِيُّكِ وَ مَا دِينُكِ وَ مَا اِمَامُكِ وَ مَا قِبْلَتُكِ وَ مَنْ اِخْوَانُكِ وَ مَنْ اَخَوَاتُكِ فَقُولِي فِي جَوَابِهِمَا بِلَفْظٍ فَصِيحٍ وَ لِسَانٍ صَرِيحٍ: اَللّٰهُ رَبِّي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي، وَ الْاِسْلَامُ دِينِي وَ الْقُرْآنُ اِمَامِي وَ الْكَعْبَةُ قِبْلَتِي وَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَانِي وَ الْمُؤْمِنَاتُ اَخَوَاتِي. فَاعْلَمِي بِاَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ الْقَبْرَ حَقٌّ وَ سُؤَالَ الْمُنْكَرِ وَ النَّكِيرِ حَقٌّ وَ الْحَشْرَ حَقٌّ وَ النَّشْرَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ حَقٌّ وَ النَّارَ لِلْكَافِرِينَ حَقٌّ. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى. اُذْكُرِي الْعَهْدَ الَّذِي كُنْتِ عَلَيْهِ فِي دَارِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَ هُوَ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهَا عَلَى الْجَوَابِ وَ اَنْطِقْهَا بِالصِّدْقِ وَ الصَّوَابِ [اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي اِحْسَانِهَا وَ اِنْ كَانَتْ مُسِيئَةً فَاغْفِرْ لَهَا وَ ارْحَمْهَا وَ تَجَاوَزْ عَنْهَا]

(٣ دفعه) آمِينَ. وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

اَلتَّلْقِينُ لِلْمَيِّتِ

عَلَيْكَ سَلاَمُ اللّٰهِ يَا عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ (٣ دفعه) كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فَاعْلَمْ بِاَنَّ هٰذَا آخِرُ مَنْزِلِكَ مِنْ مَنَازِلِ الدُّنْيَا وَ اَوَّلُ مَنْزِلِكَ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ. وَ اعْلَمْ بِاَنَّكَ خَرَجْتَ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَ وَصَلْتَ اِلٰى دَارِ الْعُقْبٰى الْاَبَدِيَّةِ. خَرَجْتَ مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَ وَصَلْتَ اِلٰى دَارِ السُّرُورِ. خَرَجْتَ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ وَ وَصَلْتَ اِلٰى دَارِ الْبَقَاءِ. وَ اعْلَمْ بِاَنَّ الْآنَ الْآنَ قَدْ يَنْزِلُ بِكَ الْمَلَكَانِ الرَّفِيقَانِ الشَّفِيقَانِ الْاَسْوَدَانِ الْوَجْهَانِ وَ الْاَزْرَقَانِ الْعَيْنَانِ، اَحَدُهُمَا مُنْكَرٌ وَآخَرُهُمَا نَكِيرٌ لاَ تَخَفْ عَنْهُمَا وَ لاَتَحْزَنْ فَاِنَّهُمَا عَبْدَانِ مَاْمُورَانِ مِنْ قِبَلِ الرَّحْمٰنِ، سَائِلاَنِ عَنْكَ وَ قَائِلاَنِ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ وَ مَنْ نَبِيُّكَ وَ مَا دِينُكَ وَ مَا اِمَامُكَ وَ مَا قِبْلَتُكَ وَ مَنْ اِخْوَانُكَ وَ مَنْ اَخَوَاتُكَ فَقُلْ فِى جَوَابِهِمَا بِلَفْظٍ فَصِيحٍ وَ لِسَانٍ صَرِيحٍ: اَللّٰهُ رَبِّى وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّى، وَ الْاِسْلاَمُ دِينِى وَ الْقُرْآنُ اِمَامِى وَ الْكَعْبَةُ قِبْلَتِى وَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَانِى وَ الْمُؤْمِنَاتُ اَخَوَاتِى. فَاعْلَمْ بِاَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ الْقَبْرَ حَقٌّ وَسُؤَالَ الْمُنْكَرِ وَ النَّكِيرِ حَقٌّ وَ الْحَشْرَ حَقٌّ وَ النَّشْرَ حَقٌّ وَالْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْمِيزَانَ حَقٌّ وَالصِّرَاطَ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ لِلْمُؤْمِنِينَ حَقٌّ وَ النَّارَ لِلْكَافِرِينَ حَقٌّ. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى. اُذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِى كُنْتَ عَلَيْهِ فِى دَارِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَ هُوَ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ عَلَى الْجَوَابِ وَ اَنْطِقْهُ بِالصِّدْقِ وَ الصَّوَابِ [اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِى اِحْسَانِهٖ وَ اِنْ كَانَ مُسِيئًا فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ]

(٣ دفعه) آمِينَ. وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وَ التَّابِعِينَ الْاَخْيَارِ وَ الْاَبْرَارِ (رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ).

اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْحَاضِرُونَ! اِتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيعُوهُ اُوصِيكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِتَقْوَى اللّٰهِ، وَ اعْلَمُوا اَنَّ اِلَى اللّٰهِ الْمُنْتَهٰى، وَ اَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَ اَحْيَا، اِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ لِمَنْ يَخْشٰى، وَ اِلَى اللّٰهِ الْمُشْتَكٰى. (اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ): «يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»

الخطبة الثانية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدٰينَا لِلْاِيمَانِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَضْلِ وَ الْاِحْسَانِ اَلْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ تَعْظِيمًا وَ تَكْرِيمًا (اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم) «اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا».

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. يَا اَللّٰهُ بِكَ تَحَصَّنْتُ «٣ دفعه» وَ بِعَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (ﷺ) اِسْتَجَرْتُ «٣ دفعه» اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ و الْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ اٰمِينْ.

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ): «اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ».

خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ

الخطبة الاولى

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَضْعَافَ مَا حَمِدَهُ جَمِيعُ خَلْقِهٖ كَمَا يُحِبُّ وَ يَرْضٰى، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى مَنْ اَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ كَمَا يَنْبَغِي وَ يَحْرٰى، وَ عَلٰى آلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ اَوْلَادِهِ الْبَرَرَةِ التُّقٰى وَ النُّقٰى، خُصُوصًا مِنهُمْ عَلَى الشَّيْخِ الشَّفِيقِ، قَاتِلِ الْكَفَرَةِ وَ الزَّنَادِقِ، اَلْمُلَقَّبِ بِالْعَتِيقِ، فِي الْغَارِ الرَّفِيقِ اَلْاِمَامِ عَلَى التَّحْقِيقِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللّٰهِ (ﷺ) اَبِي بَكْرِنِ الصِّدِّيقِ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ). ثُمَّ السَّلَامُ مِنَ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ، عَلَى الْاَمِيرِ الْاَوَّابِ، زَيْنِ الْاَصْحَابِ، مُجَاوِرِ الْمِنْبَرِ وَ الْمِحْرَابِ، اَلنَّاطِقِ بِالْحَقِّ وَ الصِّدْقِ وَ الصَّوَابِ، اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ). ثُمَّ السَّلَامُ مِنَ الْمَلِكِ الْمَنَّانِ، عَلَى الْاَمِيرِ الْاَمَانِ، حَبِيبِ الرَّحْمٰنِ، صَاحِبِ الْحَيَاءِ وَ الْاِحْسَانِ، اَلشَّهِيدِ فِي اَثْنَاءِ تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ، اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ). ثُمَّ السَّلَامُ مِنَ الْمَلِكِ الْوَلِيِّ، عَلَى الْاَمِيرِ الْوَصِيِّ، اِبْنِ عَمِّ النَّبِيِّ، قَالِعِ الْبَابِ الْخَيْبَرِيِّ، زَوْجِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ بِنْتِ النَّبِيِّ اَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اَسَدِ اللّٰهِ الْغَالِبِ، عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ). وَعَلَى الْاِمَامَيْنِ الْهُمَامَيْنِ السَّعِيدَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ الْمَظْلُومَيْنِ الْمَقْبُولَيْنِ، اَلْحَسِيبَيْنِ النَّسِيبَيْنِ، سَيِّدَيْ شُبَّانِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَ قُرَّتَيْ اَعْيُنِ اَهْلِ السُّنَّةِ، اَلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا). وَعَلَى الْعَمَّيْنِ الْمُعَظَّمَيْنِ الْاَسْعَدَيْنِ الْاَمْجَدَيْنِ، الْاَكْرَمَيْنِ عِنْدَ اللّٰهِ وَالنَّاسِ، حَمْزَةَ وَالْعَبَّاسِ (رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا) وَعَلٰى جَمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ،

هٰذَا الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ فِى صَلاَةِ الْجَنَازَةِ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيرِنَا وَ كَبِيرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا * اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ (هَا) [1] مِنَّا فَاَحْيِهٖ (هَا) عَلَى الْاِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ (هَا) مِنَّا فَتَوَفَّهُ (هَا) عَلَى الْاِيْمَانِ * وَ خُصَّ هٰذَا الْمَيِّتَ (هٰذِهِ الْمَيِّتَةَ) بِالرَّوْحِ وَ الرَّاحَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ الرِّضْوَانِ * اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ (كَانَتْ) مُحْسِنًا (مُحْسِنَةً) فَزِدْ فِى اِحْسَانِهٖ (هَا) وَ اِنْ كَانَ (كَانَتْ) مُسِيئًا (مُسِيئَةً) فَتَجَاوَزْ عَنْهُ (هَا) وَ لَقِّهٖ (هَا) الْاَمْنَ وَ الْبُشْرٰى وَ الْكَرَامَةَ وَ الزُّلْفٰى * اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قَبْرَهُ (هَا) رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجِنَانِ وَ لَا تَجْعَلْ قَبْرَهُ (هَا) حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ * رَبِّ اغْفِرْ لِى وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ اَلْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

---

১ মুর্দা নারী হলে ব্র্যাকেটের ভিতরের জমির পড়তে হবে।

تَسْبِيحَاتُ التَّرَاوِيحِ

١ ـ سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ، سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ وَ الْجَمَالِ وَ الْجَبَرُوتِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَوْجُودِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَعْبُودِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِى لَا يَنَامُ وَ لَايَمُوتُ. سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوحِ.

٢ ـ مَرْحَبًا، مَرْحَبًا، مَرْحَبًا يَا شَهْرَ رَمَضَانَ، مَرْحَبًا مَرْحَبًا مَرْحَبًا يَا شَهْرَ الْبَرَكَةِ وَ الْغُفْرَانِ، مَرْحَبًا مَرْحَبًا مَرْحَبًا يَا شَهْرَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ وَ الذِّكْرِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. اَوَّلْ هُوَ آخِرْ هُوَ ظَاهِرْ هُوَ بَاطِنْ هُوَ، يَا مَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ.

٣ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَ دَوَاءٍ وَ بَارِكْ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ كَثِيرًا.

٤ ـ يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، يَا دَيَّانُ، يَا بُرْهَانُ، يَا ذَا الْفَضْلِ وَ الْاِحْسَانِ، نَرْجُو الْعَفْوَ وَ الْغُفْرَانَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ عُتَقَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ، بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ.

---

১ তারাবীহ নামাজের জন্য উঠার সময়।
২ রামজানের ১৫ এর পড়ে স্বাগতমের বদলে বিদায় পড়তে হবে।
৩ তারাবীহ নামাজের মাঝখানে পড়তে হবে।
৪ তারাবীহ নামাজ আদায়ের পর পাঠ করা দোয়া।

اَللّٰهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِى وَبَشَرِى عَلَى النَّارِ * وَاَظِلَّنِى تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّ عَرْشِكَ *

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ * اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِى مِنَ النَّارِ *

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَىَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْاَقْدَامُ *

اَللّٰهُمَّ لَا تَطْرُدْ قَدَمَىَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَطْرُدُ كُلَّ اَقْدَامِ اَعْدَائِكَ * اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَعْيِى مَشْكُوراً وَ ذَنْبِى مَغْفُوراً وَ عَمَلِى مَقْبُولاً وَ تِجَارَتِى لَنْ تَبُورَ * سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ * اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيمِ * وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِينِ الْاِسْلَامِ * وَ عَلٰى تَوْفِيقِ الْاِيمَانِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى جَعَلَ الْمَآءَ طَهُورًا * وَ جَعَلَ الْاِسْلَامَ نُورًا *

اَللّٰهُمَّ اسْقِنِى مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ كَاْسًا لَآ اَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَدًا * اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِى رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ ارْزُقْنِى مِنْ نَعِيمِهَا * وَ لَا تُرِحْنِى رَائِحَةَ النَّارِ *

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِى بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ اَوْلِيَآئِكَ وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهِى بِذُنُوبِى يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ اَعْدَآئِكَ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِى كِتَابِى بِيَمِينِى وَ حَاسِبْنِى حِسَابًا يَسِيرًا * اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِى كِتَابِى بِشِمَالِى وَ لَا مِنْ وَرَآءِ ظَهْرِى وَ لَا تُحَاسِبْنِى حِسَابًا شَدِيدًا *

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ
بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَهْدِيْكَ ○ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ ○ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ ○ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ ○ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ○
اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ ○ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ ○ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ ○ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ○
اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ ○ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ○ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ○ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ○ وَتَعَالٰى جَدُّكَ ○ وَجَلَّ ثَنَآؤُكَ ○ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ○

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ○ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ○ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ○ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ○ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ○

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ ○ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ○ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ ○ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ ○ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ (١) اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ (٢) لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ (٤)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ (٢) وَمِنْ
شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي
الْعُقَدِ ۙ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ (٥)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ (١) مَلِكِ النَّاسِ ۙ (٢) اِلٰهِ
النَّاسِ ۙ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۙ (٤) الَّذِىْ
يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ (٥)
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿٣﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿١﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿٤﴾
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿٦﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ
يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴿١﴾ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا
كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَّامْرَاَتُهٗ
حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿٥﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ؕ (١) اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فِيْ تَضْلِيْلٍ ۙ (٢) وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۙ (٣) تَرْمِيْهِمْ
بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ (٥)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ (١) اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ
(٢) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ (٣) الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ
مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ (٤)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ؕ (١) فَذٰلِكَ الَّذِيْ
يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ؕ (٣)
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ (٤) الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ
(٥) الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ (٦) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ (٧)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ اَدْرٰيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ﴿٢﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰى رَسُوْلِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

ইসতিগ্ফার'এর দোয়া

(বহু আয়াতে করীমায়, 'আমার কথা বেশি করে স্মরণ করুন' এবং সূরা নাসরে, 'আমার নিকট ইসতিগফার করুন, আপনার দোয়া কবুল করে গুনাহসমূহ ক্ষমা করব' বলা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ্ তায়ালা বেশি বেশি ইসতিগফার করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। এ কারণেই, হযরত মুহাম্মদ মাসুম কুদ্দিসা সিররুহু তাঁর মাকতুবাতের দ্বিতীয় খণ্ডের আশিতম মাকতুবে বলেছেন যে, "এই আদেশকে মেনে প্রত্যেক নামাজের পরে তিনবার ইসতিগফারের দোয়া পাঠ করি এবং সাতষট্টি বার 'আসতাগ্ফিরুল্লাহ' বলি। ইসতিগফারের দোয়া হল: আসতাগফিরুল্লাহ আল-আজিম আললাজি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়িল কাইয়িমি ওয়াতুবু ইলাইহি। তোমরাও এই দোয়াটি বেশি করে পড়। প্রত্যেকবার পড়ার সময় এর অর্থের কথা চিন্তা করতে হবে। তা হল: ইয়া আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর। যে এইরূপ পড়বে সে ও তার সঙ্গের লোকজন, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাবে। অনেকেই পড়েছে ও এর ফায়দা অর্জন করেছে"।)

(ঘুমানোর সময়, 'ইয়া আল্লাহ্! ইয়া আল্লাহ্!' এবং তিনবার 'আসতাগফিরুল্লাহি মিন কুললি মা কারিহাল্লাহু' বলা উচিত। ঘুম না আসা পর্যন্ত এভাবে বলতে থাকা উচিত।)

শাইখুল ইসলাম আহমদ নামিকী জামী (৫৩৬ হিজরী/১১৪২ খৃস্টাব্দ) তার 'মিফতাহুন-নাজাত' নামক কিতাবে বলেছেন যে: কোন ব্যক্তি তওবা ও ইসতিগফার করলে এবং এর শর্তসমূহ পূরণ করলে, সে যেখান দিয়ে যায় আর যেখানে বসে সেসব স্থান গর্ববোধ করে। চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজি তার জন্য দোয়া করে। তার কবর জান্নাতের ব্যাদানে পরিণত হয়। যারা এরূপ তবা করতে পারছে না তাদের উচিত যারা পারছে তাদের সঙ্গে থাকা। হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, "উত্তম ইবাদত হল, আওলিয়াদের ভালোবাসা"। আর বলা হয়েছে, "তওবা ও ইসতিগফার যে করল, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়"। (তওবা ক্বালবের দ্বারা হয় আর ইসতিগফার মুখে বলার মাধ্যমে হয়।)

তাওহীদের দোয়া

ইয়া আল্লাহ্! ইয়া আল্লাহ্! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ইয়া রহমান! ইয়া রহীম! ইয়া আফুওউন! ইয়া করিম! ফা'ফু আননি ওয়ারহামনি ইয়া আরহামার-রাহিমিন! তাওয়াফফানি মুসলিমান ওয়ালহাকনি বিস-সালিহীন। আল্লাহুমাগফির লি ওয়া লি আবাই ওয়া উম্মাহাতি, ওয়া লি আবাই ওয়া উম্মাহাতি জাওযাতি, ওয়া লি আযদাদি ওয়া আযদাদাতি, ওয়া লি আবনাই ওয়া বানাতি, ওয়া লি ইখওয়াতি ওয়া আখাওয়াতি, ওয়া লি আমামি ওয়া আম্মাতি, ওয়া লি আহওয়ালি ওয়া হালাতি ওয়া লি উসতাজি ওয়া লি কাফফাতিল মু'মিনিনা ওয়াল মু'মিনাত, রহমতুল্লাহি তায়ালা আলাইহিম আজমাইন"।